ক্রাইম ডট কম

একটা ঘুঁটি কম ছিল

চন্দ্রাণীকে খুন করার জন্য দেবপ্রিয় যে-ছক তৈরি করেছিল তাতে কোনও ভুল ছিল না।

ছকটাকে নানাদিক থেকে বারবার খতিয়ে দেখে দেবপ্রিয়র অন্তত সেইরকমই মনে হয়েছিল।

সবাই জানে, কোনও বিবাহিতা মহিলা খুন হলে পুলিশ সবার আগে তাঁর স্বামীকে সন্দেহ করে। দেবপ্রিয়ও এ-কথা জানত। সেইজন্যই ও বারবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছকটাকে যাচাই করছিল।

ব্যাপারটা অনেকটা স্লো মোশানে অ্যাকশন রিপ্লে দেখার মতো।

প্রায় মাসখানেক ধরে খুনের ছকটায় ঘুঁটি চালাচালি করে দেবপ্রিয় যেদিন নিশ্চিত হল যে, না, ছকটায় কোনও গোলমাল নেই, সেদিন ফূর্তিতে ও তিন পেগ হুইস্কি চড়িয়ে বাড়ি ফিরল। চন্দ্রাণীকে ও আর ভয় পায় না।

ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে পাখির ডাকের কলিং বেল টিপতেই ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখল চন্দ্রাণী। তারপর দরজা খুলল।

এবং মদের গন্ধ পেল।

'আজ আবার এসব গিলে এসেছ!' চাপা গলায় হিসহিস করে বলল চন্দ্রাণী। ও চায় না ঘরের অন্তর্বাস চৌরাস্তার মোড়ে কাচা হোক, তাই গলার স্বর তিরিশ ডেসিবেলের ওপরে উঠল না।

'তেমন কিছু খাইনি।' জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে জবাব দিল দেবপ্রিয়, 'ওরা জোর করে খাইয়ে দিল...।'

'ওরা' কারা দেবপ্রিয় জানে না। জানার দরকারও নেই।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে চন্দ্রাণীর গীতাপাঠ শুরু হল : ভদ্রসমাজে বাস করতে হলে সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়; আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি বোধ থাকা দরকার; সম্মান গেলে কখনও আর ফিরে আসে না; ডিসিপ্লিন একটা সুখী সংসারের চাবিকাঠি।

গীতাপাঠ চলছিল, আর দেবপ্রিয় এক অদ্ভুত চোখে বউকে দেখছিল। মনে-মনে বেশ মজা পাচ্ছিল ও। চন্দ্রাণী জানে না, ওর শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে। আর কদিন পর যখন ও 'নেই' হয়ে যাবে, তখন বেনিয়ম করলে দেবপ্রিয়কে এরকম জ্ঞান দেবে কে!

আক্ষেপের 'চুক-চুক' শব্দ বেরিয়ে এল দেবপ্রিয়র মুখ থেকে। ও বলল, 'সরি, চন্দ্রা...আর হবে না। প্লিজ, ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট।'

দেবপ্রিয় অন্যদিন এত সহজে বশ মানে না। আজ মানল। কারণ, আজ একটু আগেই

ও চন্দ্রাণীর কপালে মনে-মনে কাটা চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। এখন থেকে ও চন্দ্রাণীর সব কথা শুনবে, পদে-পদে ওর কাছে হার মানবে। আর তো মাত্র কটা দিন!

চন্দ্রাণীর বাবা রিটায়ার্ড বিচারপতি। আর মা কলেজের প্রফেসর। চন্দ্রাণী ওঁদের একমাত্র মেয়ে।

বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মেলামেশা করে দেবপ্রিয় যা বোঝার বুঝেছে। ওর মনে হয়েছে, চন্দ্রাণীর বাবার ডাকনাম ডিসিপ্লিন, আর মায়ের ডাকনাম আত্মসম্মান। এই দুটি মহান মানুষের মিলনে জ্ঞান লগ্নে অহংকার রাশিতে চন্দ্রাণীর জন্ম। ওর ডাকনাম চানু, কিন্তু দেবপ্রিয়র মনে হয়েছে ডাকনামটা গীতা হলেই ভালো মানাত।

প্রেম গীতা-টিতা মানে না। তাই দেবপ্রিয়র সঙ্গে চন্দ্রাণীর প্রেম হয়েছিল। বিয়েও।

তার পাঁচ বছর পর আবার প্রেম এল। শরীরী প্রেম।

মেয়েটির নাম ললনা। দেবপ্রিয়দের অফিসে সিস্টেম অ্যানালিস্ট-এর কাজ করে। দেখতে রীতিমতো কুৎসিত। কিন্তু ওর অন্য লুকোনো গুণ আছে। যে-গুণ মরা মানুষের শরীরেও শ্মশানের লকলকে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ললনার কোনও ডাকনাম নেই। তাই দেবপ্রিয় ওর ডাকনাম রেখেছিল কামনা। ডাকনামটা কামনার বদলে বাসনা অথবা বিছানা হলেও কোনও ক্ষতি ছিল না।

অনেকে হয়তো ভাববে কামনাকে বিয়ে করার জন্যই চন্দ্রাণীকে দেবপ্রিয় খুন করতে চাইছে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। কারণ, কামনাকে বিয়ের ব্যাপারে দেবপ্রিয়র কোনও মাথা ব্যথা নেই। তা ছাড়া কামনার ইন্টারেস্ট শুধু ইয়েতে—বিয়েতে নয়। ও কারও আন্ডারে থাকতে ভালোবাসে না। যেমন দেবপ্রিয় চন্দ্রাণীর আন্ডারে রয়েছে।

যখন ওরা আদরে-আদরে ব্যস্ত থাকে তখন এই আন্ডারে থাকা নিয়ে দেবপ্রিয়কে মাঝে-মাঝে খোঁচা দেয় কামনা। সেইসঙ্গে খিলখিল হাসি এবং মারাত্মক শরীর ঝাঁকুনি—যা একমাত্র ও-ই পারে। তখন দেবপ্রিয় সুখে পাগলের মতো হয়ে যায়।

'এখন তুমি আমার আন্ডারে আছ।' শব্দ করে হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে এলো চুল সরিয়ে দেয় কামনা। তারপর : 'কাল রাতে আমি তোমার আন্ডারে ছিলাম।' খিলখিল হাসি : 'এইরকম আন্ডারে থাকতে ভালো লাগে। তবে তুমি যেভাবে তোমার বউয়ের আন্ডারে দিন কাটাও সেরকম নয়। আমার কাছে লাইফের মানে হচ্ছে ফ্রিডম...।'

এইরকম একটা অবস্থায়, অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে কামনার কথা শুনতে-শুনতে, হঠাৎই আন্ডারওয়ার্ল্ড শব্দটা দেবপ্রিয়র মাথায় আসে। এবং মনে হয়, চন্দ্রাণীকে খুন করলে কেমন হয়!

আশ্চর্য! এ-কথা ভাবামাত্রই ওর শরীর উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইল। লোহা হার মেনে গেল ওর শরীরের দৃঢ়তার কাছে।

কামনা সেটা টের পেল। টের পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ওর কাজে মন দিল।

দেবপ্রিয় যখন পুরোনো কথা ভাবে তখন ও বেশ বুঝতে পারে সেই বিশেষ মুহূর্তেই চন্দ্রাণীকে খতম করার মতলবটা প্রথম ওর মাথায় জন্ম নিয়েছিল।

তারপর থেকে দেবপ্রিয় ধীরে-ধীরে টাকা জমাতে শুরু করে। কারণ, আন্ডারওয়ার্ল্ডের যে-পেশাদারি খুনিকে ও চন্দ্রাণীর দায়িত্ব দেবে তাকে টাকা দিতে হবে। এখন এসব কাজের যা বাজারদর তাতে হাজার পঞ্চাশেক হলেই কাজ হয়ে যাবে।

এই ধরনের খুনের ক্ষেত্রে পুলিশ স্বামীকে সন্দেহ করে প্রথমেই খোঁজ করবে সম্প্রতি স্বামীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে মোটা টাকা তোলা হয়েছে কি না। সেইজন্যই দেবপ্রিয় প্রতি মাসে অল্প-অল্প করে টাকা তুলে নিজের কাছে ক্যাশটাকা জমাতে লাগল। যেদিন ওর লুকোনো ক্যাশ-টাকার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছবে সেদিন ও ছকের নতুন ধাপে পা দেবে।

টাকাটা জমাতে আট মাস সময় লাগল। তারপর দেবপ্রিয় আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রফেশনাল কিলারের খোঁজ করতে শুরু করল।

পাড়া থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে প্রোমোটার সেজে জমির খোঁজে নেমে পড়ল দেবপ্রিয়। মাসখানেক ঘোরাঘুরি করতেই একজন পেশাদার খুনির খোঁজ পেয়ে গেল ও।

লোকটার নাম স্টেন মদন। কালো, রোগা, দড়ি পাকানো চেহারা। বাঁ-চোখটা সামান্য ট্যারা। বয়েস বড়জোর পঁয়তিরিশ। তবে ওর কারিকুলাম ভিটা দেখবার মতো। পাঁচটা খুন, তিনটে ধর্ষণ, আটবার ডাকাতি, এছাড়া গুলি-গোলা বোমাবাজি তো আছেই! এ-পর্যন্ত সব মিলিয়ে মোট সাত বছর জেল খেটেছে।

মদনের গলায় সোনার চেন, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে জিন্‌স, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, হাতে সোনার ব্যান্ড লাগানো ঘড়ি। ছিটেবেড়া আর টিনের চাল লাগানো একটা মিষ্টির দোকানের বেঞ্চিতে বসে টেপ-রেকর্ডারে গান শুনছিল আর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

দেবপ্রিয় চুল উসকোখুসকো করে চোখে রে-বান-এর সানগ্লাস লাগিয়ে মদনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। একমিনিটের মধ্যেই ওর কাজের কথা শেষ হয়ে গেল।

দরাদরির মধ্যে না-গিয়ে ও প্রথমেই মদনকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অফার করে বসল। তারপর চন্দ্রাণীর একটা রঙিন ফটো ওকে দিল। সঙ্গে টাইপ করা ঠিকানা।

নোংরা বাল্‌বের আলোয় মদন ফটোটা তেরছা চোখে দেখল। গ্লাসে একটা জোরাল চুমুক মেরে বলল, 'কোনও টেনসন নেই—মাল নেমে যাবে।'

দেবপ্রিয় গলাটা অন্যরকম করে বলল, 'এই মেয়েটি ফ্ল্যাটে একাই থাকবে। তবে কলিং বেল বাজালেই আপনাকে দরজা খুলে দেবে না। তখন আমার লেখা একটা চিরকুট আপনি দরজার নিচ দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবেন। ওটা পড়লেই ও দরজা খুলে দেবে। তারপর ফ্ল্যাটে ঢুকে...।'

কথা শেষ না-করে মদনকে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে দিল দেবপ্রিয়—লাল রঙের তিরিশটা নোট। তারপর স্টেন মদনের মোবাইল নাম্বার নিয়ে চলে এল। বলল, ওর সঙ্গে মদনের আর দেখা হবে না। বাকি আলোচনা ও ফোনে করবে।

মদনকে দেবপ্রিয় নিজের নাম বলেনি। ওদের আলাপ-পরিচয় যত কম হয় ততই ভালো। তাতে ধরা পড়ার ভয় কম। খুনের দিনে সকালে মদন ওর নাম জানতে পারবে—তার আগে নয়।

'কিন্তু আপনি ফোন করলে বুঝব কেমন করে?' মদন জানতে চাইল।

'আমি ফোন করে প্রথমেই বলব, "চন্দ্রাণী বলছি।" তাতে আপনি বুঝে নেবেন। আর কবে, কখন কাজটা সারতে হবে সেটা আমি কাজের দিন সকালে আপনাকে জানাব। এসবই সেফটির জন্যে। বাকি কুড়ি হাজার টাকাও আপনি সেদিনই পেয়ে যাবেন—তবে কীভাবে পাবেন সেটা এখনই বলছি না।'

মদন হাসল। বলল, 'ভিউ বিস হাজার টাকা নিয়ে কোনও পরেসানি আমার নেই। আমার টাকা কেউ চোট করতে পারে না...তাহলে সে নিজেই চোট হয়ে খালাস হয়ে যাবে।'

দেবপ্রিয় কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এল। গলা ছেড়ে হিন্দি গান গাইতে-গাইতে ফ্ল্যাটে ঢুকল।

চন্দ্রাণী ওর হেঁড়ে গলার গান শুনে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আনকালচার্ড।'

রাতে বিছানায় শুয়ে ক্রিকেটারদের ক্যাচ প্র্যাকটিসের মতো খুনের ছকটাকে নিয়ে অন্ধকারে লোফালুফি করতে লাগল দেবপ্রিয়। ওর ভেতরে একটা খুশির তুবড়ি জ্বলছিল।

সারা রাত ধরে খুনের ছকের প্রতিটি ধাপ খতিয়ে দেখল দেবপ্রিয়। নাঃ, কোথাও কোনও ফাঁক নেই। সব ঘুঁটি ঠিক-ঠিক জায়গাতেই বসানো আছে।

দেবপ্রিয়র ছকের ধাপগুলো এইরকম :

১. চন্দ্রাণীকে খুন করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া।
২. ধীরে-ধীরে, বেশ সময় নিয়ে, পঞ্চাশ হাজার টাকা গোপনে জমানো। টাকাটাকে ধীরেসুস্থে নানান জায়গা থেকে হাজার টাকার নোটে বদলে নেওয়া। এতে টাকা দেওয়া-নেওয়ার সুবিধে হবে।
৩. একজন ভাড়াটে খুনিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া। সঙ্গে চন্দ্রাণীর রঙিন ফটো এবং কম্পিউটারে ছাপানো ফ্ল্যাটের ঠিকানা।

সতর্কতা : খুনিকে ঠিক করতে হবে বেশ দূরের কোনও এলাকা থেকে। খুনির সঙ্গে দেখা করার সময় হালকা ছদ্মবেশ—যেমন, সানগ্লাস ইত্যাদি—ব্যবহার করতে হবে। খুনির সঙ্গে একবারের বেশি দেখা করা ঠিক হবে না। সব যোগাযোগ ফোনে সারতে হবে। ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা যে-কোনও একটা কম্পিউটার সেন্টার থেকে অন্যান্য বাজে ঠিকানার সঙ্গে ছাপিয়ে নিতে হবে। তাতে হাতের লেখা মিলিয়ে পুলিশ তদন্তে এগোতে পারবে না।

৪. খুনের দিনক্ষণ ঠিক করার পর তার দু-দিন কি তিনদিন আগে ঘরের রঙিন টিভিটা খারাপ করে দিতে হবে।

৫. পাড়ার এমন একটা ইলেকট্রিকের দোকানে খবর দিতে হবে, যার বেশ গাফিলতি আছে। সাতবার কি আটবার তাগাদা না-দিলে মিস্তিরি পাঠায় না।

৬. খুনের দিনটা কাজের দিন হিসেবে বেছে নেওয়া হবে—যাতে অফিস-কাছারি সব খোলা থাকে। সেদিন বেলা বারোটার সময় ভাড়াটে খুনিকে ফ্ল্যাটে আসতে বলবে।

৭. খুনি টিভি সারানোর মিস্তিরি সেজে বাড়িতে ঢুকবে। একতলায় সিঁড়ির নীচে দেবপ্রিয়দের নাম লেখা লেটার বক্সে একটা চিরকুট রাখা থাকবে। চিরকুটে চন্দ্রাণীর নামে একটা ছোট্ট চিঠি লিখবে দেবপ্রিয়। যার সারমর্ম হল, 'টিভি সারানোর মিস্তিরি যাচ্ছে—ওকে টিভিটা সারাতে দিয়ো। টাকাপয়সা কিছু দিয়ো না—যা দেওয়ার আমি দিয়ে দেব।' চিঠির ওপরে ইলেকট্রিকের দোকানের নাম ও মালিকের নাম লেখা থাকবে—যাতে খুনি নাম দুটো জানতে পারে, চন্দ্রাণী আচমকা জিগ্যেস করলে ঠিক-ঠিক জবাব দিতে পারে।

৮. লেটার বক্স থেকে চিরকুটটা নিয়ে খুনি দেবপ্রিয়দের ফ্ল্যাটে যাবে। কাজ শেষ করে চিরকুটটা মুখে পুরে স্রেফ গিলে ফেলবে—অথবা, লেটার বক্সে রেখেই চলে যাবে। দেবপ্রিয় পরে ওটা সরিয়ে নেবে।

সতর্কতা : *চিরকুটটা যাতে কিছুতেই পুলিশের হাতে না-পড়ে সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। ওতে দেবপ্রিয়র হাতের লেখা থাকবে। তা হলেই জানা যাবে মিস্তিরি পাঠানোর ব্যাপারটা মিথ্যে। আর খুনির সঙ্গে দেবপ্রিয়র যোগাযোগের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাবে।*

৯. চন্দ্রাণীর খুনটা নিশ্চিত করতে বড়জোর দুটো গুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। গুলির শব্দ চাপা দেওয়ার জন্য সাইলেন্সার অথবা বালিশ কাজে লাগানো যেতে পারে। ব্যাপারটা ফোনে খুনির সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে।

সাড়ে বারোটা নাগাদ খুনিকে মোবাইলে ফোন করবে দেবপ্রিয়। যখন জানবে কাজ শেষ, তখন খুনিকে বলবে মোবাইল ফোনের 'সিম' কার্ডটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা ক্যাশকার্ড ভরে নিতে। তখনই ও জেনে নেবে, খুনির বাকি টাকাটা কোনও মিড্‌লম্যানের মারফত কবে কখন খুনিকে পৌঁছে দিতে হবে।

সতর্কতা : *'সিম' কার্ড পালটানোর ব্যাপারটা বেশ জরুরি। দরকার হলে এ-কাজের জন্য খুনিকে বাড়তি দু-হাজার টাকা অফার করা যেতে পারে।*

১০. চন্দ্রাণীকে খুন করানোর অন্তত একমাস আগে থেকেই ললনার সঙ্গে

যোগাযোগ কমিয়ে দিতে হবে। খুনের পর কমপক্ষে ছ-মাস ললনার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলবে দেবপ্রিয়। তারপর ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে।

১১. চন্দ্রাণী খুন হওয়ার পর পুলিশ যথারীতি দেবপ্রিয়কে সন্দেহ করবে এবং পাগলা কুকুরের মতো খুনের মোটিভ খুঁজে বেড়াবে। সেইজন্যই দেবপ্রিয় শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর চন্দ্রাণীর স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি কোর্টের কাগজ তৈরি করে চন্দ্রাণীর মা-বাবাকে গিফ্‌ট করে দেবে। তাহলে পুলিশ কিছুতেই আঁচ করতে পারবে না, চন্দ্রাণীর আভারে-আন্ডারে থেকে মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লান্তি থেকেই দেবপ্রিয় চন্দ্রাণীকে খুন করার ছক কষেছে। অর্থাৎ, ওরা কোনও মোটিভ খুঁজে পাবে না।

এগারোটা ধাপের পর আবার সুস্থ স্বাভাবিক স্বাধীন জীবন। তার মধ্যে তিনটে ধাপ ইতিমধ্যেই দেবপ্রিয় শেষ করে ফেলেছে। বাকি আর মাত্র আটটা ধাপ।

তৃপ্তিতে দেবপ্রিয়র চোখ বুজে এল। অন্ধকারে পাশবালিশটা আঁকড়ে ধরে ফিসফিস করে দুবার 'ললনা' বলে ডাকল। পাশবালিশ কোনও উত্তর দিল না। তবে দেবপ্রিয়র শরীরের চাপ টের পেল।

এক মঙ্গলবারকে চন্দ্রাণীর অমঙ্গলের দিন বলে দেবপ্রিয় বেছে নিল।

তার আগের বৃহস্পতিবার স্টেন মদনকে ও ফোন করল। বলল, দিন এগিয়ে আসছে—তৈরি থাকতে। খুনের দিন সকাল নটায় ও মদনকে ফাইনাল সিগনাল দেবে। তারপর ওর সঙ্গে মদনের যোগাযোগ হবে বেলা সাড়ে বারোটায়। তারপর আর কোনওদিন হবে না।

শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ চন্দ্রাণী কিছু কেনাকাটা করতে কাছেই সুপারমার্কেটে গিয়েছিল। সেই সুযোগে টিভির পিছনের ঢাকনা খুলে সার্কিট বোর্ডে জল ঢেলে রাখল দেবপ্রিয়।

মার্কেট থেকে ফিরে এসে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল চন্দ্রাণী। দেবপ্রিয় তখন ফ্ল্যাটের গেস্টরুমে অফিসের কাগজপত্র ছড়িয়ে কাজের ভান করছে। কিছুতেই ও টিভির সুইচ অন করবে না।

দেবপ্রিয়কে মন দিয়ে কাজ করতে দেখে খুশি হল চন্দ্রাণী। রান্নার ফাঁকেই ওকে এক কাপ চা করে দিল। তারপর হাতের কাজ সেরে যেই না টিভি অন করেছে অমনই শর্ট সার্কিট, শব্দ, অন্ধকার, পোড়া গন্ধ। নিশ্চয়ই ফিউজ উড়ে গেছে।

পত্নীব্রতা স্বামীর মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল দেবপ্রিয়। ফিউজ-টিউজ পালটে সবকিছু ঠিকঠাক করল। তারপর টিভি অন করে দেখল টিভি চলছে না।

অতএব চার নম্বর ধাপ শেষ।

পরদিন দেবপ্রিয় পাড়ার 'বিশ্বকর্মা ইলেকট্রিক'-এ খবর দিল। মালিক অনিমেষ পাত্র—দেবপ্রিয়র 'অনিমেষদা'—বললেন, চিন্তার কিছু নেই...দু-একদিনের মধ্যেই তিনি লোক পাঠাচ্ছেন।

দেবপ্রিয়র ছকের পাঁচ নম্বর ধাপ মসৃণভাবে শেষ হল।

সোমবার রাতে কাজের ছল করে প্রায় বারোটা পর্যন্ত জেগে রইল দেবপ্রিয়। অনেক মকশো করার পর একটা ছোট্ট চিঠি দাঁড় করাল :

বিশ্বকর্মা ইলেকট্রিক
অনিমেষ পাত্র

চন্দ্রা,

টিভি সারানোর মিস্তিরি যাচ্ছে। ওকে টিভিটা সারাতে দিয়ো। টাকাপয়সা কিছু দিয়ো না—যা দেওয়ার আমি পরে হিসেব করে দিয়ে দেব। বাড়ি ফিরে কথা হবে। লাভ ইউ।

দেবপ্রিয়
১৮/৯/২০০১

পরদিন—অর্থাৎ, মঙ্গলবার—বাজার থেকে ফেরার সময় মদনকে ফোন করে ফাইনাল সিগনাল দিল দেবপ্রিয়। তারপর বাড়িতে ঢুকে চিঠি দেখার ভান করে লেটার বক্স খুলে হাতড়াল। আর সেই ফাঁকে চিরকুটটা লেটার বক্সের মেঝেতে শুইয়ে রাখল। তারপর বাক্সের টিপতালাটা না-টিপে এমনিই ঝুলিয়ে রাখল আংটার গায়ে। যাতে মদনের কোনও অসুবিধে না-হয়।

বেলা এগারোটা নাগাদ চন্দ্রাণী যখন স্নান করতে ঢুকল তখন দেবপ্রিয় তৈরি হয়ে অফিসে বেরোল।

এই কাজটা ওকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে করতে হয়েছে।

'শরীরটা ভালো নেই। গা ম্যাজম্যাজ করছে।' সকাল থেকে এইসব বলে সময় কাটিয়েছে দেবপ্রিয়। এমনকী অফিসে ফোন করে বলেও দিয়েছে 'আজ অফিসে যাব না।' তারপর দশটা নাগাদ হঠাৎ অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে শুরু করেছে।

চন্দ্রাণী রোজই পৌনে এগারোটা-কি-এগারোটা নাগাদ স্নান করতে যায়। দেবপ্রিয় ঠিক করল, চন্দ্রাণী যখন বাথরুমে থাকবে তখনই ও ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোবে। অর্থাৎ, বেরোনোর ভান করবে।

'আমি বেরোলাম।' বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল দেবপ্রিয়।

বাথরুমে শাওয়ারের জল পড়ার শব্দ হচ্ছিল। চন্দ্রাণী 'ঠিক আছে' জাতীয় কিছু একটা বলল। দেবপ্রিয় ভালো করে বুঝতে পারল না।

'বিশ্বকর্মা ইলেকট্রিকে একবার মিস্তিরির জন্যে তাগাদা করে যাব—।' দেবপ্রিয় বলল।

'হুঁ...আচ্ছা।' জলের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে কথাগুলো শোনা গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে লম্বা-লম্বা পা ফেলে ফ্ল্যাটের দরজার কাছে পৌঁছে গেল দেবপ্রিয়। নাইটল্যাচের নব ঘুরিয়ে দরজা খুলল। তারপর দরজাটা বেশ শব্দ করে ঠেলে বন্ধ করে দিল। দরজা নিজে থেকেই লক হয়ে গেল।

দেবপ্রিয় কিন্তু ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোল না—ভেতরেই থেকে গেল।

সাবধানে পা ফেলে ও ফিরে গেল জামাকাপড়ের আলনার কাছে। চটপট অফিসের পোশাক খুলে ঘরোয়া পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিল। তারপর অফিসের পোশাক আর ব্রিফকেস আঁকড়ে ধরে চলে গেল গেস্টরুমে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল গেস্টরুমের খাটের নীচে। শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল দেওয়ালের গায়ে, অন্ধকার এলাকায়।

এবং রুদ্ধশ্বাসে বেলা বারোটা বাজার অপেক্ষা করতে লাগল।

এটা ছকের একটা নতুন ধাপ। দেবপ্রিয় ছকটা একটু-আধটু বদলেছে। তাতে ওর মনে হয়েছে, খুনের ব্যাপারটা আরও নিখুঁত হবে।

দেবপ্রিয় লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল আর দাঁতে নখ কাটছিল। ওর জামাকাপড়ের আলনাটা যেরকম লণ্ডভণ্ড থাকে তাতে পাজামা-পাঞ্জাবির ঘাটতিটা নিশ্চয়ই চন্দ্রাণীর চোখে পড়বে না। আর পড়লেও হয়তো ভাববে ওগুলো লন্ড্রিতে দেওয়া হয়েছে।

ওর এইসব উথালপাথাল ভাবনার মধ্যেই ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল।

দেবপ্রিয়র বুকটা ধড়াস করে উঠল। তারপর ওর হৃৎপিণ্ড যেন বাজি জেতার ঘোড়দৌড় শুরু করে দিল।

ছক অনুযায়ী দেবপ্রিয়র লেখা চিরকুট দেখিয়ে স্টেন মদন ফ্ল্যাটে ঢুকল। চন্দ্রাণীকে 'বউদি, বউদি' করে একগাল হেসে টিভির কাছে গেল। হাতের ব্রিফকেস খুলে যন্ত্রপাতি বের করতে লাগল।

টিভির পিছনের ঢাকনাটা খুলে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে কিছুক্ষণ কীসব দেখল। চন্দ্রাণী টিভির পাশে দাঁড়িয়ে মদনের কাজ দেখছিল আর বিড়বিড় করে বলছিল, 'সুইচ অন করতেই ফ্ল্যাশ-ট্যাশ হয়ে একেবারে সব ফিউজ হয়ে গিয়েছিল। কে জানে এখন কত খরচ হবে...।'

'আপনার কোনও চিন্তা নেই, বউদি...যতটা কমে হয় করে দেব।' বিজ্ঞের মতন টিভির ভেতরটা দেখতে-দেখতে মদন বলল।

তারপর হঠাৎই ওর হাত থেকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা পড়ে গেল মেঝেতে।

'বউদি, ইস্ক্রু-ড্রাইভারটা একটু তুলে দিন না...।'

মদনের অনুরোধে চন্দ্রাণী ঝুঁকে পড়ল মেঝের ওপর। হাত বাড়িয়ে স্ক্রু-ড্রাইভারটা তুলতে গেল।

স্টেন মদন চট করে টিভির একদিকে চলে এল। পকেট থেকে রিভলবার বের করে টিভির অন্যদিকে ঝুঁকে-পড়া চন্দ্রাণীর মাথায় নল একেবারে ঠেকিয়ে গুলি করল।

'ফট' করে একটা চাপা শব্দ হল।

টিভির পিছনের দেওয়ালটা বিচ্ছিরিরকম লাল হয়ে গেল। চন্দ্রাণীর জ্ঞান, অহংকার, আর আই. কিউ. ছত্রখান হয়ে দেওয়ালে লেপটে গেল। ও 'টুঁ' শব্দটি করার সময় পেল না।

টিভির আড়াল থাকায় মদনের গায়ে রক্ত ছিটকে এসে লাগেনি। লাগলেও কোনও ক্ষতি ছিল না, কারণ, ওর ব্রিফকেসে একই রঙের আর-এক সেট জামা-প্যান্ট ছিল। মদন পেশাদারি খুনি। ও-ও নিজের মতো করে ছক কষতে জানে।

রিভলবারটা পকেটে ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে মদন অবাক হয়ে গেল। একটা ভারি খিল হাতে দেবপ্রিয় কখন যেন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। মদন অবাক হয়ে কিছু একটা বোধহয় বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দেবপ্রিয় খিলটা সপাটে মদনের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে।

মদন টাল খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

দেবপ্রিয় পাগলের মতো মদনের মাথা লক্ষ করে খিল চালাতে লাগল। একবার... দুবার...তিনবার...চারবার...।

দেবপ্রিয় যখন থামল তখন মদনের মাথাটা থেঁতলে যাওয়া কালোজামের মতো দেখাচ্ছিল।

খিলটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে চটপট কাজ শুরু করে দিল দেবপ্রিয়।

সাবধানে মদনের পকেট হাতড়ে মোবাইল ফোনটা বের করে নিল। ফোনের পিছনটা খুলে 'সিম' কার্ডটা টেনে খুলল। তারপর সেটা টক করে মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল। ফোনটা ঠিকঠাক করে লাগিয়ে আবার ঢুকিয়ে দিল মদনের পকেটে।

মুখ নাড়তে-নাড়তেই টিভির পাশে রাখা একটা ছোট টি-টেবিলের দিকে গেল দেবপ্রিয়। টেবিলে ওর লেখা চিরকুটটা রাখা ছিল।

সেটা তুলে নিয়ে একবার দেখল। শেষের দুটো লাইন মিহি গলায় ব্যঙ্গ করে পড়ল : '...বাড়ি ফিরে কথা হবে। লাভ ইউ।' তারপর চিরকুটটাও মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল।

যাক, ছকের নটা ধাপ শেষ! হাঁফ ছাড়ল দেবপ্রিয়। এরপর ললনার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলা আর চন্দ্রাণীর সবরকম সম্পত্তি ওর মা-বাবাকে নিঃশর্ত গিফ্‌ট করে দেওয়া। এই দুটো ধাপ তেমন কঠিন নয়।

খুনের ছকের কয়েকটা ঘুঁটি দেবপ্রিয় ইচ্ছে করেই একটু নতুনভাবে সাজিয়েছিল। স্টেন মদনের বেঁচে থাকাটা ওর ঠিক পছন্দ হয়নি। এত কাণ্ড করার পর মদনকে বাঁচিয়ে রাখাটা নিতান্ত বোকামি। তাই...।

চিবোনো কাগজের মণ্ডটা এইবার জোর করে গিলে ফেলল দেবপ্রিয়।

তারপর গলার স্বর দু-রকম করে এক কাল্পনিক পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলতে লাগল। আর একইসঙ্গে মদনের জামাকাপড় হাতড়ে চন্দ্রাণীর রঙিন ফটোটা খুঁজতে লাগল। খুঁজতে লাগল মদনকে চিনে ফেলা যায় বা মদনের সঙ্গে ওর যোগাযোগ

ধরে ফেলা যায় এমন কোনও কাগজপত্র আছে কি না।

'মার্ডারার যখন আপনার ওয়াইফকে গুলি করে তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানার এককোণে শুয়ে ছিলাম। গুলির শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখি একটা লোক চন্দ্রাকে গুলি করে পালাচ্ছে। তখন আমার জ্ঞান ছিল না। শোবার ঘরের দরজার পাশ থেকে খিলটা তুলে নিয়ে...।' ব্যস করে কাঁদতে লাগল দেবপ্রিয়। চন্দ্রাণীর ফটোটা খুঁজে পেল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কালচার্ড ওয়াইফ, এবার তোমাকে চিবিয়ে খাব।'

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে ফটোটা মুখে পুরে দিয়ে হিংস্রভাবে চিবোতে লাগল দেবপ্রিয়। চিবোতে-চিবোতেই কাঁদতে লাগল আর কাল্পনিক ইনসপেক্টরকে বলতে লাগল, 'জানেন, আমার জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে গেল...সত্যিকারের আত্মীয় বলতে আর কেউ রইল না...কেউ রইল না...।'

দেবপ্রিয় ফ্ল্যাটটা যেটুকু গোছগাছ করার করে নিল। তারপর দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল। চন্দ্রাণী খুন হওয়ার পর প্রায় আট মিনিট পার হয়ে গেছে। এইবার চেঁচিয়ে লোক জড়ো করা যেতে পারে।

মুখে রাখা ফটোর পিণ্ডটা গিলে ফেলে সর্বহারা স্বামীর মতো হইচই শুরু করে দিল দেবপ্রিয়। 'খুন! খুন!' বলে ফ্ল্যাটবাড়ি একেবারে মাথায় তুলল।

ফলে, আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, সব এসে হাজির হল।

দেবপ্রিয় বাইরে কাঁদছিল, তবে ভেতরে-ভেতরে মজা দেখছিল। নিখুঁত খুন করতে পারার অহংকার ওর ভেতরে ফুলে-ফুলে উঠছিল।

দেবপ্রিয় জানত না, ওর খুনের ছকে সব ঘুঁটি ঠিকমতো সাজানো হয়নি। তাই ওর খুনটাও নিখুঁত হয়নি।

কারণ, ওর হাতে লেখা চিরকুটটা পাড়ারই একটা দোকান থেকে স্টেন মদন জেরক্স করে নিয়েছিল। ভেবেছিল, খুনের কাজ সেরে ফেরার পথে ওটা নিয়ে যাবে। মদন পেশাদারি খুনি। সেইজন্যই একটা 'অস্ত্র' ও হাতে রাখতে চেয়েছিল। দরকার হলে যাতে দেবপ্রিয়র বিরুদ্ধে সেটা ব্যবহার করা যায়।

জেরক্সটা মদন আর হাতে পায়নি। কারণ, দেবপ্রিয়র লেটার বক্সের অন্ধকার এককোণে চিরকুটের জেরক্স কপিটা পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিল।

একতিলের জন্য

—বেঁচে গেল অমৃতা।

প্রথমটা ও ঠিক বুঝতে পারেনি। ডানদিক দেখে, বাঁদিক দেখে, তারপর আবার বাঁদিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্য একটা পা সামনে বাড়িয়েছে কি বাড়ায়নি—কোথা থেকে একটা মানুষ-বোঝাই মিনিবাস ছুটে এসে হুস করে বেরিয়ে গেল ওর নাকের ডগা দিয়ে। মিনিবাসের গা ঘেঁষে ছুটে যাওয়া বাতাসের ঝাপটা ওর সোনার নাকছাবিটা ছুঁয়ে গেল। মৃত্যুভয়ে অমৃতার শরীরটা পলকে পাথর হয়ে গেল।

মিনিবাসটা ডানদিক থেকে আচমকা ছুটে এসেছিল। ট্র্যাফিক-লাইট সবুজ হয়ে থাকায় ওটা আর দাঁড়ায়নি—মরণপণ ছুট লাগিয়েছে বড়রাস্তা ধরে।

সন্ধের মুখে অফিসপাড়ায় ভিড় কিছু কম ছিল না। তাই অমৃতার একতিলের জন্য বেঁচে যাওয়াটা অনেকেরই নজরে পড়েছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেশ কিছু মানুষ ছুটে এল ওর কাছে। শুরু হয়ে গেল চেঁচামেচি, গুঞ্জন, জ্ঞানবর্ষণ এবং কলকাতার জঘন্য যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা নিয়ে বিচিত্র সব মন্তব্যের ফুলঝুরি।

চারপাশের প্রায় কোনও কথাই অমৃতার কানে ঢুকছিল না। পাথর হয়ে ও শুধু ভাবছিল, কেমন করে বেঁচে গেলাম? মরে গেলে বেশ হত...পিছনে কাঁদার কেউ ছিল না। একা-একা অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। বসন্ত কবে থেকেই যাই-যাই করছে—তাকে সরিয়ে দিয়ে হেমন্ত উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে।

নাঃ, শুধু গানকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা যায় না। অমৃতা এখন একজন পুরুষকে আঁকড়ে ধরতে চায়—অন্তত একটিবারের মতো।

ওর গানের প্রশংসা অনেকে করে। পুরুষরাই বেশি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। গান ডিঙিয়ে ওরা আর এগোতে চায় না। অমৃতার চেহারা ওদের থামিয়ে দেয়। ওরা সৌজন্যের হাসি হেসে চলে যায়। ওদের আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ব্যবহার অমৃতাকে মনে পড়িয়ে দেয় ওকে দেখতে মোটেই ভালো নয়। ওর মুখটা অচল পয়সার মতো।

আচ্ছা, রূপই কি সব! মনটা কিছু নয়!

তিলতিল সাধনা করে গান শিখেছে অমৃতা। গানকে সুন্দর করে তুলেছে। তেমনি মনটাকেও ও সুন্দর করে তুলেছে। অথচ সেটার খবর কেউ জানতে চাইল না!

গান গেয়ে এখন যৎসামান্য নাম-ডাক হয়েছে ওর। সকলেই এগিয়ে আসে ওই গান পর্যন্ত—বাইরের কুরূপের আড়াল সরিয়ে মনের অন্দরে কেউ উঁকি দিতে চায় না।

'আপনি খুব লাকি।'

ভরাট পুরুষালি কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল অমৃতা। মুখ ঘুরিয়েই দেখতে পেল সুন্দর চেহারার এক তরুণকে। কাটা-কাটা নাক, ঠোঁট, চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি। ফরসা রং,

একমাথা চুল, গায়ে ঢোলা জিন্‌স-এর শার্ট, পায়ে বাদামি কটন প্যান্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট, হাতে ছোট্ট একটা ব্রিফকেস।

আর গায়ে কেমন এক হালকা পুরুষ-পুরুষ গন্ধ।

এক নিশ্বাসে যুবকটিকে জরিপ করে নিল অমৃতা।

গানের ক্যাসেটে অমৃতার কোনও ছবি ছাপা হয় না। তাই ওর যারা ফ্যান তারা বেশিরভাগই ওকে চেনে না। বছরে দু-চারটে ফাংশান করে অমৃতা। তার দৌলতে কিছু লোক ওকে চেনে। এই পুরুষটি...।

'আপনি যেভাবে বেঁচে গেলেন সেটাকে মিরাক্‌ল বলে।' চওড়া হাসল ছেলেটি : 'এখন কোথাও বসে একটু রেস্ট না-নিয়ে কিছুতেই যেন বাড়ির দিকে রওনা হবেন না! এরকম বিপদ থেকে বাঁচলে পর মনটাকে সেট্‌ল করার টাইম দিতে হয়।'

অমৃতা ফুটপাথের ওপর সরে এসেছিল। চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখল, সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত—অমৃতার দিকে নজর দেওয়ার সময় কারও নেই। তবুও অমৃতা একটু অস্বস্তি পাচ্ছিল।

'আপনি গান করেন?'

একটা ধাক্কা খেল অমৃতা। আবার সেই গানের প্রশংসা, ন্যাকা-ন্যাকা অভিনন্দন, তারপর পিঠ বাঁচিয়ে পিঠটান! এর চেয়ে মিনিবাসের ধাক্কা অনেক ভালো ছিল।

'কী করে বুঝলেন?' ভীষণ রুক্ষভাবে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল অমৃতা। তারপর আরও বিরক্ত হয়ে : 'আপনি কি জ্যোতিষী না কি?'

উত্তরে মিষ্টি করে হাসল : 'না, জ্যোতিষী নয়...পরপর তিনদিন ওই রেকর্ডিং স্টুডিয়োটা থেকে আপনাকে বেরোতে দেখলাম...তাই। আমি গান ভালোবাসি, তবে ভালো বুঝতে পারি না বলে সবসময় কাঁচুমাচু হয়ে থাকি। যেমন এখন।'

অমৃতার হাসি পেয়ে গেল। ছেলেটিও হাসছে। ওর মুখটা মোটেই কাঁচুমাচু মনে হচ্ছে না। তবে সন্দেহ একটা তৈরি হচ্ছিল অমৃতার মনে। মেয়েদের সঙ্গে গায়ে পড়ে যারা আলাপ করতে চায় এই ছেলেটি কি সেই দলের? বোধহয় না। কারণ আজ পর্যন্ত অমৃতার সঙ্গে গায়ে পড়ে কেউ আলাপ করতে চায়নি। কোনও গীতিকার, সুরকার, কিংবা ক্যাসেট কোম্পানির মালিক কখনও ওকে উলটোপালটা প্রস্তাব দেয়নি। কেউ ডিনারে নিয়ে যেতে চায়নি। কেউ সন্ধের পর ওর এক-কামরার ফ্ল্যাটে আসতে চায়নি। পুরুষের হ্যাংলাপনা থেকে ও বরাবরই নিরাপদে থেকেছে—পঞ্চাশ কি ষাট পেরোনো কোনও মহিলা যেমন নিরাপদ।

'আপনি কি রোজ এই স্টুডিয়োর ওপরে নজর রাখেন না কি?'

'না। আসলে সেল্‌সম্যানের চাকরি করি। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোই আমার পেশা। তারই মাঝে ফাঁক পেলে মানুষ দেখি...ওটা আমার নেশা। এই যে, আমার কার্ড...।' কথা শেষ হতে-না-হতেই জামার পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে নিয়ে অমৃতার হাতে তুলে দিয়েছে ছেলেটি।

রাস্তার সোডিয়াম-আলোয় কার্ডটা পড়তে পারল অমৃতা।

সুকান্ত চক্রবর্তী। বি.এ. এল.এল.বি.। সেল্‌স এক্সিকিউটিভ।

তার নীচে একটা সাহেবি ধরনের কোম্পানির নাম লেখা।

'আপনার পারসোনালিটি আমাকে খুব স্ট্রাইক করেছে। মিনিবাসের ওরকম ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে যাওয়ার পর আপনাকে যেরকম স্টেডি দেখলাম...রিয়েলি ...খুব রেয়ার কোয়ালিটি। যাদের মনের জোর খুব বেশি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভালো লাগে—।'

'কেন?'

'আমার মনের জোর কম—তাই।'

অমৃতা ছোট্ট করে হাসল। মনে-মনে ভাবল, দেখাই যাক না, আলাপটা কতদূর গড়ায়। সুকান্তকে দেখে মনে হচ্ছে না ও সুযোগ-খোঁজা পুরুষের দলে। সেরকম হলে ও অনায়াসে কোনও সুন্দরী মেয়েকে বেছে নিত। সুন্দরী না-হোক, অন্তত অমৃতার মতো বত্রিশ-তেত্রিশের কোনও অসুন্দরী মেয়েকে বেছে নিত না।

আচ্ছা, প্রেম কি এভাবেই শুরু হয়?

ধুৎ, কীসব যা-খুশি ভাবছে অমৃতা। মনে হয়, সুকান্ত...।

'আমরা কি এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলব?' সুকান্ত জিগ্যেস করল, 'যদি আপনার অমত না-থাকে আমরা কোনও একটা দোকান-টোকানে বসতে পারি। অবশ্য আপনার তাড়া থাকলে অন্য কথা।'

তাড়া? আগামী একশো বছরে অমৃতার কোনও তাড়া নেই।

সুতরাং কথা বলতে-বলতে একটা ছোটখাটো রেস্তরাঁয় পৌঁছে গেল ওরা।

ধোঁয়া-ওঠা ফিশফ্রাই সামনে রেখে মুখোমুখি বসে চলল কথার-পর-কথা।

'জানেন, একসময় আমার গায়ক হওয়ার শখ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না।'

'কেন? আপনার গলার স্বর তো বেশ...।'

'দোয়াত আছে, কালি নেই। স্বর আছে, সুর নেই।' হাসল সুকান্ত। তারপর আলতো করে বলল, 'আপনার দুটোই আছে। ভগবান আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছেন।'

মাথা নামাল অমৃতা : 'দিয়েছে—আবার অনেক কিছু দেয়নি।' কথাটা বলতে গিয়ে অমৃতার গলা কেঁপে গেল।

সুকান্ত বুঝল। বলল, 'মনখারাপ করবেন না। ভগবান লোকটা কৃপণ নয়। আপনাকে যা দিয়েছে তা-ই যথেষ্ট। ভাবুন তো, যদি এই জীবনটাই আপনাকে না-দিত! তখন তো অনেক কিছুই আপনি হারাতেন। এই যে এখন এই রেস্তরাঁয় বসে আপনার সঙ্গে গল্প করছি, সেটাও হত না। তার মানে আমিও অনেক কিছু হারাতাম।'

অমৃতা সুকান্তর মুখের দিকে তাকাল। সুকান্তর কথাগুলো ওর ভালো লেগেছে বলেই তার মধ্যে তোয়াজ আছে কি না খুঁজল।

না, সেকরম কোনও ইশারা পেল না।

'আপনাকে একটা মনের কথা বলি, ম্যাডাম। এই দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারটাই ভারি

মিস্টিরিয়াস। এক ধরনের মানুষ আছে যারা কিছু দিলে তার বদলে কিছু নেয়...।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল অমৃতা। হ্যাঁ, এইরকম মানুষ ও দেখেছে।

ফিশফ্রাই-এর টুকরো চিবোতে-চিবোতে সুকান্ত বলল, '...ম্-ম্-ম্...আর-এক টাইপের মানুষ আছে যারা কিছু দিলে তার বদলে কিছু নিতে চায় না।'

'আপনি কোন টাইপের?' অমৃতা মজা করে জিগ্যেস করল।

'সেটা বললে কি আপনি বিশ্বাস করবেন? বরং খানিকটা বন্ধুত্ব হোক, তা হলে টের পাবেন।'

তারপর অমৃতার গানের কথা জানতে চাইল সুকান্ত। অমৃতা বলতে লাগল, সুকান্ত মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনতে লাগল। সময় কাটতে লাগল একটু-একটু করে।

অনেক গল্পের পর ওরা উঠল।

সুকান্ত একরকম জোর করেই রেস্তরাঁর বিল মিটিয়ে দিল।

তারপর রাস্তায় পা দিয়ে বলল, 'আপনি এখন বাড়ি ফিরবেন তো?'

'হ্যাঁ—।'

'আপনার বাড়িতে আর কে-কে আছে?'

'কেউ না। আমি একা।' একটা বড় শ্বাস ফেলল অমৃতা : 'শুধু-আমি, আর গান। মা-বাবা আর ছোট ভাই দেশের বাড়িতে থাকে। আমার এই গানের ব্যাপারটা ওরা খুব একটা পছন্দ করে না। আমাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে।'

'সেটা আপনাকে দেখে বোঝা যায়।'

'আপনার বাড়িতে আর কে-কে আছে?'

'সবাই। তবে মনে-মনে আমি সবসময় একা-একা থাকি।'

'কেন?'

'দুঃখ পাওয়া আমার ছোটবেলাকার অভ্যেস। তাই সুখের হদিস পেলে খুব ভয় পাই। এই বুঝি সুখের খেলনাটা কেউ কেড়ে নিল। তাই মনে-মনে একা থাকাটাই ভালো।'

'আমার ব্যাপারটাও অনেকটা তাই।' মনখারাপ গলায় বলল অমৃতা।

'মোটেই না। আপনার গান আছে। এখন বাড়ি গিয়ে আপনি গানের রেওয়াজ করতে বসবেন। আর আমি? হুঁঃ...চারপাশে আড়াল তুলে আকাশপাতাল ভাবব। তবে আজ হয়তো আপনার কথা ভাবব। কালও, পরশুও...। সেইজন্যেই আমার বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।'

অমৃতা সুকান্তকে দেখল। রাস্তার ঠিকরে পড়া আলোয় ওর মুখে হাইলাইট তৈরি হয়েছে। সেখানে নুন-গোলমরিচের মতো দুঃখ ছিটিয়ে দিয়েছে কেউ।

জিগ্যেস করে জানল সুকান্তর বাড়ি টালিগঞ্জে। তাও ওর বাড়ি ফেরার তাড়া নেই! সেকি অমৃতার জন্য?

অসম্ভব। মনে-মনে নিজেকে এক বকুনি লাগাল অমৃতা। একটু আলাপ হতে-না-হতেই বুকের ভেতরে সারস পাখি ডানা মেলে দিয়েছে!

'আপনার বাড়ি কোথায়?' সুকান্ত জানতে চাইল।

'কলেজ স্ট্রিটের কাছে...সূর্য সেন স্ট্রিটে...।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগছিল। আপনার বাড়ি গেলে আপনাকে ব্রিফকেসটা খুলে দেখাতে পারতাম। রাস্তায় তো আর দেখানো যায় না।'

'কী আছে আপনার ওই ব্রিফকেসে?' হেসে জিগ্যেস করল অমৃতা।

'আমার সবকিছু। আমার জীবনদর্শন! মানে...ঠিক বোঝাতে পারছি না। থাকগে, পরে কখনও দেখানো যাবে।'

ব্রিফকেসটা কি অজুহাত? এই ছুতোয় অমৃতার ফ্ল্যাটে গিয়ে ওর সঙ্গ চাইছে সুকান্ত? না, না, প্রথম আলাপেই এতটা দুঃসাহসী কেউ হবে না। তা ছাড়া, ও যদি আজ চলে যায়, আবার কবে ওর সঙ্গে অমৃতার দেখা হবে...।

'চলুন, আপনাকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত এগিয়ে দিই।' নিচু গলায় সুকান্ত বলল।

ওর কি অভিমান হল? নিশ্চয়ই ও অমৃতাকে ভিতু ভাবছে।

'আপনার ব্রিফকেসে কী আছে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।' কিশোরী গলায় আবদার করল অমৃতা।

'খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?'

'ইয়েস, খুব।'

'ও. কে.। তা হলে দুটো অপশন দিচ্ছি। এ—আপনার বাড়ি যাব না। বি—আপনার বাড়ি যাব। বলুন, আপনার চয়েস কোনটা?'

'বি।'

'শিয়োর?'

'হ্যাঁ—।'

'কনফিডেন্ট?'

'ইয়েস।'

'ফাইনাল জবাব? কম্পিউটার লক কর দিয়া যায়ে?'

'হ্যাঁ।'

'ও.কে. ডান।' বলে হেসে অমৃতার দিকে ডানহাত বাড়াল সুকান্ত।

অমৃতাও হাত বাড়াল।

ওরা হ্যান্ডশেক করল।

ঠিক তখনই অচেনা এক উত্তেজনার তরঙ্গ অসংখ্য ডালপালা মেলে ছড়িয়ে গেল অমৃতার শরীরে। অমৃতার ভালো লাগল। এরকম নতুন ভালো-লাগা আগে কখনও ও টের পায়নি।

হাত নেড়ে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল সুকান্ত। তারপর দুজনে উঠে পড়ল তাতে। অমৃতা লক্ষ করল, সুকান্ত ভদ্রমাপের দূরত্ব রেখেই পাশে বসল।

মিনিটকুড়ির মধ্যেই অমৃতার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। অমৃতা কিছু বলে ওঠার আগেই সুকান্ত ভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর ঢুকে পড়ল সদর দরজা পেরিয়ে।

বাড়িটা বেশ পুরোনো। দু-পাশের দুটো বাড়ির সঙ্গে দেওয়ালে দেওয়াল ঠেকিয়ে

তৈরি। দু-পাশের বাড়ি দুটো রং-ঢং করে ভোল ফেরানো হয়েছে। তাদের তুলনায় মাঝেরটা বয়েসের ভারে এতই নুয়ে পড়েছে যে, পাশের বাড়ি দুটো যেন দু-পাশ থেকে বাড়িটাকে সযত্নে সামলে রেখেছে। গান্ধীজির কথা মনে পড়ে গেল সুকান্তর—দুই সঙ্গিনীর কাঁধে ভর দিয়ে তাঁর পথ চলা।

অমৃতার ফ্ল্যাট তিনতলায়। ফ্ল্যাট না-বলে আস্তানা বলাই ভালো। তবে ও নিজের মতো করে একটু-আধটু সাজিয়ে নিয়েছে।

ঘরে ঢুকে টিউবলাইট জ্বেলে দিল অমৃতা। ছোট্ট করে হেসে সুকান্তকে আহ্বান জানাল : 'আসুন—।'

সুকান্ত চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খিল আর ছিটকিনি এঁটে দিল।

অমৃতা একটু অবাক হল। সেইসঙ্গে একটু বিরক্তও। কিন্তু ধৈর্য না-হারিয়ে ও শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'দরজা বন্ধ করলেন কেন?'

সুকান্ত একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'যদি হুট করে কেউ এসে পড়ে। এসময়ে কেউ এসে পড়লে আমার ভীষণ নার্ভাস লাগবে।'

'কেন, নার্ভাস লাগার কী আছে! দরজাটা খুলে বরং পরদাটা টেনে দিন। বুঝতেই তো পারছেন...মিড্‌ল ক্লাস পাড়া...এখানে পান থেকে চুন খসলেই লোকের জিভ নকনক করে।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল সুকান্ত। মিনমিন করে বলল, 'ঠিক আছে, খুলে দিচ্ছি। তার আগে আপনি টিভিটা চালিয়ে দিন।'

এই অনুরোধটা অমৃতাকে অবাক করে দিল। কিন্তু ও কিছু বলল না। ঘরের এককোণে চোদ্দ ইঞ্চি একটা কালার টিভি দাঁড় করানো ছিল। ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে সেটা অন করে দিল। তারপর ঘরের দুটো বন্ধ জানলা খোলার জন্য পা বাড়াতেই সুকান্তর গলা ওকে থামিয়ে দিল।

'ওসব পরে হবে, ম্যাডাম—আগে আমার ব্রিফকেসটা দেখে নিন।'

অমৃতা অবাক হয়ে ফিরে তাকাল সুকান্তর দিকে। ওর আচরণে কোথায় যেন একটু সুর কেটে গেছে।

কী চায় সুকান্ত? সব পুরুষ যা চায় তাই? কিন্তু অমৃতার কাছে তো কেউ কখনও তা চায়নি! চাইলে কী হত কে জানে! হয়তো অমৃতা খুশি হয়ে সবকিছু উজাড় করে দিত। হয়তো দিত না। কিন্তু সুকান্তকে পছন্দ হয়েছে বলেই না ওকে ঘর পর্যন্ত নেমন্তন্ন করেছে।

অমৃতার হঠাৎই খেয়াল হল, সুকান্ত এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তাই বলল, 'বসুন—।'

সুকান্ত ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা সোফায় বসল।

সামনেই খাটো টি-টেবিল। তার ওপরে ব্রিফকেসটা রেখে শব্দ করে লক খুলল। তারপর ধীরে-ধীরে ঢাকনা তুলল।

অমৃতার চোখের নজর ঢাকনার দেওয়ালে আটকে গেল। ব্রিফকেসের ভেতরটা ও

দেখতে পাচ্ছিল না। তবে ঢাকনার ওপর দিয়ে সুকান্তর মুখটা দেখা যাচ্ছিল।

'একটু চা করি আপনার জন্যে?'

ব্রিফকেসের ভেতরটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সুকান্ত। অমৃতার প্রশ্নে চমকে মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'না, এখন চায়ের তেষ্টা নেই। আগে এগুলো আপনাকে দেখাই...।'

অমৃতা সুকান্তর কাছে এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই ফোন বেজে উঠল। তাই থমকে দাঁড়িয়ে ও টিভির পাশে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল।

ফোনে কথা বলতে-বলতেই অমৃতা দেখল সুকান্ত কয়েকটা কাগজ ব্রিফকেস থেকে বের করে টেবিলের ওপরে সাজিয়ে রাখল। তারপর অমৃতার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ফোনে কথা বলা শেষ হতেই কাগজগুলো তুলে নিল সুকান্ত। চট করে উঠে দাঁড়াল। অমৃতার দিকে দু-পা এগিয়ে কাগজগুলো বাড়িয়ে দিল ওর দিকে, বলল, 'এগুলো একটু পড়ে নিন...তা হলে সুবিধে হবে।'

অমৃতা অবাক চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে কাগজগুলো নিল।

অনেকগুলো খবরের কাগজের কাটিং। সাদা কাগজে আঠা দিয়ে লাগানো। ওপরে এককোণে তারিখ লেখা। আট-দশটা কাগজ সুকান্ত ওকে পড়তে দিয়েছে।

অমৃতা কাগজগুলো পড়ছিল। সেই ফাঁকে সুকান্ত টিভির কাছে গিয়ে ভলিয়ুমটা বেশ বাড়িয়ে দিয়েছে।

কাটিংগুলো পড়তে-পড়তে অমৃতার দম আটকে এল। কাগজ-ধরা হাতটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

একজন খুন-পাগল মানুষের কথা লিখেছে খবরে। পরিভাষায় যাকে বলে সিরিয়াল কিলার। খবরের কাগজওয়ালারা তার নাম দিয়েছে 'নাইফম্যান'। অজানা-অচেনা এই খুনি গত ছ-মাসে পাঁচটি মেয়েকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। প্রতিটি মেয়ের শরীরে অসংখ্য ছুরির আঘাত ছিল। বিশেষ করে তাদের মুখগুলো এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে, ঠিকমতো শনাক্ত করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। পাঁচটি ক্ষেত্রেই ক্ষতবিক্ষত নগ্ন মৃতদেহ পায় পুলিশ। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও খুনের মোটিভ বুঝতে পারেনি—খুনিকে ধরা তো দূরের কথা! এই পাঁচজন ভিকটিমের মধ্যে এমন কোনও মিল পুলিশ খুঁজে পায়নি যা থেকে বলা যায় একটি বিশেষ ধরনের মেয়েই খুনির শিকার হতে পারে। কোনও ক্ষেত্রে খুন হয়েছে নির্জন রাস্তায়। কখনও-বা খোলা মাঠে কিংবা পার্কে। আবার কখনও মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে তার ফ্ল্যাটে। অর্থাৎ, মোডাস অপারেন্ডাই-এরও কোনও সুনিশ্চিত ধারা খুঁজে বের করা যায়নি। শুধু এটুকু পুলিশ বুঝতে পেরেছে, খুনির পছন্দ ছুরি। তাও একরকম নয়—নানা ধরনের। তিনটে খুনের বেলায় দেখা গেছে, খুনি প্রতিটি ক্ষেত্রে কম করেও চাররকমের ছুরি বা ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করেছে। সেই কারণেই কোনও-কোনও সাংবাদিক ঠাট্টা করে মন্তব্য করেছে : খুনির বোধহয় ছুরি-কাঁচির দোকান আছে।

অমৃতা কাগজে 'নাইফম্যান'-এর কথা পড়েছিল। গত পনেরো-বিশদিনে স্মৃতি যেটুকু-বা ঝাপসা হয়ে এসেছিল, খবরের কাগজের কাটিংগুলো পড়তে শুরু করামাত্র সব মনে

পড়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেছে অমৃতার শরীরে। ওর হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। কেন যে ও অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে না, সেইকথা ভেবে ও অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

এইবার সবকিছুর মানে ধীরে-ধীরে ওর কাছে স্পষ্ট হল।

কেন সুকান্ত গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেছে। কেন ওর সঙ্গে বাড়ি আসতে চেয়েছে। কেন জানলা খুলতে বারণ করেছে। কেন টিভির ভলিয়ুম বাড়িয়ে দিয়েছে।

অমৃতা এখন না-দেখেও বুঝতে পারছে সুকান্তর ব্রিফকেসের মধ্যে কী আছে।

অমৃতার হাত থেকে কাগজগুলো খসে পড়ে গেল।

যেন তেমন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সুকান্ত সেগুলো কুড়িয়ে নিল। তারপর চাপা গলায় খুকখুক করে হাসতে-হাসতে ঢাকনা খোলা ব্রিফকেসের কাছে গেল। কাগজগুলো ব্রিফকেসের পাশে রেখে একজোড়া সার্জিক্যাল গ্লাভ্‌স বের করে নিল।

রবারের গ্লাভ্‌স টেনে পরতে-পরতে নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'এখন আপনার আর কোনও উপায় নেই...অপেক্ষা করা ছাড়া...।'

'কীসের অপেক্ষা?' চাপা খসখসে গলায় জিগ্যেস করল।

'নিয়তির...' গ্লাভ্‌স পরা শেষ করে সুকান্ত বলল। ওর হাত দুটো এখন কী শক্তিশালী আর পুরুষালি মনে হচ্ছে।

অমৃতা চিৎকার করার জন্য চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু চিৎকারটা ওর গলা দিয়ে বেরোল না। কারণ, ঠিক তক্ষুনি সুকান্ত হাতের একটানে ব্রিফকেসটা অমৃতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর অমৃতা দেখতে পেয়েছে সুকান্তর সবকিছু, সুকান্তর জীবনদর্শন।

ব্রিফকেসের ভেতরটা ঝকঝক করছে।

নানা ধরনের নানা মাপের পাঁচটা ছুরি সেখানে শুয়ে আছে। কারও ফলা সোজা, কারও ফলা বাঁকানো, আবার কারও-বা করাতের মতো খাঁজ কাটা।

সুকান্ত একটা বড় মাপের ছুরি হাতে তুলে নিল। সেটা ডাক্তারি নজরে খুঁটিয়ে পরখ করতে-করতে বলল, 'চিৎকার করতে চাইছেন? চাইতেই পারেন। তবে ওই যে, কে যেন বলে গেছেন, চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে খানিকটা ফাঁক থেকে যায়। এখানে সেই ফাঁকটা তৈরি করবে এই ছুরিটা—আপনার গলায়...গানের গলায়। আর যদি একটুকরো চিৎকার ভুল করে গলা দিয়ে বেরিয়ে যায় তা হলেও অসুবিধে নেই। ওই টিভির শব্দ সেটাকে চাপা দেবে...।'

সুকান্ত একচিলতে হাসল, তবে হাসিটা ঠোঁটেই থেকে গেল—চোখ পর্যন্ত ছড়াল না।

'আ-আমি বাঁচতে চাই...।' কাঁপা গলায় বলল অমৃতা।

'আবার সেই চাওয়া।' গ্লাভ্‌স-পরা হাতে ছুরিটা ধরে অমৃতার কাছে এগিয়ে এল সুকান্ত। চাপা গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'কাগজগুলো পড়ে তো দেখলেন, আমি কেন খুন করি কেউ জানে না। আপনাকে বলতে পারি...আপনি জানলে কোনও অসুবিধে নেই, কারণ, আপনার জানাটা আর কেউ জানতে পারবে না। আপনার চুলটা খুলে ফেলুন।'

শেষ কথাটা একই ঢঙে বলে ফেলায় অমৃতা ঠিক বুঝতে পারেনি।

সুকান্ত আবার বলল, 'মাথার চুলটা খুলে ছড়িয়ে দিন—।'

ঠান্ডা গলায় কথাটা বলে বাঁ-হাতে আলতো করে অমৃতার চুলে হাত দিল সুকান্ত।

অমৃতা শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি মাথার পিছনে হাত দিয়ে শৌখিন ক্লিপটা খুলে ফেলে দিল মেঝেতে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপরে।

সুকান্ত খুব খুঁটিয়ে অমৃতাকে দেখতে লাগল। ওর চুল পরখ করতে-করতে চলে এল অমৃতার পিছনে। মাথা ঝুঁকিয়ে ফুঁ দিল চুলে। কয়েকটা চুল উড়ল কি উড়ল না।

অপছন্দের ঢঙে মাথা নাড়ল সুকান্ত : 'উঁহু, আপনার চুল তেমন লম্বা নয়। রেশমের মতো ফিনফিনেও নয়...।'

বিড়বিড় করে কথা বলতে-বলতে অমৃতার চুলে হাত দিল। আলতো করে ওর চুলের গোছা ধরে মুখ নামিয়ে ঘ্রাণ নিল। আবার এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল।

অমৃতা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রাণপণে ঠোঁট চেপে রাখা সত্ত্বেও একটা মিহি গোঙানির টুকরো কীভাবে যেন বাইরে বেরিয়ে আসছিল। বড়-বড় শূন্য চোখে টিভির দিকে ও তাকিয়ে ছিল—কিন্তু ওর চোখ কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। আর কানেও কোনও শব্দ ঢুকছিল না—সুকান্তর ঘন নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া।

অমৃতার চুলের গোছা একপাশে সরিয়ে ওর ঘাড়ের হালকা পালকের মতো চুলে ফুঁ দিল সুকান্ত।

অমৃতা শিউরে উঠল।

চুলের গোছা ছেড়ে দিয়ে ঝট করে ওর সামনে চলে এল সুকান্ত। সরল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, 'আমি কেন খুন করি জানেন? পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলার জন্যে। আর সুন্দর করে তুলতে হলে অসুন্দরকে বিসর্জন দিতে হয়। যেমন, ফুলের বাগানকে সুন্দর করে তোলার জন্যে আগাছা উপড়ে ফেলতে হয়...।'

সুকান্ত বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল আর হাতে-ধরা ছুরিটা অমৃতার গায়ে ছোঁয়াচ্ছিল।

'মাসছয়েক ধরে আমি এই সুন্দর করার কাজে নেমেছি। তাই অসুন্দরকে খতম করাই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য...।' হাসল সুকান্ত। তারপর : 'আপনি তো জানেন, অসুন্দর থেকে অসুন্দরের জন্ম হয়। তাই মেয়েদের দিয়ে কাজ শুরু করেছি। আপনি ছ-নম্বর। এবার শাড়িটা খুলে ফেলুন।'

আবারও বুঝতে পারেনি অমৃতা। কারণ, একটানা সুরে বেশ মোলায়েম গলায় কথাটা বলেছে সুকান্ত।

অমৃতা ইতস্তত করছে দেখে সুকান্ত ছোট্ট করে হাসল, বলল, 'যে-কাজ নিজে পারেন সেটা আমাকে দিয়ে করাবেন না...করালে আপনার ভালো লাগবে না। শাড়িটা খুলে ফেলুন।'

এইমুহূর্তে কেউ কি এসে অমৃতার ঘরের কড়া নাড়বে না? এমন কিছু কি একটা হতে পারে না যাতে সুকান্ত অমৃতাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়? একটা লাইফলাইনও কি অমৃতার কপালে নেই?

শাড়ি খুলতে শুরু করল অমৃতা। ওর মনে লজ্জা যেটুকু-বা তৈরি হচ্ছিল তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল একরাশ ভয়। সুকান্তর হাতের ছুরিটা কখন ওর গায়ে বসবে? কখন?

সুকান্ত একটু পিছিয়ে দাঁড়াল। অমৃতার শাড়ি খোলা দেখতে লাগল।

কোনও পুরুষের সামনে ও পোশাক ছাড়বে এমন গোপন ইচ্ছে অমৃতার ছিল। কিন্তু সেটা যে এইরকম একটা অবস্থায়, তা ও কল্পনা করেনি। ওর কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল অনেক আগেই। এখন কয়েকটা ফোঁটা একজোট হয়ে নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নেমে এল। তারপর ঠোঁটের কোণ ছুঁতেই নোনা স্বাদ টের পেল।

'কাগজওয়ালারা আমার নাম দিয়েছে "নাইফম্যান"।' হাসল সুকান্ত। আপনমনে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আসলে আমি কী জানেন? লাইফম্যান। কুৎসিত জীবন থেকে মুক্তি দিই সুন্দর জীবনে। কারণ, মৃত্যু না-হলে তো পুনর্জন্মের কোনও চান্স নেই! আগে যে-পাঁচটা কুৎসিত মেয়েকে আমি মুক্তি দিয়েছি তার বিনিময়ে আমি কিন্তু কিছু নিইনি। আপনাকে তো আগেই বলেছি, কিছু দিলে তার বদলে কিছু-না-কিছু নেওয়া অনেকের অভ্যেস। আমি সেরকম শাইলক নই। আমি যা দিই এমনি দিই। ফ্রি।'

দুঃখ দিলে সেটাকে কি দেওয়া বলে? মৃত্যু দিলে সেটাও কি দেওয়া?

অমৃতার সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। ও যন্ত্রের মতো শাড়ি খোলা শেষ করে ফেলেছিল। শাড়িটা পায়ের কাছে জড়ো হয়ে পড়েছিল। সুকান্ত পা দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিল একপাশে।

'সত্যি কথা বলুন তো, ম্যাডাম, এইরকম একটা বিচ্ছিরি রূপ নিয়ে আপনার বাঁচতে ইচ্ছে করে?'

অমৃতা বোবা চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে পাগলের মতো মাথা নেড়ে বলতে চাইল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—বাঁচতে ইচ্ছে করে...।'

কিন্তু সুকান্ত যেন সেটা বুঝতেই পারল না। আপনমনেই বলে চলল, 'আমি জানি করে না। আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস, পরের জন্মে আপনি অবশ্যই সুন্দরী হয়ে জন্মাবেন। সেই জীবনটা আপনার এই হতচ্ছাড়া জীবনের চেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগবে। কী এক্সাইটিং তাই না? এবার ব্লাউজটা খুলে ফেলুন।'

কেন জানি না, অমৃতা এই নির্দেশটাই আশা করছিল।

টিভির দিকে তাকাল ও। একটা ভয়ের সিরিয়াল আছে আগামীকাল রাত নটায়—তারই বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছিল। কিন্তু ওর মনে হল আগামীকাল নয়, এখনই সিরিয়ালটা এই ঘরে শুরু হয়ে গেছে। আর টিভির ভেতরের মানুষগুলো অবাক হয়ে দম বন্ধ করে এই সিরিয়াল দেখছে।

অমৃতা আগে কখনও ভাবেনি ব্যাপারটা এরকম উলটে যেতে পারে।

একা-একটা আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে কতবার নিজেকে দেখেছে। মুখ থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত এককণা সৌন্দর্য খুঁজেছে। না, নেই। কোথাও রূপের ছিটেফোঁটামাত্র নেই। আপাদমস্তক কুরূপা কোনও তরুণীকে অনায়াসে বৃদ্ধা বলা যেতে

পারে। এরকম কোনও মেয়ের যৌবনের বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অমৃতার কতবার যে মরে যেতে ইচ্ছে করেছে!

অথচ এখন! মনে হচ্ছে, বেঁচে থাকার চেয়ে সুন্দর কিছু আর নেই।

তাই, বেঁচে থাকার জন্য, ব্লাউজটা খুলে ফেলল অমৃতা।

তারপর, সুকান্তর জরিপ-নজরের সামনে, খুলে ফেলতে হল ভেতরের জামাটাও। কারণ, নির্দেশ সেরকমই আসছিল।

সুকান্ত এবার এগিয়ে এল অমৃতার খুব কাছে। যেমন করে বসন্তের টিকে দেয়, অনেকটা সেইরকম ঢঙে ছুরির ডগা দিয়ে আঁচড় কাটল অমৃতার দুই বুকের মাঝে।

ডুকরে কেঁদে উঠল অমৃতা। কেঁপেও উঠল। সরু রক্তের রেখা মাধ্যাকর্ষণের টানে গড়িয়ে নামতে লাগল নিচের দিকে। জ্বালা হয়তো করছিল, কিন্তু সেটা অনুভব করার মতো মনের অবস্থা অমৃতার ছিল না।

'না, আপনার চামড়া তেমন মোটা নয়।' ছুরির ডগাটা পরীক্ষা করতে-করতে অনেকটা ডাক্তারি সুরে মন্তব্য করল সুকান্ত, 'অনেকের চামড়া অস্বাভাবিক মোটা থাকে। জোরে চাপ দিয়ে ছুরি বসাতে হয়। সবসময় আমি আগে একটু টেস্ট করে নিই—টি ই এস টি টেস্ট, টি এ এস টি ই নয়। আমি দুশ্চরিত্র নই।'

কথা বলতে-বলতে ব্রিফকেসের কাছে গেল সুকান্ত, '...আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার কোনও উপায় নেই। এটা সৌন্দর্যের স্বাধীনতা-যুদ্ধ...' ব্রিফকেসের ওপরে ঝুঁকে পড়ল : '...পরের জন্মের কথা ভাবুন—ভালো লাগবে। উঁ উঁ...এইটা নিই...গুরুর কাজটা দারুণ হবে...' ব্রিফকেস থেকে বাঁকানো ফলার একটা ছুরি তুলে নিল : '...এবার শায়াটা ছেড়ে ফেলুন। আমার হাতে আর বেশি সময় নেই...।'

অমৃতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সুকান্ত। দু-হাতে দুটো ছুরি। চোখে বরফের দৃষ্টি।

তড়িঘড়ি শায়ার দড়ি খুলে ফেলল অমৃতা। আঙুলগুলো অসম্ভব কাঁপছিল বলে দড়ি খুলতে দেরি হয়ে গেল।

শায়াটা খসে পড়ল পায়ের কাছে।

অমৃতা সুন্দরী হলে বলা যেতে পারত গুটিপোকার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল প্রজাপতি। সুকান্তর মনে হল, প্রজাপতি নয়—শুঁয়োপোকা।

ও চটপটে পায়ে চলে এল অমৃতার কাছে। হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। কাস্তে দিয়ে আগাছা কাটার মতো শায়াটার একটা অংশ চেপে ধরে বাঁকানো ছুরি দিয়ে একপোচে কেটে দিল। শায়ার বৃত্ত ছিন্ন হল। ওটা একটানে দূরে ফেলে দিল সুকান্ত। তারপর অ্যাটলাসের ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল অমৃতার পায়ের কাছে।

অমৃতা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ওর শরীরটা ফুলে উঠছিল বারবার। মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে দাঁড়ালে মনের অবস্থাটা কীরকম হয় সেটা ও বেশ বুঝতে পারছিল। না, আর কোনও আশা নেই। অমৃতা খবরের কাগজের খবর হতে চলেছে আগামীকাল। নাইফম্যানের ছ-নম্বর শিকার। কোনও অলৌকিক ঘটনা ওকে আর বাঁচাতে পারবে না।

সুকান্ত পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রের মতো কীসব আওড়াচ্ছিল। হঠাৎই বলল, 'আপনি ইচ্ছে হলে চোখ বুজে ফেলতে পারেন। তা হলে শকটা কম হবে...।'

অমৃতা চোখ বুজে ফেলল। মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। ও শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ভালোবাসার কাঙাল হয়ে কী ভুলটাই না ও করেছে!

সুকান্ত মাথা সোজা করে তাকাল। অমৃতার দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছনের দেওয়ালটা ওর নজরে পড়ছে। ওর চোয়াল শক্ত হল। চোখে একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ও হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল।

ঠিক তখনই তিলটা ওর চোখে পড়ল।

সুকান্ত পাথর হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল তিলটার দিকে।

অমৃতার ডান উরুর ওপরের দিকে একটু ভিতর ঘেঁষে একটা কালো তিল। মাপে মসুরডালের মতো। কাজলের মতো কুচকুচে কালো। অমৃতার ময়লা রঙের ওপরেও তিলটা জ্বলজ্বল করছে।

কী সুন্দর! অপূর্ব!

সুকান্তর হাত থেকে ছুরি খসে পড়ল। অতি সাবধানে আঙুল বাড়িয়ে তিলটাকে ছুঁয়ে দেখল ও।

আসল।

পোশাকের আড়ালে কেউ কখনও নকল বিউটি স্পট তৈরি করে না।

সুকান্তর শরীরে কাঁটা দিল। আসল সৌন্দর্যকে ছোঁয়ার একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে।

এবারে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেল ও।

আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল অমৃতার তিলে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, '"এ-কী সুধারস আনে/আজি মম মন প্রাণে..."।'

অমৃতা থরথর করে কাঁপছিল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সামনের দেওয়ালে ঝোলানো একটা ক্যালেন্ডারের দিকে।

ক্যালেন্ডার আড়াল করে ওর দৃষ্টিপথে এসে হাজির হল সুকান্তর মুখ। অদ্ভুত এক হাসি ওর মুখে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

'আপনার সৌন্দর্যের কোনও জবাব নেই, ম্যাডাম। প্রিয়ার তিলের জন্যে কবি সমরখন্দ-বোখারা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর আমি আপনার প্রাণ দিতে পারব না! আর আপনি তো জানেন, কিছু দিলে তার বদলে আমি কিছু নিই না। আমি শাইলক নই...।'

এরপর ছুরি-টুরি চটপট সব নিজের ব্রিফকেসে গুছিয়ে নিল সুকান্ত। হাসিমুখে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। শেষবারের মতো ফিরে তাকাল অমৃতার দিকে। বলল, 'এবার ভেবে দেখুন, আমি নাইফম্যান, না লাইফম্যান...।'

তারপর বাইরে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

একটা ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল অমৃতা। ওর মধ্যে তা হলে সৌন্দর্য আছে!

না, এই নাইফম্যানের কথা ও কাউকে বলবে না, ওর গোপন সৌন্দর্য আবিষ্কারের কথা গোপনই থাক।

সত্যি, জীবন কী আশ্চর্য! একতিলের জন্য ও আবার বেঁচে গেল।

অনিন্দ্যসুন্দরের অপমৃত্যু

'মৃত্যুর সময়ে বয়স কত হয়েছিল? বাহান্ন—তাই তো?' দেবদূত সূর্যকান্ত প্রশ্ন করল।
'হ্যাঁ—বাহান্ন।' শ্রান্ত স্বরে জবাব দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরী। তাঁর মনে হল, সেই এসে থেকে যেন শুধু প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে যাচ্ছেন।

'মৃত্যুর কারণ?' দেবদূত বলে চলল।

'হার্ট অ্যাটাক। অন্তত আমার তাই ধারণা।' অনিন্দ্যসুন্দর উত্তর দিলেন।

'হুম।' দেবদূতকে যেন সামান্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হল, 'এইবারে শেষ প্রশ্ন। খাতায় লেখা আছে, হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক কারণ, যে-কোনও একটায় দাগ দিন : আত্মোৎসর্গ, দুর্ঘটনা, রক্তচাপ, কায়িক শ্রম, নির্বুদ্ধিতা, খুন ইত্যাদি। এখানে দেখছি "খুন" শব্দটায় টিক মার্ক দেওয়া আছে।'

অনিন্দ্যসুন্দর সোজা হয়ে উঠে বসলেন : 'খুন?'

'হ্যাঁ,' সূর্যকান্ত বলল, 'খাতার এই পাতাটা আপনার নামে। এখানে তো দেখছি, খুনই বলা আছে। অবশ্য আমার ভুল হলে আপনি ধরিয়ে দেবেন বইকী। আপনি তো খুনই হয়েছেন, তাই-না, মিস্টার চৌধুরী?'

'না, মানে, আমি তো সেরকম ভাবিনি। আমি...।'

'তার মানে, আপনি যে খুন হয়েছেন, তা আপনি জানেন না?' সহানুভূতির সুরে বলল সূর্যকান্ত।

'না, এ-আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!'

সূর্যকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল : 'হ্যাঁ, কখনও-কখনও যে এরকম হয় না তা নয়। তবে খুন হলে বেশিরভাগ লোকই সেটা বুঝতে পারে। অন্তত শেষ মুহূর্তে হলেও টের পায়। এধরনের খুনের খবর যে কীভাবে মোলায়েম করে ভাঙতে হয়, তা আমি আজও শিখলাম না।'

'এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না।' বেশ কয়েকবার এই কথাটা আপনমনে উচ্চারণ করলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

'আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে দুঃখিত, মিস্টার চৌধুরী। তবে জানবেন, এখানে এসবে কিছু যায় আসে না।'

'মনে আছে, আমি স্টাডি-রুমে বসেছিলাম। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎ এক সাংঘাতিক যন্ত্রণায় আমার ঘুম ভেঙে যায়...ঠিক বুকের ভেতর...তারপর আর কিছু ভেবে ওঠার সময় পাইনি।'

'এছাড়া আরও একটা কথা এখানে লেখা আছে,' খাতায় চোখ বুলিয়ে সূর্যকান্ত বলল, 'আঘাতটা আপনার হার্টেই লেগেছিল, মিস্টার চৌধুরী। আপনারই কাগজ-কাটার ছুরি দিয়ে আপনাকে আঘাত করা হয়েছে...পিঠে...।'

'এতো রীতিমতো পৈশাচিক,' বিস্মিত সুরে বলে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'আমার কাগজ-কাটার ছুরিটা কী সুন্দর...ওটার হাতলটা সত্যিকারের হাতির দাঁতের তৈরি...কে এ-কাজ করেছে?'

'তার মানে? কে কী কাজ করেছে?'

'কে আমাকে খুন করেছে?'

'সেকী! আমি কী করে জানব?'

'আপনি না-জানলে, কে জানবে! আমি তো ভেবেছি আপনার ওই নরকের খাতায় সব খবরই লেখা আছে।'

'এটা নরকের খাতা নয়।'

'সে যাই হোক, বলুন, কে আমাকে খুন করেছে?'

'মিস্টার চৌধুরী!' কঠোর স্বরে বলে উঠল সূর্যকান্ত, 'প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা ইত্যাদিকে এখানে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না—এটা আপনার জানা উচিত।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি এমনিই জানতে চাই।'

'আপনাকে কে খুন করেছে, আমি জানি না, মিস্টার চৌধুরী। আমি দেবদূত হতে পারি, তাই বলে সবজান্তা নই। কারও সম্পর্কে আমরা সমস্ত তথ্য জানতে পারি তার মৃত্যুর পর। তখনই তার নামে খাতা তৈরি হয়। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার খুনের জন্যে যে দায়ী তার মৃত্যুর পর সব তথ্য আমার হাতে আসবে, তখন সহজেই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।'

'সেটা কবে?'

'যদি খুনি ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়, তা হলে—বলতে পারেন, খুব শিগগিরই জানতে পারব। আর খুনি যদি সেরকম চালাক হয়ে থাকে এবং পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারে, তা হলে অনেক বছরের ধাক্কা।'

'অতদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না! আমি এক্ষুনি জানতে চাই।' অনিন্দ্যসুন্দর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করলেন।

'মিস্টার চৌধুরী, আমি দুঃখিত...।'

'এখানে এমন কেউ নেই, যিনি সব জানেন?'

'অবশ্যই আছেন, দেবরাজ। উনি সব জানেন।'

'তা হলে তাঁকেই জিগ্যেস করুন।'

'অসম্ভব। এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে পারি না। মিঃ চৌধুরী, বসুন।'

কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করলেন না অনিন্দ্যসুন্দর, পায়চারি করেই চললেন। তারপর হঠাৎই সূর্যকান্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বলেছিলেন, এখানে আমি সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারব?'

'নিশ্চয়ই।' গভীর আশ্বাসের সুরে বলল সূর্যকান্ত।

'কে আমাকে খুন করেছে সেটা না-জানতে পারলে কী করে আমি সুখে-শান্তিতে

থাকব বলতে পারেন?'

'তাতে অসুবিধেটা কী আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না, মিস্টার চৌধুরী!'

বেশ চেষ্টা করে নিজেকে গুছিয়ে নিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, তারপর সোনার চেয়ারে আবার বসলেন। শান্ত স্বরে বলতে শুরু করলেন, 'সূর্যকান্তবাবু, দয়া করে বলবেন, আপনার খাতায় আমার পেশার জায়গায় কী লেখা আছে?'

'আপনি রহস্য-গোয়েন্দা গল্পের লেখক ছিলেন।'

'ঠিক তাই। সুন্দর সান্যাল ছদ্মনামে আমি পঁচাত্তরটা রহস্য উপন্যাস লিখেছি—তার একডজনেরও বেশি সিনেমা হয়েছে—এ ছাড়া অসংখ্য ছোট গল্প তো আছেই। এ থেকে কিছু আঁচ করতে পারছেন, সূর্যকান্তবাবু?'

'না, মানে, ঠিক...।'

'এখনও বুঝতে পারছেন না?' অনিন্দ্যসুন্দর প্রায় ধৈর্য হারালেন : 'আমি কে, না, প্রখ্যাত রহস্যকাহিনীকার সুন্দর সান্যাল, বিগত তিরিশ বছর ধরে যে শুধু প্রশ্ন করে গেছে, কে খুন করেছে? এবং বারবার তার উত্তরও দিয়েছে। আর, এখন! আমি নিজেই খুন হলাম অথচ জানি না, কে আমাকে খুন করেছে!'

দেবদূত সূর্যকান্ত হাসল। বলল, 'এবার আপনার কথা ধরতে পেরেছি, মিস্টার চৌধুরী। কিন্তু যে-প্রশ্নের উত্তর আপনি জানতে চান তা যথাসময়ে আমাদের হাতে আসবে। এখন একটু ধৈর্য ধরে শান্ত হোন—।'

'খুনির পরিচয় আমাকে জানতেই হবে,' অনিন্দ্যসুন্দর উদ্দেশ্যে অটল, 'সেটা না-জানা পর্যন্ত আমার সুখ নেই, শান্তি নেই। পিঠে ছুরি মেরে খুন করেছে! ওঃ কী আস্পর্ধা!'

সূর্যকান্ত সান্ত্বনার সুরে বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, অল্পেতে হতাশ হবেন না। আগে এ-জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখুন। যেসব সুখ-সুবিধে এখানে আছে...।'

অনিন্দ্যসুন্দর চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন, মেঝের দিকে চোখ রেখে বললেন, 'আমি কিচ্ছু দেখতে চাই না। এসব সুখ-সুবিধে শুধু কথার কথা।'

'মিস্টার চৌধুরী!'

'মিথ্যে। সব মিথ্যে। সুখ! শান্তি! আমার মনে এতটুকু সুখ নেই। আমার এখানে একটুও ভালো লাগছে না।'

'এখানে আপনার ভালো লাগতে বাধ্য,' সূর্যকান্তের স্বরে আতঙ্ক উঁকি মারল : 'এখানে সুখী না-হওয়াটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ এটা স্বর্গ—আপনি স্বর্গে রয়েছেন, মিস্টার চৌধুরী।'

'স্বর্গ না ঘেঁচু! আমার এখানে একটুও ভালো লাগছে না।'

দেবদূত উঠে দাঁড়াল। সুন্দর মার্বেল পাথরের মেঝেতে নগ্ন পায়ে নিঃশব্দে পায়চারি করতে লাগল। আপনমনেই বারকয়েক বিড়বিড় করে বলল, 'কী অদ্ভুত কাণ্ড! নাঃ, এ অসম্ভব।' তারপর অনিন্দ্যসুন্দরের দিকে ফিরে বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, আর-একবার ভেবে দেখুন। আপনি...।'

'না, আমার একটুও ভালো লাগছে না।'

'দয়া করে একটু বোঝার চেষ্টা করুন, মিস্টার চৌধুরী।' সূর্যকান্ত অনুনয় করল, 'আপনি যদি এভাবে সারা স্বর্গে ঘুরে বেড়ান আর বলতে থাকেন, আপনার মনে এতটুকু সুখ-শান্তি নেই, তা হলে আমাদের সম্মান, সুনাম সব কোথায় যাবে বলুন তো? স্বর্গে এসে আপনার মনে সুখ নেই এ-কথা শুনলে, লজ্জায়, অপমানে দেবরাজ ইন্দ্রের যে মাথা কাটা যাবে!'

'বিশ্বাস করুন, আমার মনে এতটুকু শান্তি নেই।' অনিন্দ্যসুন্দর আবার বললেন, এবং তাঁর অভিব্যক্তিতেও সে-ইঙ্গিত স্পষ্ট।

'ঠিক আছে, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে জিগ্যেস করে দেখছি।' সূর্যকান্ত বলল। তার অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল, এইমুহূর্তে সুখ এবং শান্তি তার মন থেকেও উবে গেছে। একটু ইতস্তত করে সে আবার বলল, 'দেবরাজ এত ব্যস্ত থাকেন...তা ছাড়া আজকাল তাঁর মেজাজটাও ভালো নেই। কিন্তু তাঁকে তো বলতেই হবে। নইলে তিনি যদি একবার জানতে পারেন যে, স্বর্গে এসেও একজন মানুষ অসুখী, তা হলে আমাকেই দোষ দেবেন। আমি এই ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার, মিস্টার চৌধুরী। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এখানকার সব দায়দায়িত্ব আমার ঘাড়েই চাপবে।'

'ভালো না-লাগলে কী করব বলুন!'

শিউরে উঠে দেবদূত আবার পায়চারি শুরু করল। খোলা জানলা দিয়ে মাঝে-মধ্যে ভেসে আসছে উচ্ছল হাসির টুকরো শব্দ, কখনও-বা সঙ্গীতের হালকা সুর। কিন্তু ঘরের ভেতরে অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরী গম্ভীর হতাশ মুখে বসে।

হঠাৎই সূর্যকান্তের মুখে হাসি ফুটে উঠল। দ্রুতপায়ে নিজের টেবিলের কাছে ফিরে গেল সে, বসল চেয়ারে।

'মিস্টার চৌধুরী, আপনি তো রহস্য গল্পের লেখক,' দ্রুত স্বরে বলতে শুরু করল দেবদূত, 'সূত্র তৈরি করতে বা খুনিদের ফাঁদে ফেলতে আপনার জুড়ি নেই, কী বলেন?'

'তা বলতে পারেন।'

সূর্যকান্ত বলে চলল, 'যে-মতলবটা আমার মাথায় এসেছে সেটা পুরোপুরি বেআইনি, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এ ছাড়া পথ নেই। মিস্টার চৌধুরী, যদি আপনাকে আবার পৃথিবীতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তা হলে আপনি পারবেন নিজের হত্যা-রহস্যের সমাধান করতে? কী মনে হয় আপনার?'

'সে আমি বোধহয়...।'

'এর বেশি আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।' কঠোর স্বরে বলল সূর্যকান্ত।

'চেষ্টা করে দেখতে পারি, কিন্তু আমি কীভাবে...?'

'খুব সহজ।' বাধা দিয়ে বলল সূর্যকান্ত, 'আপনি এখন পরলোকে বাস করছেন, সুতরাং সময় বলে এখানে কিছু নেই। আমরা শুধু যা করব, তা হল, একটা সময়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাব, মানে, অ্যাকশন রিপ্লে করব...ধরুন, একটা দিন। আপনি পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আপনার মানবজীবনের শেষ দিনটা আবার নতুন করে বাঁচবেন। দেখুন...এই যে! আপনি

মারা গেছেন রাত ঠিক এগারোটায়। সেইদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত সময় আপনাকে দেওয়া হল।'

'মাত্র একটা দিন?' অনিন্দ্যসুন্দরের ভুরু কুঁচকে উঠল : 'ওইটুকু সময়ে কি পারব?'

'তা যদি না-পারেন, তা হলে চেষ্টা করে আর...।'

'না, পারব।' ঝটিতি বলে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'বলুন, কখন যেতে হবে?'

'এক্ষুনি। কিন্তু প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি, মিস্টার চৌধুরী। জীবনের শেষ দিনটার প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা এই খাতায় লেখা রয়েছে, সুতরাং সেরকম কোনও তথ্যগত পরিবর্তন আপনি করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরি তো আপনাকে করতেই হবে, যেটা আপনি প্রথমবারে করতে পারেননি। আর, দরকার হলে খাতায় অল্পস্বল্প মোছামুছি আমি করে নেব, কিন্তু সেরকম বড় কিছু পালটাতে গেলে ভীষণ মুশকিলে পড়তে হবে।'

'কিন্তু—।'

'সোজা কথায়, বড়সড় কোনও ওলটপালট ছাড়াই আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে। এতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মনে রাখবেন, মরণশীল প্রাণীদের যে-বর কুচিৎ-কখনও দেওয়া হয়, সেই অমূল্য বর আপনাকে দেওয়া হবে।'

'ভবিষ্যৎদৃষ্টি!' বিস্ময়ে বলে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

'হ্যাঁ। কিন্তু, মিস্টার চৌধুরী, আগেই বলে রাখি, আপনাকে কিন্তু আবার একইভাবে খুন হতে হবে।'

অনিন্দ্যসুন্দরের উজ্জ্বল চোখ মুহূর্তে নিভে গেল। হতাশ সুরে তিনি বললেন, 'আবার সেই পিঠে ছুরি খেয়ে মরতে হবে—।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল দেবদূত। বলল, 'খাতায় তাই লেখা আছে।' তারপর অমোঘ নির্ঘোষের মতো গর্জে উঠল তার মন্দ্রস্বর, 'আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়া-না-হওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছে। মত দেওয়ার আগে ভালো করে ভেবে দেখুন।'

'না...আমি রাজি। কে আমাকে খুন করেছে জানতেই হবে।'

'বেশ, তা হলে তাই হোক। আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন, মিস্টার চৌধুরী। এখানে সমস্ত আত্মাই সুখী হোক, সেটাই আমরা চাই।'

'ধন্যবাদ।' অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর এবং বিশাল সোনার দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

...ঘুম ভাঙল তাঁর নিজের বিছানায়, নিজের বহুপরিচিত শোওয়ার ঘরে। বাড়িটা অন্ধকার ছায়াময় এক প্রাচীন প্রাসাদ। অনিন্দ্যসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয়। কারণ, তাঁর ধারণা, কোনও রহস্যকাহিনীকারের পক্ষে এ-বাড়ির প্রকৃতি ও পরিবেশ যথেষ্ট মানানসই। বসবার ঘরের সুপ্রাচীন পিতামহ-ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। শুয়ে-শুয়েই

ঘন্টার শব্দ শুনে চললেন তিনি, এবং হঠাৎই তাঁর মনে হল, এ-হয়তো রাত এগারোটার ইঙ্গিত—কিন্তু সে-এক ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্য। তারপরই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন অনিন্দ্যসুন্দর। দেখলেন, পরদার ফাঁক দিয়ে তীব্র সূর্য ঘরের মেঝেতে জায়গা করে নিয়েছে। এখন তা হলে বেলা এগারোটা। সুপ্রসিদ্ধ লেখকের ঘুম থেকে ওঠার উপযুক্ত সময়ই বটে। অনিন্দ্যসুন্দর বরাবরই রাত জেগে লেখেন, ফলে এগারোটায় ভোর হওয়া তাঁর কাছে রোজকার ব্যাপার। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। ইস, কতটা সময় শুধু-শুধু নষ্ট হল। হাতে আর মাত্র বারোটা ঘন্টা। মনে-মনে আপশোস করে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন।

দরজায় অনেকক্ষণ ধরেই কেউ নক করছিল।

'ভেতরে এসো।' অনিন্দ্যসুন্দর বললেন।

দরজা খুলে তাঁর সেক্রেটারি কিংশুক বোস ঘরে ঢুকল। বলল, 'একটু আগেই চিঠিপত্র এসেছে—।'

'তা কী হয়েছে?'

'দেখলাম, রমেন গুপ্তর একটা চিঠি রয়েছে।' কিংশুক একটা চিঠি এগিয়ে দিল অনিন্দ্যসুন্দরের দিকে।

রমেন গুপ্ত 'লহরী প্রকাশন'-এর মালিক এবং অনিন্দ্যসুন্দরের বহু রহস্য উপন্যাসের প্রকাশক। চিঠিটা হাতে নিয়ে কিংশুককে আবার নতুন করে জরিপ করলেন তিনি। কিংশুক বোস শিক্ষিত, নম্র স্বভাবের মানুষ। তাঁর বাড়িতেই থাকে। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। কদাচিৎ হাসে। এখন, এই মুহূর্তে, ওর ঠোঁটের কোণে হালকা হাসির ছোঁয়া। ও বলল, 'সাধারণ চিঠি ভেবে আমি ওটা খুলে পড়েছি। মনে হল, চিঠিটা আপনার পড়ে দেখাটা খুব জরুরি।

চিঠিটায় চোখ রাখলেন অনিন্দ্যসুন্দর :

প্রিয় অনিন্দ্য,

আশা করি, কুশলে আছ। জরুরি প্রয়োজনে তোমাকে এ-চিঠি লিখছি। যা বলবার খোলাখুলিই বলব। তোমার শেষ উপন্যাসটা, 'খুনের নাম পাপ', রীতিমতো গোলমেলে করেই আমি ছেপেছি। হয়তো ভালোই বিক্রি হবে—যদি হয় তা শুধু তোমার নাম আর খ্যাতির জন্যে। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয়, ইদানীং তোমার লেখা বেশ ঢিলে হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটা বই তার আগের বইয়ের চেয়ে দুর্বল। তোমার প্লটের সমুদ্র কি শুকিয়ে এসেছে? মনে হয়, তোমার একটা লম্বা বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু তোমার সঙ্গে আরও তিনটে বই ছাপার চুক্তি থাকায় আমি তো মহা মুশকিলে পড়েছি। সেই নিয়েই কথাবার্তা বলতে বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ তোমার বাড়িতে যাব। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। ইতি—

তোমার রমেন

'তোমার রমেন,' তিক্ত হাসি হাসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। প্রকৃত বন্ধুই বটে! হঠাৎই তাঁর খেয়াল হল কিংশুক এখনও দাঁড়িয়ে।

'আমার একটা সাজেশন আছে।' ও বলল।

'তাই নাকি!' কঠোর স্বরে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর।

'রমেনবাবুর মত, আপনি কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিন। আমারও তাই মত। কিন্তু যে-কদিন আপনি বিশ্রাম নেবেন, বিখ্যাত সুন্দর সান্যালের রহস্য উপন্যাসের আনন্দ থেকে পাঠক-পাঠিকাদের বঞ্চিত করার কোনও প্রয়োজন নেই।'

'তার মানে?' বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নেমে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর।

শান্ত স্বরে কিংশুক বলল, 'সুন্দর সান্যাল ছদ্মনামে আমিই নতুন-নতুন বই লিখতে থাকব। রমেন গুপ্তকে জানানোর কোনও দরকার নেই। আর, আমাদের পাঠক-পাঠিকাদেরও জানিয়ে কোনও লাভ নেই।'

'আমাদের পাঠক-পাঠিকা! তোমার কি ধারণা, আমার মতো ভাষা আর স্টাইলে তুমি লিখতে পারবে?'

'তার চেয়েও বেশি পারব, মিস্টার চৌধুরী। আপনার চেয়ে আমি অনেক ভালো লিখব।'

'কী—এতখানি আস্পর্ধা তোমার! এত দুঃসাহস!'

'মিস্টার চৌধুরী, মনে করে দেখুন তো, আপনার শেষ কয়েকটা বইতে আমি কীভাবে আপনাকে হেল্প করেছি? প্লট নিয়ে মাথা ঘামানো থেকে শুরু করে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সম্পাদনা—সবই আমি করেছি।'

'বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। গেট আউট!'

'...সুন্দর সান্যালের সুনাম বজায় রাখতে গেলে এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। বইয়ের রয়্যালটি যা পাব, আমি আর আপনি আধাআধি ভাগ করে নেব।'

'কাল থেকে তোমাকে আর কাজে আসতে হবে না। তোমার ছুটি!'

'মিস্টার চৌধুরী...।'

'বেরিয়ে যাও!'

'আমার মতো কাজের লোক আর আপনি পাবেন না। তা ছাড়া, আমি না-হলে আর একটা বইও আপনি নিজে লিখতে পারবেন না।'

'শিগগির মালপত্র গুছিয়ে রওনা হও, কিংশুক, নইলে তোমাকে আমি ঘাড় ধরে বের করে দেব!'

'আপনাকে এর জন্যে পস্তাতে হবে।' এই কথা বলে কিংশুক ঘর ছেড়ে চলে গেল।

হ্যাঁ, এইভাবেই অনিন্দ্যসুন্দরের জীবনের শেষ দিনটা শুরু হয়েছিল। রমেন গুপ্তর চিঠি এবং কিংশুকের সঙ্গে ঝগড়া। একই ঘটনা হুবহু দুবার ঘটলে কীরকম অদ্ভুতই না-লাগে। যেন এ-ঘটনা আগেও ঘটেছে—হয়তো কোনও স্বপ্নে...।

এ-চিন্তায় চমকে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর। স্বপ্ন? দেবদূত সূর্যকান্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার ব্যাপারটা সত্যিই কোনও স্বপ্ন নয় তো?

তাঁর অভিনব চিন্তাধারায় বাধা দিয়ে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। এক্সটেনশান ফোনটা তাঁর হাতের কাছেই। সুতরাং যান্ত্রিকভাবেই ফোন তুললেন অনিন্দ্যসুন্দর।

'হ্যালো?'

আলোচনা করে দেখো। আমি যে তোমাদের ব্যাপার সব জানি, সে-কথা ওকে বলো। তারপর দুজনে মিলে ঠিক করো কী করবে। এখন তোমার মাত্র দুটো পথ খোলা আছে। প্রথমটা হল, আমাকে ছেড়ে রণবিলাসের সঙ্গে চলে যাওয়া। অবশ্য, এটা মনে রেখো, ওর পকেটে একটা ফুটো পয়সাও নেই, আর আমি নিজের পয়সা খরচ করে তোমাদের প্রেমকুঞ্জ বানিয়ে দেব, এ-আশা তুমি নিশ্চয়ই করো না। রণবিলাসের সঙ্গে উপোস করে-করে যখন তোমার সমস্ত শখ মিটে যাবে, তখন ইচ্ছে করলে আমার কাছে আবার ফিরে আসতে পারো। আর তোমার দ্বিতীয় পথ হল, এখানে থেকে যাওয়া। সেক্ষেত্রে, আমি চাইব তোমার বিশ্বাস, সততা। আর শ্রীরণবিলাস দত্তকে অন্য কোনও আস্তানা থেকে দু-বেলা দু-মুঠোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

অনিন্দ্যসুন্দর মনে-মনে ভাবলেন, এতেই রণবিলাস-অধ্যায়ের একটা হেস্তনেস্ত হবে। তৃণা শুধুমাত্র ভালোবাসা অবলম্বন করে বেঁচে থাকার মেয়ে নয়। আয়েস-স্বাচ্ছন্দ্যে থেকে-থেকে ওর অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে—প্রাচুর্য আর বিলাসিতা ওর জীবনের সঙ্গে আন্তরিকভাবে জড়িত। কিন্তু এই চূড়ান্ত নোটিস তিনি আগেও একবার দিয়েছেন। শুধু একটা জিনিস তখন ভাবেননি। এখন ভাবছেন। তৃণার খুন করার মোটিভ।

সারাটা জীবনে লেখক হিসেবে যে-প্রচুর অর্থ-প্রতিপত্তি তিনি অর্জন করেছেন, তার অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী এখন তৃণা। তাঁর উইলে সেই কথাই লেখা আছে। রণবিলাস যদি সে-কথা জানত! তাঁর তৃণা যদি সত্যিই ছেলেটাকে নিজের করে চায়, আর একইসঙ্গে তাঁর উইলে নিজের উত্তরাধিকারও বজায় রাখতে চায়, তা হলে ওর সামনে মাত্র একটা পথই খোলা আছে...।

'তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে তো?' তৃণা তাঁকে প্রশ্ন করছে।

'না,' উদার স্বরে উত্তর দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'শুধু-শুধু তোমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না। তা ছাড়া, এই তো, এত বেলায় জলখাবার খাচ্ছি। তারপর কিছু দরকারি কাজও আছে।'

এরপর তৃণা চলে গেল। অনিন্দ্যসুন্দর তাকিয়ে রইলেন ওর অপস্রিয়মাণ তন্বী শরীরের দিকে। তারপর মনোযোগ দিলেন ডিম ও পাঁউরুটির প্রতি, দ্রুতহাতে প্রাতরাশ শেষ করলেন।

মধ্যাহ্নভোজের অতিথির জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজনের দায়িত্ব সীতার মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাইনিংরুম থেকে।

এবার তিনি হাজির হলেন স্টাডি-রুমে—তাঁর রক্তে রঞ্জিত অকুস্থলে।

নিজের মরণ-কামরায় ঢুকে ভয় পেলেন অনিন্দ্যসুন্দর। সমস্ত জানলায় পরদা টানা থাকায় গোটা ঘরটা ছায়াময় রহস্যে ছমছমে। অস্বস্তিভরে পরদাগুলো সরিয়ে দিলেন তিনি। সূর্যের আলো ঠিকরে এল ঘরের ভেতরে। এবার তিনি চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলেন।

ওই তো তাঁর মজবুত মেহগনি কাঠের টেবিল। নিশ্চয়ই তিনি টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে ছিলেন। হয়তো, প্রায়ই যেমন ঘুমিয়ে পড়েন, সেরকমই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—

টেবিলে দু-হাত ছড়িয়ে এবং মাথা হাতের ওপরে এলিয়ে। সোজা কথায় খুনিকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছেন। আর, ওই তো সেই কাগজ-কাটার ছুরিটা। অনিচ্ছাভরে ছুরিটা তুলে নিলেন তিনি, যেন ওটার ফলায় লেগে রয়েছে শুকনো কালচে রক্ত।

অবশ্য রক্ত থাকার কথা নয়...অন্তত এখন।

না, জিনিসটা খুনের এক কুৎসিত হাতিয়ার, মনে-মনে ভাবলেন অনিন্দ্যসুন্দর। ছুরির হাতলটা মসৃণ ভারি হাতির দাঁতের তৈরি, প্রায় ইঞ্চিচারেক লম্বা। খুনি যদি অসতর্ক হয়, তা হলে তার স্পষ্ট হাতের ছাপ রেখে যাবে এই ছুরির বাঁটে। চকচকে ফলাটা বেশ লম্বা—কিন্তু খুব ধারালো কিংবা ছুঁচলো নয়। তবে অব্যর্থ নিশানায় উপযুক্ত শক্তিতে প্রোথিত হলে কার্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট—কোনও মানুষের হৃৎপিণ্ড সহজেই স্তব্ধ হবে।

শিউরে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

দরজায় কারও নক করার শব্দে তাঁর চিন্তার ঘোর বিচ্ছিন্ন হল। কোনওরকম আমন্ত্রণের অপেক্ষা না-করেই যে নক করেছে সে ঘরে ঢুকল।

'ব্যস্ত আছ, সুন্দরকাকা?'

'না, না। আয় অভী, ভেতরে আয়।'

অভীক ভেতরে ঢুকে লাফিয়ে উঠে বসল টেবিলের ওপর। ওর শরীরের ওজনে আর্তনাদ করে উঠল মজবুত মেহগনি টেবিল। অভীকের প্যাঁচার মতো ছোট-ছোট চোখ পুরু চশমার কাচের পিছন থেকে জুল-জুল করে চেয়ে রইল।

'টাকা-পয়সার অবস্থা কীরকম, সুন্দরকাকা?'

'এবার কত লাগবে?' অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

'তিনহাজার।'

রিভলভিং চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। টেবিলের ওপরে বসা মাংসের স্তূপটিকে লক্ষ করতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, 'অভী, আগেরবারই তো তোকে বলেছি, এভাবে তোর ধার-দেনা আর আমি শোধ করতে পারব না। অন্তত, যদ্দিন না তুই একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছিস। সুতরাং আমার সোজা উত্তর হল, না।'

'আমার অবস্থা খুব খারাপ, সুন্দরকাকা।'

'সে তুই বুঝবি।'

'তা কী করব বলবে তো?'

'সেও তোর ব্যাপার।'

'তা হলে আমাকে হুট করে যা-হোক একটা কিছু করতে হবে...।'

এই মন্তব্যে চমকে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তৃণা ও কিংশুকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার মতো অভীকের সঙ্গে তাঁর এই আলোচনা আগেও একবার হয়ে গেছে! তাঁর সম্পত্তির বাকি অর্ধেকের উত্তরাধিকারী অভীক—না, অনিন্দ্যসুন্দর ভালোবেসে এই অংশ ওকে দেননি, তাঁর একমাত্র আত্মীয় হওয়ার সুবাদে এই সম্পত্তি অভীকের প্রাপ্য। আর এখন সেই অকালকুষ্মাণ্ড ভাইপো তাঁর কাছে এসে টাকা চাইছে।

খুনের আরও-একটা মোটিভ।

'হুট করে কিছু...করে বসবি...এর...এর মানে কী, অভী?'

'জানি না। কিন্তু তুমি টাকা না-দিলে যা-হোক একটা কিছু তো আমাকে করতে হবে—আর তার জন্যে পুরোপুরি দায়ী হবে তুমি।'

বিশাল স্তূপটা টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল দরজার দিকে, এবং নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে। এত মোটা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভাইপো অভীকের চলাফেরায় কেমন একটা চাবুকের ভঙ্গি রয়েছে। আশ্চর্য, কই আগে তো কখনও অনিন্দ্যসুন্দর এটা খেয়াল করেননি। অবশ্য, আজ তিনি এমন-এমন সব জিনিস আবিষ্কার করছেন, যা আগে কখনও লক্ষই করেননি।

জানলা দিয়ে ছিটকে আসা রোদ হঠাৎই তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। না, এই মুহূর্তে ঘরটা তাঁর একটুও ভালো লাগছে না। বরং বাইরের খোলা হাওয়ায় একটু ঘুরে এলে কেমন হয়! তা ছাড়া শীতের মধ্যে রোদের আমেজটা ভালোই লাগবে—আর ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা-ভাবনারও প্রয়োজন আছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

বাগানে এসে নির্জনতার পরিবর্তে হীরা সিংকে আবিষ্কার করলেন তিনি। বৃদ্ধ হীরা সিং বাগানের মালি, কেয়ারটেকার, ড্রাইভার—একাধারে সব, এবং কখনও-সখনও সীতা ও সীতার মায়ের অনুপস্থিতিতে রান্নাবান্নাও করে। এ ছাড়া হীরা সিংয়ের আরও-একটা পরিচয় হল, সে জেলখাটা কয়েদি। এখানে এসে অনিন্দ্যসুন্দরকে সে অনেকভাবে সাহায্যও করেছে। মালিকের দেওয়া তরল নেশা গলায় ঢেলে ঘোরের মাঝে নিজের জীবনের বহু অপকীর্তির কথাই অনিন্দ্যসুন্দরকে শুনিয়েছে। আর অনিন্দ্যসুন্দর সেইসব কীর্তিকাহিনী টুকে নিয়েছেন নিজের ডায়েরিতে। বাড়িয়েছেন তাঁর প্লটের সঞ্চয়। তিনি জানতেন, এর কিছু-কিছু ঘটনা এখনও পুলিশের অজানা, এবং সেই অপরাধগুলোর জন্য কোনও শাস্তি পায়নি হীরা সিং। বহু জায়গাতে এখনও তার নামে হুলিয়া ঝুলছে।

এইমুহূর্তে প্লট সংগ্রহের মরজি অনিন্দ্যসুন্দরের ছিল না। কিন্তু হীরা সিংয়ের মনে বুঝি অন্য অভিসন্ধি ছিল।

'নানা রকোম কোথা কানে আসছে, বড়েসাব।'

'কী কথা, হীরা সিং?'

'আপনার কিতাবের কোথা—।'

'আমার বইয়ের কথা? কী হয়েছে আমার বইতে?'

'শুনেছি কি আপনি আর কিতাব লিখবেন না?'

ও, কিংশুক দেখছি সবাইকে বলে বেড়িয়েছে! রমেন গুপ্তর চিঠির সারমর্ম তা হলে বাড়িতে আর কারও জানতে বাকি নেই। তৃণা জানে, রণবিলাস জানে, এমনকি অভীকও জানে।

'সে-কথা যদি সত্যিও হয়, তা হলে তোমার কী আসে-যায়, হীরা সিং? চাকরি খোয়া যাবে?'

আড়চোখে তাঁর দিকে তাকাল বৃদ্ধ হীরা সিং। প্রখর সূর্যের আলোয় তার কুৎসিত চেহারা আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে। সে উত্তর দিল, 'নোকরির কোথা ভাবছি না, বড়েসাব, ভাবছি আপনাকে যে-সব কহানী সুনিয়েছি তার কোথা। যতোদিন আপনি কিতাব লিখছিলেন, ততোদিন সব ঠিক ছিল। কিন্তু আভি কিতাব লিখা বন্ধো হয়ে গেলে, আপনি হয়তো পুলিশের সাথে বাতচিত করতে পারেন। তাদের বোলতে পারেন আমার পুরানা কিস্‌সার কোথা—।'

'সে আমি কেন বলতে যাব, হীরা সিং? তুমি কবে কী করেছ, তাতে আমার কী? তুমি এখন ভালো হয়ে গেছ, আমার এখানে চাকরি করছ, সৎভাবে জীবনযাপন করছ।'

'পুলিশ ওসব শুনবে না।'

'আমি তো আর পুলিশকে কিছু বলতে যাচ্ছি না...হীরা সিং, আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

স্পষ্টই বোঝা গেল বিশ্বাস সে করেনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে বুড়ো লোকটা কোদাল দিয়ে আবার মাটি কোপাতে লাগল। তার কোদাল চালানোর ভঙ্গি বলিষ্ঠ, ক্ষিপ্র, নিখুঁত। আর ভাঁজ-পড়া মুখ অন্ধকার এবং ভয়ঙ্কর।

অদ্ভুতভাবে অনিন্দ্যসুন্দরের আবার মনে পড়ল, এসবই আগে একবার ঘটে গেছে। নিজের বাগানে কবর খুঁড়ে এইমুহূর্তে তিনি আবিষ্কার করেছেন এক ভয়ঙ্কর সম্ভাব্য খুনিকে।

স্টাডি-রুমে টেবিলের কাছে আবার ফিরে এলেন তিনি, শ্লথ ভঙ্গিতে বসে পড়লেন চেয়ারে। আশ্চর্য, প্রথমবারে যখন জীবনের শেষ দিনটা এইভাবে তিনি কাটিয়েছিলেন তখন তো এসব কথা তাঁর মনে আসেনি। তখন কেন বুঝতে পারেননি, তাঁকে ঘিরে রয়েছে এমন সব ভয়ঙ্কর মানুষেরা, যারা তাঁর মৃত্যুতে লাভবান হবে? একমাত্র সীতা আর সীতার মা ছাড়া তাঁকে খুন করবার উপযুক্ত মোটিভ প্রত্যেকেরই রয়েছে। এবং তাদের অন্তত একজনের সে-কাজ সম্পন্ন করবার দুঃসাহসও রয়েছে।

টেলিফোন বেজে উঠল। কোনওরকম চিন্তা-ভাবনা না-করেই অনিন্দ্যসুন্দর টেলিফোনটা তুলে নিলেন।

'সূর্যকান্ত বলছি।'

'ও...বলুন।'

'কোনও গণ্ডগোল হয়েছে নাকি, মিস্টার চৌধুরী? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, মুষড়ে পড়েছেন?'

'ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছি।'

'তাই নাকি?'

'দুজন ঠিকে কাজের লোক ছাড়া আমার বাড়ির প্রত্যেকে আমি মরলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।'

'এতে মন খারাপ করার কিছু নেই, মিস্টার চৌধুরী।'

'নেই?'

'যদি বোঝেন পৃথিবীতে কেউ আপনাকে চায় না, তা হলে এখানে ফিরে আসতে আপনার একটুও দুঃখ হবে না।'

'হুম। ঠিকই বলেছেন।'

'আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো, মিস্টার চৌধুরী?'

'সত্যি বলতে কি, একটা অসুবিধে হচ্ছে। কোনও সূত্র এখনও পাইনি।'

'খোঁজার চেষ্টা করুন।'

'সেইখানেই তো হয়েছে বিপদ। এমনিতে আমার বইয়ে—কিংবা বাস্তবেও—সূত্র পাওয়া যায় খুনের পরে, আগে নয়। খুন করার পরেই খুনি সমস্ত সূত্র ফেলে যায়। এবার বলুন, এখন তা হলে আমি কী করি?'

'আমি কী-করে বলব, মিস্টার চৌধুরী? এখান থেকে রওনা হওয়ার আগে সে-কথা আপনার ভাবা উচিত ছিল।'

'সেটা করলেই বোধহয় ভালো হত।'

'এখন চুপচাপ বসে রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আপনার উপায় নেই। তা হলে তখনই দেখা হবে। চলি।'

ফোন নামিয়ে রেখে ফ্রিজ থেকে সামান্য হুইস্কি আর সোডা নিয়ে বসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। দুর্ভাবনার সময় মদ তাঁকে স্বস্তি এবং শান্তি দেয়। এখন দেবে কি না কে জানে!

দুপুর গড়িয়ে এখন বিকেল চারটে। তাঁর নির্ধারিত পুনর্জীবনের পাঁচ ঘণ্টা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। মাত্র আর সাত ঘণ্টা বাকি। বিষণ্ণ মনে জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন অনিন্দ্যসুন্দর। আকাশে মেঘ করেছে, বৃষ্টি হতে পারে।

খুন করার পক্ষে উপযুক্ত রাত।

এইভাবে, আকস্মিক এক দুর্ঘটনাচক্রে, জানলায় আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তৃপ্তি এবং রণবিলাস। তরুণ অ্যাথলিট রণবিলাস তাঁর স্ত্রীকে অটুট মনোযোগে চুম্বন করতে ব্যস্ত।

সেইমুহূর্তে অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরীর মনের গভীরে জন্ম নিল এক নতুন প্রতিজ্ঞা।

সাধারণ আবেগতাড়িত মানুষের মতো জানলার কাচে ঘুষি বসালেন না তিনি, মাথার চুলও ছিঁড়লেন না। পরিবর্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। ইতিমধ্যে চুম্বন-অধ্যায় শেষ করে রণবিলাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিন্দ্যসুন্দরের এই প্রশান্তির কারণ, তাঁর মনে এক সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ক্রমে চেহারা নিয়েছে।

একটু পরে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন তিনি। সীতার মাকে উদ্দেশ করে সরবে ঘোষণা করলেন, 'সীতার মা, রণবিলাসবাবু রাতে খেয়ে যাবেন। সেইসঙ্গে কিংশুক

এবং অভীকও। আর হীরা সিংকে বোলো, রাতের খাবার যেন সে-ই পরিবেশন করে।'

কিংশুকের ঘরে পৌঁছে তিনি দেখেন, সে জিনিসপত্র গোছগাছ করছে।

'সুটকেসটা এখন রেখে দাও, কিংশুক।'

'কিন্তু আপনিই তো আমাকে চলে যেতে বলেছেন।' তাঁর সেক্রেটারি গম্ভীর মুখে জবাব দিল।

'তা বলেছি। কিন্তু আমার ইচ্ছে, আজকের রাতটা তুমি থেকে যাও। তাতে তোমার ভালোই হবে, কিংশুক।'

অভীক চৌধুরী তখনও দিবানিদ্রায় অচেতন ছিল, অনিন্দ্যসুন্দর তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগালেন।

'আজ রাতে তোর কোথাও যাওয়ার থাকলে, ক্যান্সেল কর, অভী। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। তাতে তোর লাভই হবে।'

এবার অনিন্দ্যসুন্দর উপস্থিত হলেন বাগানে।

'দুপুরে আপনার সঙ্গে খেতে বসতে পারিনি বলে মাপ চাইছি, রণবিলাসবাবু,' তৃণার ঠোঁটে চুমু এঁকে দেওয়া শিল্পীকে লক্ষ করে বললেন তিনি, 'কিন্তু রাতে আপনাকে না-খাইয়ে ছাড়ছি না।'

রণবিলাসের সুন্দর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, কিন্তু দ্বিধাভরা অস্ফুট স্বরে সে বলল, এ তো তার সৌভাগ্য। আর তৃণা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক।

গোপন উত্তেজনায় ওদের দিকে চেয়ে হাসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। যদি তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়...।

নৈশভোজপর্ব শুরু হল রাত ঠিক সাড়ে আটটায়।

অন্ধকার এবং শীতের তীব্রতা এখন চরমে উঠেছে। সীতা ও সীতার মা চলে যাওয়ার পরই শুরু হয়েছে অপ্রত্যাশিত অঝোর বৃষ্টি। এখনও থামেনি। হীরা সিং নীরবে পরিবেশন করছে। তার মুখে করাল ছায়া থমথম করছে।

একমাত্র অনিন্দ্যসুন্দরই খুশি মনে খেয়ে চলেছেন। অন্যেরা যান্ত্রিকভাবে হাত ওঠা-নামা করলেও স্পষ্ট বোঝা যায়, তাদের মন অন্য দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। তৃণার চঞ্চল চোখ থেকে-থেকেই ছুঁয়ে যাচ্ছে রণবিলাসের মুখ, আর রণবিলাসও সে-দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে। কিংশুকের শুকনো মুখ ভাবলেশহীন এক মুখোশ। সেই মুখোশ চিরে মাঝে-মাঝে ঝিলিক মারছে বিরূপ মনোভাবের ইশারা। সাধারণত অভীকের খাওয়া 'পেটুক' আখ্যা দেওয়ার মতো, কিন্তু আজ তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। চোরা দৃষ্টিতে সকলেই অনিন্দ্যসুন্দরকে লক্ষ করছে।

নটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হল। উঠে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর। ওদের দিকে চেয়ে হাসলেন : 'ঘন্টাখানেক পরে তোমরা সবাই স্টাডি-রুমে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। বিশেষ কিছুই না, বিদায় দেওয়ার আগে সকলের সঙ্গে একটু গল্পগুজব

করা—অনেকটা ফেয়ারওয়েল পার্টির মতো।'

এই সাংকেতিক মন্তব্যে সকলেই নিষ্পলক চোখে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে দোতলায় নিজের শোওয়ার ঘরে গেলেন অনিন্দ্যসুন্দর, একটা সুটকেস গোছাতে শুরু করলেন। দু-জোড়া মোজা সবে সুটকেসে ভরেছেন, টেলিফোন বেজে উঠল।

'সূর্যকান্ত বলছি।'

'ভাবছিলাম, আপনি বোধহয় এখুনি ফোন করবেন।'

'শেষ কয়েকটা ঘণ্টা ধরে দেখছি, আপনার মেজাজ একদম পালটে গেছে।'

'হ্যাঁ তা গেছে।'

'ওই সুটকেস নিয়ে কোথায় চলেছেন?'

'একটু পরেই তো আমাকে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, তাই না?'

'এখানে বাড়তি মোজার দরকার নেই, মিস্টার চৌধুরী। সবকিছুই আমরা দিয়ে দিই।'

'আপনি আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছেন—।'

'আমার গোয়েন্দাগিরি করবার দরকার হয় না।'

'আপনি কি ভাবছেন, আপনাকে আমি ঠকাব—ফাঁকি দেব?'

কোনও উত্তর নেই। টেলিফোন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এটাই একরকম স্পষ্ট উত্তর। দেবদূত চিন্তায় পড়েছে। যদি ঠকানোর কথায় সে দুশ্চিন্তায় পড়ে থাকে, তা হলে তাকে ঠকানো নিশ্চয়ই সম্ভব! গোছগাছ করতে-করতে চাপা হাসিকে প্রশ্রয় দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

সুটকেসে দিনকয়েকের মতো জামা-কাপড় ভরে নিলেন তিনি। টুথব্রাশ ও শেভিং কিট নিতেও ভুললেন না। একটা দেওয়াল-সিন্দুকের কাছে গিয়ে সেখান থেকে দশ হাজার টাকা বের করে নিলেন। এটা তাঁর বিপদের সঞ্চয়। ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ার থেকে তুলে নিলেন নিজের অটোমেটিক পিস্তল—পরীক্ষা করে দেখলেন গুলি ভরা আছে কি না। হ্যাঁ, আছে। এই অটোমেটিক পিস্তল তাঁর অতিরিক্ত জীবনবীমা।

কিন্তু প্রতিশ্রুতিমতো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি নিচে নামলেন না। সন্দেহভাজনদের তিনি উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখতে চান। তিনি জানেন, ওরা অপেক্ষা করবে। বিশেষ করে খুনি, সে...তাকে তো অপেক্ষা করতেই হবে। নরম সোফায় গা এলিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন অনিন্দ্যসুন্দর, মুখে ধূমায়িত পাইপ, মনে ভবিষ্যতের নতুন পরিকল্পনা।

প্রায় সওয়া দশটা নাগাদ সুটকেস হাতে নিচে স্টাডি-রুমে এলেন তিনি। উপস্থিত হলেন তৃণা ও অতিথিদের সামনে। আবিষ্কার করলেন, ওরা প্রত্যেকেই তাঁর পছন্দমাফিক কম-বেশি বিচলিত। কিংশুকের ফরসা মুখে লালচে আভা। অভীক বদমেজাজি শুয়োরের মতো মুখ কালো করে এককোণে বসে আছে। একটা সেটিতে নির্লজ্জভাবে ঘন হয়ে বসে তৃণা ও রণবিলাস। আর বৃদ্ধ হীরা সিং বাইরের বারান্দায় থামের আড়ালে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল, অনিন্দ্যসুন্দর তাকে ভেতরে ডেকে নিলেন। তারপর পকেট থেকে একটা তালা ও চাবি বের করে ঘরের দরজায় ভেতর থেকে তালা দিয়ে দিলেন। এবার তিনি এসে বসলেন নিজের মেহগনি-টেবিলে—ওদের মুখোমুখি।

'তোমাদের কেউ কি আজকের দিনটায় এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছ,' বলতে শুরু করলেন তিনি, 'যেদিনটা আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর শেষ হয়ে যাবে?'

ওরা স্বাভাবিকভাবেই কিছু বুঝে উঠতে পারল না। কয়েকমুহূর্ত ওঁর প্রশ্নের উত্তর দিল বাড়ির গায়ে আছড়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটার ধারাবাহিক শব্দ, এবং কখনও-কখনও বজ্রপাতের তীব্র সংঘাত।

'কীসব বলছ, ডার্লিং, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!' তাঁর স্ত্রী তৃণা। ও সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এক-পা এগিয়ে এসেছে।

শীতল দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করলেন তিনি। ওর পরনে আঁটোসাঁটো স্বচ্ছ জাপানি জর্জেট শাড়ি। সুগভীর নাভির ওপরে ও নিচে তিন ইঞ্চিব্যাপী মসৃণ ত্বক উন্মুক্ত। ব্লাউজের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে মনে হয়, শুধুমাত্র তৃণার শরীরের গঠন সেটাকে স্বস্থানে বজায় রেখেছে। এসবই নিঃসন্দেহে রণবিলাস দত্তের উপকারের জন্য।

'বোসো, তৃণা, উত্তেজিত হোয়ো না।' তাঁর স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে তৃণা পিছিয়ে গেল : 'ভেবেছিলাম, অন্য কেউ না-পারলেও তুমি হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ করবে। মেয়েদের সহজাত ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়ে।'

'কী লক্ষ করব, অনিন্দ্য?'

'আজকের দিনটায় এক অদ্ভুত ব্যাপার তুমি খেয়াল করোনি? একবারও তোমার মনে হয়নি, আজ সারাদিন ধরে তুমি যা-যা করছ, বলছ, সবই তোমার খুবই চেনা? হুবহু এসব কাজ তুমি আগেও একবার করেছ, বলেছ এই একই কথা?'

মুখভাবে স্পষ্টতই বোঝা গেল উপস্থিত সবাই তাঁকে মাতাল ভাবছে, কিংবা ভাবছে তিনি ওদের সঙ্গে রসিকতা করছেন।

একচিলতে হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে বলে চললেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'গতকাল রাতে আমি...না, হয়তো কাল রাতে নয়। কারণ, মরণোত্তর জগতে সময়ের হিসেব রাখা খুব শক্ত—অবশ্য আমি সেখানে খুব বেশিক্ষণ ছিলাম না, সুতরাং আমার বিশ্বাস, হয়তো কাল রাতেই হবে। কাল রাতেই আমি খুন হয়েছি।'

এক রুদ্ধশ্বাস অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল তৃণার ঠোঁট চিরে।

'বাঃ, তোমার তা হলে মনে পড়েছে, সোনা?' প্রশ্ন করলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

'মনে পড়েছে?'

অর্থাৎ, অনিন্দ্যসুন্দর কী বিষয়ে কথা বলছেন, সেটা তৃণা একটুও বুঝতে পারছে না। ওর মুখভাব দেখে তাঁর মনে হল, না, অভিনয় নয়। তিনি অন্যান্যদের দিকে তাকালেন, ওরা সকলেই অবাক অবুঝ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

সুতরাং তিনি খুলে বললেন। বললেন, সূর্যকান্তের কথা, কেন তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন, সেই কথা। ওরা গভীর মনোযোগে শুনল, মাঝে-মাঝে এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল।

তাঁর কাহিনি শেষ হলে অভীক বলে উঠল, 'সুন্দরকাকা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখাও।'

'রমেন গুপ্ত ব'লছে আপনার কিছুদিন বিশ্রামের দরকার,' প্রতিহিংসার ঝাঁঝে তীক্ষ্ণ

হল কিংশুকের কণ্ঠস্বর, 'এখন দেখছি ঠিকই বলেছে!'

'এ নেহাত পাগলের আড্ডাখানা!' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রণবিলাস দত্ত : 'আমি চললাম।'

'বোসো সবাই।' পকেট থেকে অটোমেটিকটা বের করে উঁচিয়ে ধরলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর অভিব্যক্তিতে স্থির প্রতিজ্ঞা।

ওরা সবাই আবার বসল। একইসঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠল।

অনিন্দ্যসুন্দর ফোনটা তুলতেই অপর প্রান্তে কেউ বলতে শুরু করল, 'কী হচ্ছে এসব, মিস্টার চৌধুরী?'

'নিতান্তই সস্তা প্যাঁচ,' সহজ সুরে জবাব দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'সব রহস্য উপন্যাসেই এরকমটা হয়। একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে ডিটেকটিভ সন্দেহভাজন সকলকে একটা ঘরে জড়ো করে। তারপর নিজের তদন্তের কাহিনি শোনায়, আর তখন খুনি সাধারণত নিজের দোষ স্বীকার করে, কিংবা বেহিসেবি হয়ে ধরা পড়ে যায়। আপনাকে ওই খাতায় শুধু একটু মোছামুছি করতে হবে।'

'ঠিক আছে, আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম, মিস্টার চৌধুরী। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার হাতে আর মাত্র কুড়িমিনিট সময় আছে।'

অনিন্দ্যসুন্দর ফোন নামিয়ে রাখতেই রণবিলাস মন্তব্য করল, 'নিশ্চয়ই ওই দেবদূত ফোন করেছিল?'

'হ্যাঁ।' অনিন্দ্যসুন্দর বললেন।

রণবিলাস চুপ করে গেল।

'আমার হাতে যে আর সময় বেশি নেই, সেটাই সে মনে করিয়ে দিল।' অনিন্দ্যসুন্দর বলতে শুরু করলেন, 'যাই হোক, আমার গল্প তোমাদের বিশ্বাস হয়নি মানলাম, কিন্তু এবারে আমি তথ্যের দিকে নজর দেব। আশা করি, সেগুলো তোমরা বিনা বিতর্কে মেনে নেবে। এই ঘরে তোমরা পাঁচজন রয়েছ। এবং পাঁচজনের প্রত্যেকেই মনে-মনে চাও, আমার মৃত্যু হোক। কিন্তু তার মধ্যে একজন সেটা এত বেশি করে চায় যে, সে—খুন করতেও পেছপা হবে না।

'এই যে আমার প্রিয় ভাইপো অভীক। দেনায় ও গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে। এ-দেনার হাত থেকে ওর রক্ষা পাওয়ার একমাত্র আশা, আমার উইলের উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু অর্থ লাভ করা। মানছি, অভীকের টাকার প্রয়োজনটা এই মুহূর্তে। কিন্তু আমি যদি মারা যাই, তা হলে উইলের প্রবেট নেওয়া হবে, আর ওর পাওনাদাররাও সাময়িক ধৈর্য ধরবে।

'তারপর রয়েছে কিংশুক, আমার প্রাক্তন সেক্রেটারি। কিংশুকের ধারণা, আমি পথ থেকে সরে গেলে, সুন্দর সান্যালের উন্নতি ও খ্যাতির দায়িত্ব সে একাই নিতে পারবে। আগামীকাল আমার প্রকাশক দেখা করতে আসছে, আর সেটাই হল কিংশুকের মস্ত সুযোগ—যদি আমি মারা যাই, তবেই।

'এবার আসছে হীরা সিং। ওর বিশ্বাস, আমি লেখা ছেড়ে দিলে ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেব। কারণ তখন ওর অতীতের কীর্তিকলাপ আমার গল্পে আর কাজে আসবে না।

'সবশেষে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী তৃণা এবং ওর বন্ধু শ্রীযুক্ত রণবিলাস দত্ত। রণবিলাসবাবুর হাতে যদি সুপ্রচুর অর্থ থাকত, তা হলে তৃণা কবে আমাকে ছেড়ে চলে যেত। আমার সম্পত্তির অর্ধেক যদি ও হাতে পায়, তা হলে আমার কাছে যেমন সুখ-প্রাচুর্যে ছিল, সেরকম ভাবেই ওর জীবন কাটাতে পারবে। সুতরাং ওদের একজনের হয়তো মনে হতে পারে, আমাকে খুন করাটা জরুরি।'

'তোমার মনমেজাজ দেখছি ভালো নেই, সুন্দরকাকা।' অভীক শান্ত স্বরে বলল।

'মনমেজাজ ভালো নেই, তবে মাথার ঠিক আছে, অভী। এটা হল আমার কাগজ-কাটার ছুরি। হিসেব মতো, এই টেবিলে বসে আমার ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক এগারোটায় খুনি—তোদের পাঁচ জনের একজন—এই কাগজ-কাটা ছুরিটা নিয়ে আমার পিঠে বসিয়ে দেবে, আমাকে খুন করবে।'

কিংশুক এখন ভীষণ মনোযোগে সব শুনছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই অদ্ভুত রহস্য ওকে মুগ্ধ করেছে। ও বলে উঠল, 'মিস্টার চৌধুরী, ধরে নিলাম, আপনি যা-যা বললেন সব সত্যি। কিন্তু আপনি কি সময় মতো টেবিলে ঘুমিয়ে পড়ে খুনিকে খুন করার সুযোগ দেবেন?'

'কক্ষনও না, কিংশুক, কক্ষনও না। যখন আমি জেনেই ফেলেছি যে, আমি খুন হব, তখন চট করে ঘুমিয়ে পড়াটা কী খুব সহজ হবে? আমার তো মনে হয়, এই পরিস্থিতিতে ঘুম পাওয়াটা একেবারেই অসম্ভব, কি বলো?'

'তা হলে আর প্রথমবারের মতো ঠিক এগারোটার সময় আপনার খুন হওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।'

'এগজ্যাক্টলি, কিংশুক। এই রহস্যের আসল অর্থটা তুমি নির্ভুলভাবে ধরতে পেরেছ। না, খুনটা এখন প্রথমবারের মতো নিয়ম মেনে আর হতে পারে না। খুনের পদ্ধতির সামান্য এদিক-সেদিক করতেই হবে। অবশ্য তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, দেবদূত বলেছিল, প্রয়োজন হলে তার খাতায় একটু-আধটু মোছামুছি করে নেবে।'

ঘরের প্রত্যেকে অধীর কৌতূহলে প্রতিটি কথা শুনছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, পরিস্থিতির বৈচিত্র্য ওদের সাময়িকভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

'মিস্টার চৌধুরী,' কিংশুক বলে চলল, 'কী করে যে আপনি নিজের খুনের তদন্ত করবেন, সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সাধারণত আমাদের বইতে—মানে, আপনার বইতে—খুন হয়, খুনি সূত্র ফেলে যায়, এবং তারও পরে ডিটেকটিভ এসে তার কাজ শুরু করে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন সূত্র ধরে আপনি এগোবেন? একটা সাদামাটা উদাহরণ আপনাকে দিই—ওই কাগজ-কাটা ছুরিতে খুব সুন্দর হাতের ছাপ পড়বে, কিন্তু খুন করার আগে তো খুনি সে-হাতের ছাপ ফেলবে না। আর যখন ফেলবে, তখন আপনার তদন্তের পক্ষে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'ভালো সমস্যা তুলে ধরেছ, কিংশুক। আমার সঙ্গে থেকে-থেকে তোমার উন্নতিই হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, একেবারে প্রথমে এই অসুবিধেটার কথা আমার মনে পড়েনি। সত্যিই তো, খুন হওয়ার আগে সেই খুনের সমাধান আমি করব কেমন করে?'

'আর তোমার হাতে মাত্র দশমিনিট সময় আছে, সুন্দরকাকা।' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল অভীক।

'বড়েসাব, আপনি কি ভাবছেন, খুন করবার আগে খুনি সব কবুল করবে?' এ-প্রশ্ন এল হীরা সিংয়ের কাছ থেকে।

'তা হয়তো করতে পারে,' সুষম কণ্ঠে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'কিন্তু সে-ভরসায় আমি বসে নেই।'

'তা হলে আপনি এভাবেই বসে অপেক্ষা করবেন—দেখবেন, খুনি আপনাকে আক্রমণ করতে আসছে। তখনই খুনিকে চিনতে পারবেন এবং আপনার কৌতূহলও মিটে যাবে।' এ-প্রস্তাব রণবিলাস দত্তের।

হাসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। যেন বন্ধুমহলে কোনও তর্কের উত্তরে বলছেন এমন সুরে জবাব দিলেন, 'না, তা নয়। সেরকম সাহস আমার নেই, রণবিলাসবাবু, যে শান্তভাবে টেবিলে বসে দেখব, খুনি এসে আমার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, এবং তারপর, তার ছুরির সামনে নিজেকে উৎসর্গ করব।'

'তা হলে আর কী পথ আছে, আমি তো বুঝতে পারছি না।' বিরক্ত তীক্ষ্ণ স্বরে তৃণা বলল।

'সত্যিই তো, তুমি বুঝবে কেমন করে। মন দিয়ে শোনো, স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলছি। এতক্ষণে এটুকু নিশ্চয়ই আঁচ করেছ, একটা মতলব আমার মাথায় আছে। সূর্যকান্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করব না—কারণ সে আমার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করেছে—এমনকী এই মাঝরাতে আমার এই স্টাডি-রুমে এসে পর্যন্ত আমার ওপর নজর রাখছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খুনটা মোটেই আর হবে না!'

নিজেদের হতাশা ওরা গোপন রাখতে পারল না। অনিন্দ্যসুন্দর আবার হাসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'এগারোটার পরে দেবদূতের কাছে আমার আর কোনও বাধ্যবাধকতা থাকছে না। নিয়মিত ছকে তার নির্ধারিত সময়টা খুনি কাজে লাগাতে পারছে না, ফলে আমি বেঁচেই থাকব—বহু বছর বাঁচব। কিন্তু যেহেতু তোমাদের আসল পরিচয়টা এখন আমার কাছে স্পষ্ট, সেহেতু এই বাড়িতে আর একটা দিনও আমি থাকব না। দেখতেই পাচ্ছ, আমার সুটকেস গুছিয়ে নিয়েছি! এ-জায়গা ছেড়ে আমি চলে যাব দূরে—বহুদূরে। তারপর, কী-করে, তৃণা, তোমাকে, আর অভী, তোকে, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যায়, সে-ব্যবস্থা আমি করছি। আর লেখক হিসেবে আমার ভবিষ্যতের কথা যদি তোল, তা হলে বলে রাখি, আজকের এই ঘটনা নিয়ে একটা নতুন বই লেখার কথা আমার মাথায় এসেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কাহিনির অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য সুন্দর সান্যালের টলে যাওয়া আসনকে আবার নিজের জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। তুমি তোমার নিজের পথ বেছে নাও, কিংশুক। আর হীরা সিং, একজন দায়িত্বশীল আইন-মেনে-চলা নাগরিক হিসেবে আমাকে আমার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

আরও একবার হাসলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

সন্দেহের ছায়ায় আবৃত পাঁচটি মানুষই নিস্পন্দ, নীরব। দেওয়াল-ঘড়িতে এগারোটা

বাজতে ঠিক সাত মিনিট বাকি।

বৃদ্ধ হীরা সিংই প্রথম মুখ খুলল, 'বন্দুক দেখিয়ে এইভাবে আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখছেন, বড়েসাব? তা হলে ওই চাকু দিয়ে কোই ভি আপনাকে খুন করতে পারবে না। আপনি শেষ পর্যন্ত দেবতার সোঙ্গে বেইমানি করবেন?'

'বেইমানি আমি করব না।' শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'তোমাদের বন্দুক দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই।' নিজের বক্তব্য যেন প্রমাণ করতেই পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন তিনি : 'আমার পরিকল্পনা অনেক সহজ-সরল, তাতে বন্দুক-ছুরির কোনও ব্যাপার নেই।'

'সে-পরিকল্পনাটা কী আমরা জানতে পারি?' কিংশুক দাবি করল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এইতো আমি, নির্ধারিত জায়গায় নির্ধারিত সময়ে চুপচিমতো বসে আছি। আর একইসঙ্গে, আমাকে যারা খুন করতে পারে, তাদেরও আমি এখানে হাজির করেছি। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?'

'এর মধ্যে কোথাও একটা চালাকি আছে।' তাঁর ভাইপো বলে উঠল।

'থাকাই তো উচিত, অভী। তোদের পাঁচজনের একজন হচ্ছে খুনি। এবার খুনি মহোদয়, আপনার সামনে দুটো পথ খোলা আছে। ঠিক এগারোটায় আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে খুন করতে পারেন—এই উজ্জ্বল আলোয়, আমাকে বাদ দিয়েও চার-চারজন সাক্ষীর সামনে। সেক্ষেত্রে পুলিশের হাতে আপনাকে ধরা পড়তেই হবে, কারণ আমি হলফ করে বলতে পারি, বাকি চারজন জঘন্য চরিত্রের মানুষ আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু দ্বিতীয় একটা পথও আপনার আছে : আমাকে খুন করার সুযোগটা আপনি ছেড়ে দিতে পারেন। সুতরাং আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে দায়ী হচ্ছেন আপনি নিজে, এবং সূর্যকান্তের সঙ্গে কোনওরকম বিশ্বাসঘাতকতা আমি করছি না। এগারোটা বেজে একমিনিটে এই বাড়ি ও তোমাদের জীবন ছেড়ে আমি চিরদিনের মতো চলে যাব।'

সশব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে স্বাগত জানানোর ভঙ্গিতে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'হ্যালো, দেবদূতসাহেব—কী ব্যাপার?'

'মিস্টার চৌধুরী, আপনি আমাকে ঠকাচ্ছেন!' দেবদূত বলে উঠল।

'উঁহু, মোটেই না। খুনিকে বের করার এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ। খুনের আগে কোনও সূত্র পাওয়া সম্ভব নয়, এবং খুনের পরে আমি আর বেঁচে থাকছি না। যদি খুনি নিজে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে আমাকে খুন করবে না, তা হলে আপনি আমাকে দোষ দিতে পারেন না।'

'আপনি খুব চালাক, মিস্টার চৌধুরী!'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু সেরকম চালাক নন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, রাত এগারোটায় খুনিকে একটা বিশেষ কাজ করতে হবে—আপনার মতো তাকেও সময় দেওয়া রয়েছে। সুতরাং তার একটা পালটা মতলব থাকতে পারে।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। এ-কথা তিনি একবারও ভাবেননি। মনোযোগী দর্শকদের কাছে তাঁর টলে যাওয়া আত্মবিশ্বাস গোপন রইল না।

'কটা বাজে?' অভীক প্রশ্ন করল। ও চোখে ভালো দেখতে পায় না।

'এগারোটা বাজতে তিন।' দেওয়াল-ঘড়ির সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিংশুক বোস।

একটা ভারি নিস্তব্ধতা ঘরে জাঁকিয়ে বসল। তৃণা ও রণবিলাস চকিত দৃষ্টি বিনিময় করল। অন্যান্যরা অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে। ওদের অবিশ্বাসী অভিব্যক্তি এখন পুরোপুরি অদৃশ্য। আর ওদেরই মাঝে বসে খুনি মনে-মনে এক চরম সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে।

হঠাৎই উঠে দাঁড়াল রণবিলাস দত্ত, লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল ঘরের দরজার কাছে। ওর চলায় শিকারি চিতার ক্ষিপ্রতা এবং এতটুকু পায়ের শব্দ নেই। সতর্ক হয়ে ওকে লক্ষ করতে লাগলেন অনিন্দ্যসুন্দর, অনুভব করলেন অটোমেটিকের স্পর্শ।

দরজার কাছে গিয়ে থামল রণবিলাস, চকিতে ঘুরে দাঁড়াল।

'মিস্টার চৌধুরী একটা কথা ঠিকই বলেছেন,' রণবিলাস দত্ত ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করল, 'অন্যান্যদের চোখের সামনে খুনি যদি খুন করে, তা হলে তাঁরা সাক্ষী দিতে পারবে। এবং তাঁদের নিরাপত্তা পুরোপুরি বজায় থাকবে। কিন্তু যদি সকলের চোখ এড়িয়ে খুনটা করা যায়, তা হলে? তখন কেউই সঠিক বলতে পারবে না, কে খুন করেছে। এ-কথা সত্যি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই খুনের মোটিভ রয়েছে, আমাদের সবাইকেই পুলিশ সন্দেহ করবে—এমনকী এরকমভাবেও তারা কেস সাজাতে পারে যে, আমরা পাঁচজনে মিলে প্ল্যান করে মিস্টার চৌধুরীকে খুন করেছি। কিন্তু পুলিশ যদি এই ঘরোয়া বৈঠকের কথা একেবারেই না-জানতে পারে? তা হলে আমাদের কারওরই কোনও ভয় নেই, আর খুনি ঠিক প্রথমবারের মতোই আইনের চোখে ধুলো দেওয়ার একই ঝুঁকি নেবে। শুধু যা করতে হবে, তা হল, কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষী না-রেখে রাত ঠিক এগারোটায় মিস্টার চৌধুরীকে খুন করতে হবে।'

এগারোটা বাজতে একমিনিট।

'কিন্তু সেটা খুনি করবে কীভাবে?' অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরী তীব্র স্বরে জানতে চাইলেন, কিন্তু সবিস্ময়ে উপলব্ধি করলেন, তাঁর গলার স্বর কাঁপছে, 'একঘর লোকের সামনে প্রত্যক্ষ সাক্ষী না-রেখে কী করে আমাকে খুন করবে সে?'

রণবিলাস দত্ত হাসল। ঘোরতর শত্রুর হাসি।

'কেন, সে তো খুব সহজ,' উত্তর দিল সে, 'শ্রীযুক্ত সুন্দর সান্যাল, রহস্য-গোয়েন্দা গল্পের প্রখ্যাত লেখক, এটা কী করে আপনার চোখ এড়িয়ে গেল বলুন তো? আমাকে কাজের কাজ যা করতে হবে, তা হল, টুক করে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেওয়া!'

অনিন্দ্যসুন্দর কিছু করে ওঠার আগেই রণবিলাসের আঙুল পৌঁছে গেল আলোর সুইচে। অন্ধকার নেমে এল চকিতে, অস্তিমান রইল। যে-বিদ্যুতের ঝলক এতক্ষণ প্রায়

ধারাবাহিকভাবে আলোর বর্শা নিক্ষেপ করে চলেছিল, এখন, এইমুহূর্তে, উচ্ছৃঙ্খল দুর্বৃত্তের মতো তুষ্ক হল। উত্তাল আক্রোশে বাইরের দেওয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়া বৃষ্টির শব্দে লোপ পেল সমস্ত পায়ের শব্দ।

নিজের পরিচয় অজ্ঞাত রেখে চলাফেরায় খুনির আর কোনও অসুবিধে নেই!

বিস্ময়ে সাময়িকভাবে বিমূঢ় হয়ে না-পড়লে অনিন্দ্যসুন্দর হয়তো কিছু করতেন। কিন্তু তিনি নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন চেয়ারে।

কেউ একজন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা হাত তাঁর মাথাটা ঠেলে দিল সামনে, টেবিলের ওপর। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে ঠিক যেমনটা হত। অনিন্দ্যসুন্দর বুঝলেন, অন্য হাতটা তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে কাগজ-কাটা ছুরিটা...খুঁজে পেল...শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল।

আঘাতটায় সেরকম যন্ত্রণা অনুভব করলেন না তিনি।

আবছাভাবে অনিন্দ্যসুন্দর টের পেলেন, যে-হাতটা তাঁর মাথাটা টেবিলে ঠেলে ধরেছিল, সেটা এখন তাঁর প্যান্টের বাঁ-পকেট হাতড়ে বেড়াচ্ছে, তুলে নিচ্ছে তাঁর রুমালটা...এবার খুনি ছুরির হাতল থেকে মুছে ফেলছে তার আঙুলের ছাপ...।

অনিন্দ্যসুন্দরের মাথার মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ শব্দে ঘণ্টা বেজে চলেছে...।

নাকি সেটা টেলিফোন বেজে ওঠার শব্দ...।

'সুস্বাগতম, মিস্টার চৌধুরী! একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ফিরে এসেছেন।'

সূর্যকান্তের টেবিলের সামনে সোনার সিংহাসনে শ্লথ ভঙ্গিতে বসে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর।

'পৃথিবীতে কেমন কাটালেন, মিস্টার চৌধুরী?'

'আমি আবার খুন হয়েছি!'

'নিশ্চয়ই!'

'কে খুন করেছে আমাকে?'

দেবদূত সশব্দে হেসে উঠল। সেই হাসিতে গমগম করে উঠল শ্বেতপাথরে অলঙ্কৃত প্রাসাদ।

'সেটা জানতেই তো আপনি আবার ফিরে গেলেন পৃথিবীতে! আর এখন কিনা সেই একই প্রশ্ন করছেন? আপনি নিশ্চয়ই তৃতীয়বার পৃথিবীতে যাওয়ার কথা ভাবছেন না?'

'না, ধন্যবাদ,' শ্রান্ত স্বরে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'কিন্তু এখানে আমি এতটুকু শান্তি পাব না—।'

'আবার সেই পুরোনো কথা!' তড়িঘড়ি বলে উঠল দেবদূত, 'তার চেয়ে আসুন, আপনার খুনের রহস্যটা নিয়ে একটু মাথা ঘামানো যাক। নিজেকে খুনির জায়গায় কল্পনা করুন, মিস্টার চৌধুরী। যখন রণবিলাসবাবু আলো নিভিয়ে দিলেন, তখন আপনি হলে কি টেবিলের কাছে গিয়ে খুনটা করতেন?'

দু-হাতে মাথা রেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তারপর বললেন, 'না, আমি সেটাকে একটা ফাঁদ বলে সন্দেহ করতাম। কারণ, ছুরি বসানোর সময় কেউ হয়তো আলোটা আবার জ্বালিয়ে দিতে পারত, এবং আমি হাতেনাতে ধরা পড়তাম।'

'ঠিক বলেছেন, মিস্টার চৌধুরী। সেটা প্রচণ্ড ঝুঁকির কাজ হত। এবারে আর-একটা প্রশ্ন। আপনি যদি খুনি হতেন, তা হলে যাকে খুন করলেন তারই পকেট থেকে রুমাল বের করে ছুরি থেকে নিজের আঙুলের ছাপ মুছে ফেলার কী কারণ আপনার থাকতে পারে?'

'এর একটাই উত্তর,' বললেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'নিশ্চয়ই আমার কাছে কোনও রুমাল ছিল না।'

'ঠিক।' সম্মতি জানাল দেবদূত : 'এবার বলুন তো, ওই পাঁচজনের মধ্যে কে জানত যে, আপনি সবসময় প্যান্টের বাঁ-পকেটে রুমাল রাখতেন?'

'বুঝেছি, আপনি কী বলতে চান!' অনিন্দ্যসুন্দরের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল।

প্রত্যুত্তরে সূর্যকান্তও হাসল : 'এবারে নিশ্চয়ই আপনি এখানে সুখী হবেন, মিস্টার চৌধুরী।'

'তৃণার তরুণ প্রেমিক রণবিলাস ছিল আলোর সুইচের কাছে,' আত্মগতভাবেই বললেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'খুনটা ও শেষ না-করা পর্যন্ত রণবিলাস যে আলো জ্বেলে দেবে না, সে-ভরসা তৃণার ছিল। তা ছাড়া, তৃণার সঙ্গে কোনও রুমাল ছিল না। ছুরির হাতলটা যদি ও শাড়িতে মুছতে যেত, তা হলে শাড়িতে রক্ত লেগে যাওয়ার ভয় থাকত। সুতরাং আমার রুমালটাই ও বেছে নিয়েছে। আমি রুমাল কোথায় রাখি, সেটা সবচেয়ে ভালো জানত তৃণাই—আর কেউ নয়!'

'ঠিক আমি যা ভেবেছি তাই, মিস্টার চৌধুরী।'

'গোয়েন্দাগিরিতে আপনি দেখছি নেহাত কম যান না!'

দেবদূত কষ্টকৃত বিনয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলল। নরম সুরে স্বীকার করল, 'এখানে থাকতে-থাকতে টুকটাক কিছু শিখেছি আর কী। বলতে পারেন একরকম সঙ্গগুণ বা মেলামেশার ফল—।'

'সঙ্গগুণ? মেলামেশা?'

'কেন, আপনাকে বলিনি, মিস্টার চৌধুরী? ওঃ হো। প্রথমেই যদি বলতাম, তা হলে আপনি হয়তো এতটা অসুখী হতেন না, বরং খুশিই হতেন। ঠিক আছে, আর দেরি নয়। আসুন, সবার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন পাঁচকড়িবাবু, ইনি দীনেন্দ্রবাবু আর ইনি শরদিন্দুবাবু...।'

'পাঁচকড়িবাবু, দীনেন্দ্রবাবু, শরদিন্দুবাবু!'

'হ্যাঁ, মিস্টার চৌধুরী। কেন, আপনি জানেন না, রহস্য-সাহিত্যিকরা মারা গেলে স্বর্গে আসেন!'

আরশিনগরের অসভ্য লোকটা

এক

বলব না বলব না করেও শেষ পর্যন্ত লোকটার কথা নন্দিনীকে বলে ফেললাম। লোকটাকে আমি গত তিনদিন ধরে লক্ষ করছি। সবসময় চোরের মতো আড়চোখে তাকিয়ে রয়েছে। প্রথম-প্রথম ভাবতাম, লোকটা বুঝি লুকিয়ে-চুরিয়ে আমাকে দ্যাখে। কিন্তু এই তিনদিনেই বুঝেছি, না, আমাকে না—লোকটা লুকিয়ে-লুকিয়ে নন্দিনীকেই দেখার চেষ্টা করে।

অবশ্য সবসময় যে দ্যাখে তা নয়। লুকিয়ে দেখার জন্যে ও ঠিক মোক্ষম মুহূর্তগুলোই বেছে নেয়। যেমন, নন্দিনী বাথরুম থেকে স্নান সেরে ঘরে এলেই লোকটা তৈরি হয়ে যায়। ওর চোখের মণি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। গলার শিরা ফুলে ওঠে। ফরসা মুখে রক্তের ফোয়ারা ছোটে। সব মিলিয়ে লালসা মাখানো কামুকনজরে ও চোখ বড়-বড় করে নন্দিনীকে দেখতে থাকে। কারণ ও জানে, এক্ষুনি নন্দিনী কাপড় ছাড়বে। তারপর...ওঃ, অসহ্য!

আর নন্দিনীকেও বলিহারি যাই! জানি, সুন্দর করে সাজানো অ্যাটাচ্‌ড বাথওয়ালা এই মাঝারি ফ্ল্যাট একেবারে আমাদের নিজের। বাথরুম থেকে স্নান সেরে নন্দিনী খালি গায়ে বেরোলেই-বা কে দেখতে পাবে—আমি ছাড়া! তখন ওর ফরসা গায়ে, বুকে, চুলে জলের ফোঁটা আটকে থাকে। এমনকী নাকের ডগায়, চোখের পাতায়, অথবা ঠোঁটেও ছুঁয়ে থাকে জলবিন্দু। তখন আমার তো আর মাথার ঠিক থাকে না, তাই ওকে জাপটে ধরে ঠোঁট দিয়ে সারা শরীরের জলের ফোঁটা মুছে নিই। আর স্পষ্ট বুঝতে পারি, কেন জলের আর-এক নাম জীবন। কারণ, ওই সময়ে নন্দিনীকে আদর করতে না-পারলে আমি মরে যেতাম।

বিয়ের পর তিনটে বছর দারুণ কেটে গিয়েছিল। দিনে বা রাতে আমাদের ভালোবাসায় কোনও হেরফের হত না। মনে হত, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমাদের ভালোবাসা যেমন ছিল, এখন তারই অ্যাকশান রিপ্লে চলছে। তা-ই চলত—যদি না মাঝখান থেকে ওই অসভ্য লোকটা এসে দেখা দিত।

ভোরবেলা নন্দিনী যখন বিছানা ছেড়ে ওঠে তখন সে এক দেখার মতোই দৃশ্য! যাকে বলে টপ। মানে টপলেস। ব্লাউজ-এর বালাই নেই। আর শাড়ি-সায়াটা বায়না-করা বাচ্চার মতো কোনওরকমে ওর কোমর আঁকড়ে ধরে ঝুলছে। তখন ঘুম জড়ানো চোখে যেই আমি নন্দিনীকে দেখি অমনি আমার ঘুম ছুটে যায়। হ্যাংলার মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। অথচ, কিছুক্ষণ আগেই, সারারাত ধরে ওকে নিয়ে কত-না হামলা-হামলি করেছি। শরীর-মন-বিছানা সব উথালপাথাল। তবুও সকালের আলোয় ওর ওই

ফরসা ইয়েগুলো দেখলে আমি কেমন হয়ে হয়ে যাই। এইজন্যেই বোধহয় মুনি-ঋষিরা বলেছেন : লোভ অতি বিষম বস্তু।

তা এই লোভের টানেই বোধহয় ওই অসভ্য লোকটা তাক বুঝে উঁকিঝুঁকি মারে। ভোরবেলা নন্দিনীর ঘুমভাঙা থেকে শুরু হয় লোকটার নজরদারির কাজ। তারপর স্নান করতে যাওয়ার আগে-পরে। কাপড় ছাড়ার সময়। রাতে শুতে যাওয়ার সময়। এমনকী আধো-আঁধারি বিছানার দিকেও ওর নজর থাকে। অবশেষে সকালবেলার ব্যাপারটা তো আছেই।

লোকটার অসভ্যতার এত খুঁটিনাটি আমি টেরও পেতাম না, যদি-না অফিস থেকে দশদিনের ছুটি নিতাম। অফিসে কাজের টেনশান দিনকে-দিন বেড়েই চলেছিল। তাই ডাক্তারি পরামর্শে দশদিন ছুটি নিয়েছি—বিশ্রামের জন্যে। কিন্তু ওই লোকটা আমাকে বিশ্রাম দিল কই!

তিন-তিনটে দিন লোকটাকে ভালো করে লক্ষ করার পর আজ সকালে নন্দিনীকে ডেকে বললাম, অ্যাই শোনো—।

কী?

জানো, একটা অসভ্য লোক সবসময় লুকিয়ে-লুকিয়ে তোমাকে দ্যাখে!

নন্দিনী হেসে বলল, সে আর জানি না, সেই লোকটা তো এখনও আমাকে হ্যাংলার মতো দেখছে। —বলে আমার বুকে আঙুল দিয়ে টোকা মারল দু-বার।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, আমি না, আমি না—একটা অন্য লোক।

নন্দিনী তখন বেশ ঘাবড়ে গেল। এক-পা পিছিয়ে গিয়ে চারপাশে তাকাল। তারপর অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কে? কোথা থেকে দ্যাখে?

আমি দেখলাম, আর লুকিয়ে লাভ নেই। সুতরাং ওকে বলেই ফেললাম, লোকটাকে চিনি না। তবে লোকটা দ্যাখে ওই আয়নার ভেতর থেকে। —বলে আমি আঙুল তুলে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নাটার দিকে দেখালাম।

এই ড্রেসিং-টেবিলটা বিয়ের সময় নন্দিনীর মা আমাদের দিয়েছিলেন। এটা তিনি আবার পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। অর্থাৎ অ্যান্টিক। আর চেহারা দেখেই তার আভিজাত্য দিব্যি বোঝা যায়। যেমন, মেহগনি কাঠ। সূক্ষ্ম কারুকাজ—যার মধ্যে রয়েছে শিল্পীর ধৈর্য ও দক্ষতার প্রমাণ। এ ছাড়া আয়নাটাও মাপে বেশ বড়। প্রায় ছ-ফুট উঁচু, আর চওড়ায় প্রায় দু-ফুট। তার ওপর আবার দু-পাশে দুটো ভাঁজ করা আয়নার ফালি জোড়া রয়েছে—পাখির ডানার মতো।

বিয়ের পর সময় করে আমি ড্রেসিং-টেবিলটাকে ভালো করে পালিশ করিয়ে নিয়েছিলাম। আর সুন্দর ঝালর দেওয়া সরু লেসের কাজ-করা পরদা ঝুলিয়ে দিয়েছি ওটার ওপরে। আমাদের ফ্ল্যাটে যে-ই আসুক, ড্রেসিং-টেবিলটা দেখে তারিফ না-করে পারে না। বলে, দামি কাঠ, বেলজিয়ামের কাচ, ব্রিটিশ আমলের জিনিস, এর দাম কম করে দশ-পনেরো হাজার টাকা হবে।

এখন সেই অভিজাত ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার আড়ালেই আশ্রয় নিয়েছে নির্লজ্জ বেহায়া অসভ্য লোকটা।

নন্দিনীকে আয়নাটা আঙুল দিয়ে দেখাতেই ওর মুখ পলকে খানিকটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চট করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল বিছানার কাছে। নরম গদির ওপরে ঠেলে বসিয়ে দিল আমাকে। গায়ে, মুখে, কপালে হাত বোলাতে-বোলাতে জিগ্যেস করল, সকালে ওষুধ খেয়েছিস?

বিয়ের আগে আমাদের 'তুই-তুই' প্রেম ছিল। বিয়ের পরেও আদুরে ভালোবাসা জানাতে আমরা দুজনে-দুজনকে 'তুই' বলে ডাকি। কিন্তু ওর মুখে 'ওষুধ' শব্দটা শুনেই আমার আদুরে ভালোবাসা বিগড়ে গেল।

অফিসের কাজের চাপে আমার টেনশান হয় বলে নন্দিনী একরকম জোর করেই আমাকে একদিন ডক্টর সোমেন বাসুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে মাসে একবার করে ডক্টর বাসুকে দেখাতে যাই। ইনি কী দেখেন ভগবান জানেন! তবে কী একটা বিচ্ছিরি ট্যাবলেট আর সিরাপ খেতে দিয়েছেন। নন্দিনীর খেয়াল আর যত্নে একটিবেলাও সে-ওষুধ বাদ দেওয়ার জো নেই। আর সাম্প্রতিক ছুটি নেওয়ার পরামর্শটাও ওই মহা-চিকিৎসকের।

নন্দিনীকে আমি রাগাতে চাই না। তাই ওর বুকে মুখ গুঁজে বললাম, হ্যাঁ, ওষুধ খেয়েছি।

নন্দিনী কোনও কথা না-বলে আমার মাথাটা বুকে চেপে রেখে আমার চুলে বিলি কাটতে লাগল।

আমার বেশ ভালো লাগছিল। কিছুক্ষণের জন্যে বেমালুম ভুলে গেলাম অসভ্য লোকটার কথা।

পদ্ম নামে একটি বউ আমাদের ঠিকে কাজ করে দেয়। ওর আসার কথা সকাল আটটায়, কিন্তু প্রায় রোজই আসে সাড়ে নটা-দশটায়। ওর দেরি দেখে আমি রেগে যাই, অথচ নন্দিনী ওকে কিছু বলে না। কী করে পদ্ম ওর বউদিমণিকে ম্যানেজ করে রেখেছে কে জানে!

আজও পদ্ম আসতে দেরি করছে। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। নিশ্চিন্তে নন্দিনীর আদর খেতে পারছি। পদ্মর মেয়ে সুখী আসে বেলা বারোটা নাগাদ। এসে সারাটা দিন নন্দিনীর কাছেই থাকে, আর দরকার হলে ফাইফরমাশ খাটে। রাত নটা বাজলে খেয়েদেয়ে মেয়েটা মায়ের ডেরায় চলে যায়।

তোর কী হয়েছে বল তো।—নন্দিনী আমাকে আলতো করে জিগ্যেস করল।

আমি ওর বুকের মধ্যেই আড়ষ্টভাবে সামান্য মাথা নেড়ে বললাম, কিছু না। শুধু ওই অসভ্য লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। লোকটা সবসময় ওই আয়নার আড়াল থেকে তোকে দ্যাখে।

কথাটা বলেই আমি ঘাড় সামান্য ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকালাম আয়নাটার দিকে।

ওটার ওপরে লেসের পরদা টানা ছিল। কিন্তু তবু যেন আমি একটা অস্পষ্ট ছায়াকে চট করে সরে যেতে দেখলাম। চোখগুলো বড়-বড়। ঠোঁটের কোণে সোভাতুর হাসি।

নন্দিনীকে কিছু বলার আগেই ও বলে উঠল, সন্দীপ, এসব নিয়ে তুই একদম ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

নন্দিনী সান্ত্বনা দিলে কী হবে, আমি জানি, এত সহজে সব ঠিক হবে না। ওই লোকটার নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব আছে।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে আলতো ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে নন্দিনী এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। ওর পেছনটা বেশ ভারি। বিয়ের আগে এতটা ভারি ছিল না।

নন্দিনী টেলিফোনে মিষ্টি করে 'হ্যালো' বলল।

এটা কি সেই টেলিফোন?

মানে, কিছুদিন ধরে একটা ফোন আসছে, সেটা আমি ধরলেই সব চুপচাপ—কেউ কথা বলে না। শুধু দম নেওয়ার 'ফোঁসফোঁস' শব্দ শোনা যায় কয়েক লহমা। আর তারপরই লাইন কেটে যায়।

অথচ নন্দিনী যদি ফোন ধরে তা হলে আর লাইন কাটে না। কখনও সেই ফোনে কথা বলে নন্দিনীর মা, অথবা আমার ছোটপিসি, বা আমেরিকা থেকে নন্দিনীর বড়দা, আর নয়তো দীপেশ।

নন্দিনী টেলিফোনে কথা বলছিল। আমি হাঁ করে ওর কথাগুলো শুনছিলাম। কে ফোন করেছে এখন?

আমার মুখ দেখে নন্দিনী বোধহয় নীরব প্রশ্নটা টের পেল। রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিসফিসে গলায় বলল, দীপেশ—।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দীপেশ আমাদের দুজনেরই বন্ধু। ইউনিভার্সিটিতে আমরা তিনজনে একসঙ্গে পড়েছি। দীপেশটা যাচ্ছেতাই নম্বর পেয়ে প্রত্যেক ইয়ারে ফার্স্ট হত। তার ওপর কী দারুণ চেহারা! আমার সঙ্গে তো একেবারে গলায়-গলায় ছিল। একসঙ্গে কত সিনেমা দেখেছি আমরা। তখন নন্দিনীর সঙ্গে আমার অতটা মাখামাখি ছিল না।

পাশ-টাশ করে একটা দারুণ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি নিয়ে দীপেশ স্টেট্‌স-এ চলে গেল। আমিও চাকরি পেলাম। তার কিছুদিন পর নন্দিনীও চাকরিতে ঢুকল। চাকরি করা অবস্থায় আমাদের প্রেম চলেছিল বছরখানেক। কিন্তু তারপর আর পারা যাচ্ছিল না। নন্দিনীর বাবা একটা ফ্ল্যাট গিফ্‌ট করতেই সব প্রবলেম সলভ হয়ে গেল। নন্দিনী চাকরি ছেড়ে দিল। বলল, সন্দীপ, চাকরির চেয়ে বিয়ে অনেক বেটার। তুই একা চালাতে পারবি না?

আমি 'খুব পারব' বলে ওকে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিয়েছিলাম। আর তারপরই দু-গালে প্রচণ্ড 'চকাৎ-চকাৎ' শব্দে দুটো চুমু। নন্দিনী আচমকা বিব্রত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, কী হচ্ছে! কী হচ্ছে!

আমি হেসে বলেছিলাম, সোনা, চুমুতে যখন বিকট শব্দ হয় তখন তাকে বলে হামি।

করিডর ধরে কে যেন এগিয়ে আসছিল। তাই তাড়াহুড়ো করে নন্দিনীকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছিলাম।

আমাদের বিয়ের মাসতিনেক পর দীপেশ কলকাতায় ফিরল। তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই আসে আমাদের আস্তানায়। ওকে দেখলেই আমার ইউনিভার্সিটির দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। নন্দিনীর সঙ্গে পিরিত করার জন্যে ও আমাকে কম ওসকায়নি। বন্ধুবান্ধব সকলের মাঝে লুকিয়ে আমার পেছনে চিমটি কেটে বলেছিল, জাগো বাঙালি, লড়ে যাও।

নন্দিনী টেলিফোনে খুব হাসছিল। তারপরই খেয়াল করলাম ও দীপেশকে আমার কথা বলছে।

আমি আয়নার দিকে একবার আড়চোখে তাকালাম। না, সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু দীপেশকে এক্ষুনি ওই লোকটার কথা বলার দরকার নেই। ও কী মনে করবে কে জানে!

নন্দিনীকে ইশারা করে বারণ করলাম, দীপেশকে এখন যেন কিছু না-বলে।

নন্দিনী আমাকে আশ্বস্ত করে হাসল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখল। রাখার সময় স্পষ্ট দেখলাম, রিসিভারটা ওর বাঁ-দিকের বুকে ঘষে গেল। রিসিভারটাকে হিংসে হল আমার।

নন্দিনীকে কাছে ডাকতে যাব, অমনি কলিংবেল বেজে উঠল। ও আমাকে লক্ষ করে জিভ ভেঙাল। বলল, পদ্ম না-এলে আমার কপালে বোধহয় একটি ফোঁটাও বিশ্রাম জুটত না। দীপেশ এলে বলব, তুমি একটুও কথা শোনো না।

নন্দিনী দরজা খুলতে গেল।

আর ঠিক তখনই একটা আবছা ছায়া আয়নার ওপরে আড়াআড়ি সরে গেল যেন।

দুই

নন্দিনী অলস ভঙ্গিতে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল বিছানায়। ঘরের নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে। তার নীল আলোয় নন্দিনীর শাড়ির রং ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। তবে বিছানা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন লোককে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। ওদের মুখ অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য মোটেই অস্পষ্ট নয়। ওদের মধ্যে একজন ক্ষিপ্র হাতে খপ করে চেপে ধরল নন্দিনীর শাড়ি। তারপর একটা উল্লাসের হেঁচকি তুলে শাড়িটা টানতে শুরু করল। বিছানায় নন্দিনীর দেহটা সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে, আর শাড়িটা একটু-একটু করে খুলে আসছে ওর শরীর থেকে। বাকি তিনজন লোক নন্দিনীর বস্ত্রহরণ চুপচাপ দেখছে। আবছা আলোতেও ওদের চোখে ফুটে ওঠা তৃপ্তি বেশ বোঝা যাচ্ছে।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ওই চারজন দস্যু চমকে উঠে এপাশ-ওপাশ তাকাল। তারপর এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় চারজন গায়ে-গায়ে মিশে গিয়ে একজন মানুষ হয়ে গেল। এবং সেই লোকটা একছুটে চলে গেল ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার কাছে। আয়নার পরদা সরিয়ে চোখের পলকে ঢুকে গেল আয়নার ভেতরে।

আমার ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্নের মধ্যেই বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিলাম। কারণ, দেখি, নন্দিনী আলুথালু বেশে উঠে বসে আমার বুকে হাত বোলাচ্ছে, মাথায় হাত বোলাচ্ছে, কপালে-গালে ভয়-ভাঙানো চুমু খাচ্ছে।

কী হয়েছে রে? বাজে স্বপ্ন দেখেছিস?—নন্দিনীর গলায় উৎকণ্ঠা।

হ্যাঁ, খুব বাজে স্বপ্ন।—বড়-বড় শ্বাস নিতে-নিতে আমি বললাম, আয়নার ওই লোকটা তোর শাড়ি ধরে...শাড়ি ধরে...।

থাক, থাক। এখন ঘুমো।

আমাকে একগ্লাস জল দিল ও। ঢকঢক করে জল খেয়ে ওর নরম বুকে মুখ গুঁজে আমি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল থেকে লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না। আমি নানা অছিলায় আয়নার কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে লাগলাম। নন্দিনী ঘরকন্নার কাজের ফাঁকে-ফাঁকে আমাকে লক্ষ করছিল। ওর নজর দেখেই বুঝলাম, আমার মতলব ও ধরে ফেলেছে, কিন্তু আমাকে কিছু বলল না।

বেলার দিকে একবার ফোন বেজে উঠতেই আমি ফোন ধরলাম। নন্দিনী রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ছুটে আসছিল ফোন ধরতে। কিন্তু আমাকে রিসিভার তুলতে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অপেক্ষা করতে লাগল।

আমি টেলিফোনে কথা বললাম।

হ্যালো—।

কোনও উত্তর নেই। তবে টের পেলাম, ও-প্রান্তে শোনা যাচ্ছে ভারি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

আমি আরও বেশ কয়েকবার 'হ্যালো-হ্যালো' বললাম, কিন্তু কোনও লাভ হল না। আমি আয়নার দিকে একবার তাকালাম। নাঃ, সেখানে কেউ নেই।

রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছি, নন্দিনী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমাকে দাও, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

আমি রিসিভারটা ওকে বাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসলাম। আয়নার দিকে না-দেখার ভান করে আড়চোখে নজর রাখলাম—যদি শয়তানটা উঁকিঝুঁকি মারে।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, টেলিফোনে দিব্যি কথা চলছে। নন্দিনী কথা বলছে আর হাসছে।

একটু পরেই কথা শেষ করে ও রান্নাঘরে চলে গেল। যাওয়ার আগে আমাকে মিষ্টি করে বলে গেল, বারোটার সময় ওষুধটা খেতে ভুলো না।

রান্নাঘর থেকে পদ্মর মশলা বাটার শব্দ আসছিল। আর নন্দিনী সেখানে ঢুকেই কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে বোধহয় কিছু ছাড়ল। কারণ 'ছ্যাঁক' করে এমন শব্দ হল যে, মনে হল আমার কপালে ছ্যাঁকা লেগেছে।

বিছানায় চুপচাপ বসে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। টেনশান কাটাতে ডাক্তারবাবু আমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন! কিন্তু ডক্টর বাসু তো আর আয়নার ওই লোকটার কথা জানেন না!

লোকটার কথা ভাবতে-ভাবতেই অলস চোখে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। আমার মাথার ভেতরে কোথাও একটা টেলিফোন ক্রমাগত বেজে যাচ্ছিল।

জানলার বাইরে চড়া রোদ্দুর। উলটোদিকের ফ্ল্যাটের কার্নিশে একটা মেয়ে-চড়ুই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। একটা কাম-জর্জর পুরুষ-চড়ুই দু-পাশে ডানা নামিয়ে মুখটা উদাসীনভাবে ওপরে তুলে মেয়ে-চড়ুইটিকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতে একটা থিয়োরি মাথায় এল। মানে, ওই অসভ্য লোকটার ব্যাপারে। যতই ভাবতে লাগলাম, থিয়োরিটা ততই কম অবাস্তব ঠেকতে লাগল। কিন্তু না, নন্দিনীকে এখন বলব না। শুনলে ও হয়তো খিলখিল করে হেসে উঠবে। তারপর বলবে, না রে, তোর টেনশান এখনও কাটেনি।

নন্দিনী মনে হয় আমার কথায় খুব একটা আমল দিচ্ছে না। দীপেশ বললে ব্যাপারটাকে ও কিন্তু এরকম হালকাভাবে উড়িয়ে দিতে পারত না। আজ সন্ধেবেলা দীপেশ যদি আসে তা হলে সবকিছু ওকে বলব। বলা দরকার। তা না-হলে আয়নার ওই লোকটা দিন-দিন আমার মাথায় চড়ে বসবে।

ঘোর দুপুরে নন্দিনীকে বিছানায় কাছে পেয়ে আমি কয়েকঘন্টা আগে দেখা কার্নিশের চড়ুই পাখিটার মতো হয়ে গেলাম। সুখী পাশের ছোট ঘরটার মেঝেতে শুয়ে পড়েছে। আর আমাদের ঘরে ঢোকার সব দরজাই বন্ধ। সুতরাং আমরা দুজনে এখন দুজনের।

আমার ভালোবাসায় বাধা দেওয়ার ছল করে নন্দিনী বলল, একটু ঘুমোও না, তা হলে টেনশানটা একটু কমবে।

আমি হাসলাম, বললাম, টেনশান কমানোর এটাই সবচেয়ে ভালো ওষুধ—ট্যাবলেট বা সিরাপ নয়।

জানলাগুলোয় পরদা টানা ছিল। তাই ঘরে হালকা ছায়ায় একটা আস্তরণ ছিল। কিন্তু তাতে নন্দিনীকে আগাপাস্তলা দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না আমার। ওর শরীর নিয়ে পাগলামি করতে-করতেই কী যে হল, হঠাৎ করে চোখ গেল আয়নার দিকে।

আবছা আঁধার এবং লেসের কাজ করা পরদা থাকা সত্ত্বেও লোভী ছায়াটাকে আমি দেখতে পেলাম। আমি ঝটকা মেরে উঠে বসতেই ছায়াটা সড়াৎ করে সরে গেল।

নন্দিনী অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কী হল?

ওই লোকটা।—আয়নার দিকে দেখালাম আমি, বললাম, ওঃ, অসহ্য হয়ে উঠেছে।

নন্দিনী কোনও কথা না-বলে চুপচাপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট করে বলল, এবার শুয়ে পড়ো। সন্ধেবেলা দীপেশ এলে ওকে বলে দেখি কী বলে—।

ওর কথামতো চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে নানান কথা ভাবতে লাগলাম। নাঃ, সন্ধেবেলা দীপেশকে ব্যাপারটা বলতেই হবে।

সন্ধেবেলা দীপেশ এল। ওর কলিংবেল বাজানোর নিজস্ব একটা ঢং আছে। শুধু কলিংবেল কেন, সব ব্যাপারেই ওর নিজস্ব কতকগুলো ঢং আছে। মনে পড়ে, ইউনিভার্সিটির দিনগুলোয় আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে ওকে নকল করার চেষ্টা করতাম। ওকে আমার মাঝে-মাঝে হিংসে হত। এখনও যে হয় না তা নয়।

ডাইনিং স্পেসে টিভি চালিয়ে চায়ের আসর বসিয়েছিলাম আমরা তিনজনে। এ-কথা সে-কথার মাঝে নন্দিনীই ফস করে বলে বসল লোকটার কথা। আমি ভেবেছিলাম দীপেশ হো-হো করে হেসে উঠবে, কিন্তু ও হাসল না। সিরিয়াস মুখ করে লোকটার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগল আমাকে কেমন দেখতে, কখন-কখন উঁকি মেরে নন্দিনীকে দ্যাখে, আমাকে দেখিয়ে নন্দিনীকে কোনওরকম কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে কি না, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

আমি তখন একটু ভরসা পেয়ে সামান্য ইতস্তত করে নতুন থিয়োরিটার কথা দীপেশকে বলে ফেললাম।

আমার কী মনে হয় জানিস? ড্রেসিং-টেবিলের ওই আয়নাটা আসলে একটা দরজা—।

দরজা!—অবাক হয়ে নন্দিনী বলল।

আর-একটু বুঝিয়ে বল তো।—দীপেশ চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। হাতের সিগারেটে টান দিতে ভুলে গেল।

আমি হয়তো বিব্রত হয়ে পড়তাম, কিন্তু দীপেশের আগ্রহ আমাকে ভরসা দিল।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আমি বললাম, হ্যাঁ, দরজা। দরজার একপাশে হচ্ছে আমাদের জগৎ—মানে, আমাদের এই ফ্ল্যাট, শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর, এইসব। আর অন্যদিকে ওই লোকটার দুনিয়া। আয়নাটা হচ্ছে এই দুটো জগতের মাঝের দরজা। আমরা সেই দরজা দিয়ে যাতায়াত করতে পারি না, কিন্তু লোকটা হয়তো পারে—কে জানে!

আমি ভাবছিলাম, আমার কথায় দীপেশ আর নন্দিনী হয়তো হো-হো করে হেসে উঠবে। কিন্তু না, ওরা কেউই হাসল না আমার থিয়োরি শুনে। নন্দিনী একবার চিন্তিত মুখে তাকাল দীপেশের দিকে। দীপেশ গম্ভীরভাবে আমাকে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল।

তারপর জিগ্যেস করল, আর কী-কী মনে হয় তোর?

এইজন্যেই দীপেশের জবাব নেই। ও আর-একজনের মনের অবস্থা সবসময় ঠিক-ঠিক বুঝতে পারে। এইজন্যেই কারও কাছের মানুষ হয়ে উঠতে ওর এতটুকু দেরি হয় না।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, আমার আরও কী মনে হয় জানিস! ওই লোকটা নির্ঘাত কোনও বদ মতলবে ঘুরঘুর করছে।

কী মতলব?

সেটাই তো এখনও বুঝতে পারছি না।

তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

একসময় দীপেশ বলল, সন্দীপ, তুই লোকটাকে যেমন লক্ষ রাখছিস সেরকম লক্ষ রাখ। এটা নিয়ে এক্ষুনি থানা-পুলিশ করা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে থাকাই ভালো। আমি আজ চলি, নন্দিনী, তোরা একটু সাবধানে থাকিস।

দীপেশ চলে যাওয়ার পর সুধীকে একপ্যাকেট সিগারেট কিনতে পাঠালাম। নন্দিনীকে একা পেয়ে জাপটে ধরে দুটো চুমু খেয়ে বললাম, শুনলি তো, এখন থেকে তোকে সাবধানে থাকতে হবে।

নন্দিনী অদ্ভুত হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এখন না, রাতে।—তারপর চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

আমি টিভিটা অফ করে দিয়ে চলে এলাম শোওয়ার ঘরে। প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। আয়নার পরদা সরিয়ে দিয়ে ঠান্ডা কাচে হাত দিলাম। এটা আসলে দরজা! ভাবা যায়! ওই লোকটা কোথায় গেল?

আয়না লক্ষ করে কয়েকবার সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে দিলাম। তারপর আয়নার খুব কাছে ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, আয়না, তুই সত্যি করে বল, কাকে তুই লুকিয়ে রেখেছিস—।

আয়না কোনও উত্তর দিল না।

শুধু আমার প্রতিবিম্ব আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

তিন

আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তবে আমি সেটা জানতে পেরেছি এটা নন্দিনী বা দীপেশ—কাউকে বুঝতে দিইনি।

সন্ধের পর একটা ফোন এল। আমিই ফোনটা ধরলাম। তারপর 'হ্যালো' বলা সত্ত্বেও ও-প্রান্ত থেকে কোনও উত্তর নেই। তবে মনোযোগ দিয়ে কান পেতে শুনতে পেলাম ভারি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

নন্দিনী বাথরুমে গা ধুতে ঢুকেছে। সুতরাং আরও কয়েকবার চেঁচিয়ে 'হ্যালো' বলে ফোন রেখে দিতে যাচ্ছি, শুনতে পেলাম 'খটাস' করে বাথরুমের দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ। তাকিয়ে দেখি, ভেজা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নন্দিনী এগিয়ে আসছে।

দাও তো, আমি একবার দেখি।

নন্দিনীকে রিসিভারটা দিয়ে শোওয়ার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর জলে ভেজা নন্দিনীকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলাম। ও ছোট-ছোট আদুরে শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে ফোনে কথা বলতে লাগল। আমি আদর করতে-করতে ওর কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম।

হ্যালো, নন্দিনী বলছি। হ্যাঁ, বলো। এই তো, ঘরেই রয়েছে। না, ডক্টর বাসুকে ফোন করিনি। পরশুদিন একেবারে ওকে নিয়ে যাব। তুমি কী করছ এখন? আমি? আমি এই তো গা ধুয়ে বেরোলাম। ইয়ারকি কোরো না। তুমি কবে আসছ? আচ্ছা। রেখে দিই তা হলে—।

ফোন রেখে দিল নন্দিনী। ওর 'উঁ', 'আঃ—' শব্দগুলো এবার জোরে হতে লাগল। ও আমাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যেসব আলগা আপত্তি করছিল সেগুলো যে আসলে কোনও আপত্তিই নয় তা এই তিন বছরে আমি ভালো করে জেনে গেছি।

সুতরাং ভিজে শাড়িটা ওর গা থেকে খসিয়ে দিলাম। তারপর ওকে নিয়ে গেলাম বিছানার কাছে। ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ, আর পরদা ঢাকা আয়নায় আবছাভাবেও কাউকে নজরে পড়ছে না। তা হলে ফুলশয্যা হতে আর বাধা কী।

আদর-ভালোবাসার দমকে আয়নার দিকে তাকানোর কথা খেয়াল ছিল না। কিন্তু সবকিছুর শেষে ক্লান্ত দেহে যখন শুয়ে আছি, তখনই লোকটাকে দেখতে পেলাম। আয়নার বাঁ-দিকের এককোণে ওর বাঁ-চোখ আর চুলের খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

আমি বিছানায় উঠে বসতেই লোকটা সরে গেল।

নন্দিনী অবাক চোখে আমাকে একবার দেখল, তারপর বলল, কী হল!

সেই লোকটা।—আমি আয়নার দিকে চোখ রেখেই জবাব দিলাম।

ও—।

নন্দিনী বিছানা ছেড়ে উঠে মেঝেতে পড়ে থাকা ভিজে শাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ অলসভাবে শুয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম আমার থিয়োরিটার কথা। লোকটার নিশ্চয়ই কোনও খারাপ মতলব আছে। হয়তো সুযোগ বুঝে ও ওই দরজা পেরিয়ে চলে আসবে আমাদের জগতে। ঢুকে পড়বে আমাদের ফ্ল্যাটে। তারপর সাংঘাতিক কিছু একটা কাণ্ড করে....।

আমার মাথাটা কেমন দপদপ করছিল। বোধহয় টেনশানটা বাড়ছে। নাঃ, একটু রাস্তায় বেরোই, পায়চারি করে মাথাটা হালকা করে আসি।

নন্দিনীকে বলে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। কাছেই একটা মাঠ আছে, সেখানে বসে একটু জিরিয়ে নেব।

ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় গাড়ির হেডলাইটের আলোয় একটা লোককে হঠাৎই দীপেশ বলে মনে হল। আমি চেঁচিয়ে ওকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু গাড়িটা চলে যেতেই রাস্তাটা এমন অন্ধকার হয়ে গেল যে, ধন্দে পড়ে গেলাম। বোধহয় দীপেশ না, অন্য লোক। দীপেশকে কাছে পেলে আমি খুব ভরসা পেতাম। তাই কখনও ওকে কাছছাড়া করতে চাইতাম না। কিন্তু সেসব দিন এখন কোথায়!

খোলা মাঠে ঠান্ডা বাতাসে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে ফিরে চললাম বাড়ির দিকে।

ফ্ল্যাটের দরজায় এসেই ভেতর থেকে হাসি আর কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলাম। কী ভেবে কান পাতলাম দরজায়।

ওঃ, সন্দীপের নতুন থিয়োরির জবাব নেই!—কোনও পুরুষের ভারি গলা। তারপর আমার গলা নকল করে ব্যঙ্গের সুরে সে বলল, আমার কী মনে হয় জানিস? ড্রেসিং-টেবিলের ওই আয়নাটা আসলে একটা দরজা।—তারপরই দরাজ গলায় অট্টহাসি।

এবার নন্দিনীর গলা শুনলাম : ওর আজগুবি ফ্যানটাসি নিয়ে ওকে থাকতে দাও। ওষুধপত্র খাচ্ছে—কদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ডক্টর বাসু বলেছেন, ওকে কখনও কনট্রাডিক্ট না-করতে। বলেছেন, ওর সব গল্পে সায় দিয়ে যেতে।

তাই তো দিচ্ছি। ও কোথায় গেছে এখন?

এই আশেপাশে একটু পায়চারি করতে গেছে। এখুনি এসে পড়বে।

আমি কলিংবেলের বোতামে চাপ দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভেতরে কথাবার্তা থেমে গেল।

নন্দিনী দরজা খুলল। আমাকে দেখেই মিষ্টি করে হাসল, বলল, কী, বেড়ানো হল?

আমি অল্প হেসে 'হুঁ' বলে জবাব দিলাম। ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দীপেশকে দেখতে পেলাম। ও সহজভাবে হাসতে চেষ্টা করল, বলল, কী রে, কেমন আছিস?

না, কিছুতেই ওদের বুঝতে দেব না যে, ওদের কথাবার্তা আমি শুনে ফেলেছি। তাই বললাম, ভালো।—তারপর শোওয়ার ঘরের দিকে যেতে-যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে যোগ করলাম : ওষুধ তো খাচ্ছি—কদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

লক্ষ করলাম, পলকের জন্যে নন্দিনী আর দীপেশের মধ্যে চোখাচোখি হল।

আমি শোওয়ার ঘরে ঢুকে গায়ের জামাটা খুলে সটান বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, সাংঘাতিক একটা কিছু না-হওয়া পর্যন্ত এই লোকটার কথা ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আগের দিন আমার থিয়োরির কথা শুনে দীপেশ তো একটুও ঠাট্টা করেনি! আর নন্দিনীও তো কখনও আমার কথায় প্রতিবাদ করেনি! এ-সবই কি ওদের অভিনয়? নাকি ডক্টর বাসু ওদের যেরকম শিখিয়ে দিয়েছেন ওরা সেরকমই ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে!

একটু পরেই ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম, দীপেশ চলে গেল।

আমি চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। নন্দিনীর সঙ্গেও এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ওরা ওদের বিশ্বাসে নিয়ে থাক। দীপেশ যত পারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করুক আমাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ওরা চিড় ধরাতে পারবে না কিছুতেই।

আমার মন বলছে, আয়নার ওই লোকটার মতলব মোটেই ভালো নয়।

শেষ

যা ভয় করছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হল। লোকটাই জিতে গেল শেষ পর্যন্ত। ওকে কিছুতেই আটকাতে পারলাম না।

রাত তখন কটা হবে? বড়জোর সাড়ে এগারোটা। আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকেই দেখি নন্দিনী কেমন অদ্ভুতভাবে বিছানায় শুয়ে আছে। একটা হাত বুকের ওপরে, আর একটা হাত ছড়ানো। শাড়িটা উঠে গেছে হাঁটু পর্যন্ত। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমি ছুটে গেলাম ওর কাছে। দেখি ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে, দাঁত দেখা যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে একফোঁটা রক্ত, আর ওর নরম গলায় কালশিটের দাগ।

আমি ভয়ে পাগল হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি ওর পাল্‌স দেখলাম। কোনও সাড় নেই। ওর নাকের কাছে হাত রাখলাম। না, নিশ্বাস পড়ছে না। তখন ঝুঁকে পড়লাম ওর শরীরের ওপর। বুকে কান চেপে ধরলাম। না, কোনও শব্দ নেই।

আমি ঘামতে শুরু করলাম। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। ভয়ে-ভয়ে তাকালাম আয়নার দিকে। কোথায় গেল লোকটা? নিশ্চয়ই অপকর্মটি সেরে লুকিয়ে পড়েছে।

আমি দৌড়ে গেলাম ফ্ল্যাটের দরজার কাছে। যা ভেবেছি তাই! দরজার লক, ছিটকিনি সব ঠিকঠাক রয়েছে। বাইরের কেউ ফ্ল্যাটে ঢোকেনি। সুতরাং আর কাউকে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। আমি যখন বাথরুমে ঢুকেছি তখনই সুযোগ বুঝে ওই লোকটা বেরিয়ে এসেছে আয়নার ভেতর থেকে। ঘুমিয়ে থাকা নন্দিনীকে নিয়ে নিজের সাধ মিটিয়েছে। তারপর ওকে খুন করে আয়না দিয়ে চম্পট দিয়েছে।

আমি যে এখন কী করি! দরজা খুলে বাইরে গিয়ে কাউকে ডাকাডাকি করতে যাব সে-উপায় নেই। কারণ সেই ফাঁকে লোকটা হয়তো টুক করে বেরিয়ে আসবে আয়না থেকে, তারপর কায়দা করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সোজা হাওয়া হয়ে যাবে। তখন তাকে আর কে খুঁজে পাবে।

আমি নন্দিনীকে জাপটে ধরে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করলাম।

কাঁদতে-কাঁদতেই বললাম, তুই আমাকে চেঁচিয়ে একবার ডাকতে পারলি না!

নন্দিনী ফ্যাকাসে মুখে শূন্য চোখে চুপচাপ তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

হঠাৎই আমার দীপেশের কথা খেয়াল হল। ওকে ফোন করে ব্যাপারটা বলি। তারপর বাকি যা ব্যবস্থা করার ও করবে।

দীপেশকে ফোন করতেই ও-প্রান্ত থেকে ওর ঘুম জড়ানো গলা পেলাম।

হ্যালো।

সন্দীপ বলছি।

দীপেশ চমকে উঠল। উৎকণ্ঠার সুরে বলল, কী ব্যাপারে রে, এত রাতে?

আমি ওকে সব বললাম।

দীপেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। অস্পষ্ট গলায় নন্দিনীর নামটা দু-বার বিড়বিড় করল। তারপর বলল, তুই এ কী করলি, সন্দীপ?

আমি? —দীপেশ বোধহয় আমার কথা ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। তাই ওকে বুঝিয়ে বললাম, আমি কিছু করিনি। আয়নার ওই লোকটা গলা টিপে নন্দিনীকে খতম করেছে। আমি এখন ফ্ল্যাটে বসে পাহারা দিচ্ছি যাতে শয়তানটা পালাতে না-পারে। তুই তো আমার থিয়োরিটাকে আমল দিলি না—এবার দেখ, আমার কথা ঠিক হল কি না!

দীপেশ আমার কথা বুঝতে চাইল না। ও শুধু বলেই যেতে লাগল, ছি, ছি, সন্দীপ, তুই এটা কী কাজ করলি! তুই কেন এসব করলি? নন্দিনীকে তুই...।

দীপেশের গলা বুজে এল। আমি শুধু ওর ভারি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

অনেকক্ষণ পর দীপেশ বলল, তুই ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যাস না যেন। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই লোকজন নিয়ে যাচ্ছি।

না, না, আমি এখানেই আছি—নন্দিনীকে ফেলে আর কোথায় যাব!

ফোন রেখে দিলাম।

তারপর শুধু অপেক্ষা। আয়নার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা আর পাহারা। ওই শয়তান অসভ্য লোকটাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

অনেকক্ষণ পর সিঁড়িতে যেন বেশ কয়েকজোড়া ভারি বুটের শব্দ পেলাম। তারপরই কলিংবেল বেজে উঠল। আর একইসঙ্গে ফ্ল্যাটের দরজায় অধৈর্যভাবে 'দুমদুম' করে ধাক্কা মারল কেউ।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দীপেশ লোকজন নিয়ে এসে গেছে। আমার দায়িত্ব শেষ। সব দায়িত্ব শেষ।

ঘুমে দু-চোখ জড়িয়ে আসছে আমার।

সন্ধের পর, একা

মল্লিকা বেশ বুঝতে পারছিল চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা বিকৃত চিৎকার ওর ঠোঁট চিরে বেরিয়ে আসতে চাইল। আজকের এই মুহূর্তটার জন্য ও মনে-মনে বহুবার তৈরি হয়েছে। তাতে ওর মনে হয়েছিল, বেশ শান্তভাবে ঠান্ডা মাথায় ও ব্যাপারটার মোকাবিলা করতে পারবে। কিন্তু এখন, নির্জন ঘরে, ভয়ঙ্কর মানুষটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মল্লিকার সব হিসেব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

মোহনদাস জোয়ারদার তখন ঘরের একমাত্র দরজাটা লক করে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। মেয়েটার মুখের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভয় পেয়েছে। আজ পর্যন্ত মোহনদাস এমন কাউকে দেখেনি যে ভয় পায়নি। আচ্ছা-আচ্ছা সাহসী মেয়েও এই অবস্থায় ভয় পেয়েছে। অনেকে তো আবার কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। মেয়েগুলো ছিঁচকাদুনে হলে মোহনদাস তেমন মজা পায় না। বরং বিরক্ত লাগে।

'কী, দিদিমণি, ভয় করছে? চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে?' রীতিমতো স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন দুটো করল মোহনদাস।

মল্লিকা জোর করে মাথা নাড়ল।

মোহনদাস কী বুঝল কে জানে! হেসে বলল, 'ভয়ের কী আছে! ভয়ের কিস্যু নেই। আমি তো তোমাকে আর খেয়ে ফেলছি না। শুধু একটু আদর করব। এ-কথা বোলো না যে, লাইফে কেউ কখনও তোমাকে আদর করেনি। তোমাদের গায়ে তো আর কিছু লেখা থাকে না—মানে, ক'জন লোক আদর করেছে তাদের নাম-ঠিকানা তো আর ট্যাক্সির মিটারের মতো তোমাদের কপালে বা...ইয়ে...বুকে লেখা হয়ে যায় না। তোমাদের বডি যদি কম্পিউটার হত তা হলে কী হত সেটা বলা মুশকিল—।'

মোহনদাস জোয়ারদার একটা গানের কলি গুনগুন করে ভাঁজতে-ভাঁজতে ঘরের বাঁ-দিকে রাখা একটা বড় সোফায় গিয়ে বসল। তার পাশের একটা ক্যাবিনেট থেকে ধীরেসুস্থে মদের বোতল, গ্লাস, আর সোডা বের করে নিল। কাজ করার ফাঁকে-ফাঁকে সে মল্লিকার দিকে আড়চোখে দেখছিল। মল্লিকা ঘরের কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। একটু পরেই হয়তো জওহরলাল নেহরু রোডে জল দাঁড়িয়ে যাবে। গাড়িঘোড়া যানবাহন সব জট পাকিয়ে যাবে। বাড়ি ফেরার সময়ের কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকবে না কারও। সুতরাং মল্লিকার আজ দেরি হওয়াটা কারও কাছেই তেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। আর মল্লিকাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার লোক এখন তো একজনই—বুড়ি মা। অথচ গত বছরেও ওকে নিয়ে চিন্তা অথবা দুশ্চিন্তা করার দুজন মানুষ ছিল। এখন একজন আর নেই।

জওহরলাল নেহরু রোডের ওপরে মস্ত বাড়ি ব্যানার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার। বড়

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়ির ছাদের দিকে তাকাতে হলে আকাশমুখো হতে হয়, ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। কলকাতায় এ-ধরনের বাড়িকেই বোধহয় বলে গগনচুম্বী অট্টালিকা। এই বাড়িরই টেন্থ ফ্লোরে মোহনদাস জোয়ারদারের কম্পিউটার ট্রেনিং স্কুল।

মল্লিকা এখানে রিসেপশনিস্টের চাকরিতে ঢুকেছে প্রায় একমাস। ও নিজেই একদিন চাকরির জন্য এসে হাজির হয়েছিল মোহনদাসের অফিসে। মল্লিকার যোগ্যতা ছিল তিনটে : পাস কোর্সে বি. এ. পাশ, অল্প স্বল্প টাইপিং-এর জ্ঞান, এবং ওর রূপযৌবন। মল্লিকা জানত, এরমধ্যে তৃতীয় যোগ্যতাটিই মোহনদাসের সবচেয়ে বেশি মনে ধরবে। কারণ, মোহনদাস জোয়ারদার সম্পর্কে খুঁটিনাটি খোঁজখবর নিয়ে তবেই মল্লিকা যেচে ওর কাছে এসেছে—ওর ফাঁদে নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে। কারণ, মল্লিকার লক্ষ্য ছিল একটাই : মোহনদাস জোয়ারদারকে শায়েস্তা করা। এই জানোয়ারটা গত দেড় বছরে অন্তত চারটি মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। বেচারা মেয়েগুলো নিতান্ত পেটের দায়ে মোহনদাসের কাছে চাকরি করতে এসেছিল—রিসেপশনিস্টের চাকরি। লাঞ্ছিত চারজনের মধ্যে দুজন ব্যাপারটা চেপে যায়। কিন্তু বাকি দুজন পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেও শেষ পর্যন্ত মোহনদাসের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়েনি। পুলিশ ও উকিলের যৌথ কেরামতিতে মোহনদাস ছাড়া পেয়ে যায়।

'আপনি...আপনি আমাকে ছেড়ে দিন...' কথাটা বলতে গিয়ে মল্লিকার গলা কেঁপে যায় : 'এভাবে আমার লাইফটা নষ্ট করবেন না, প্লিজ...।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মোহনদাস হাসল। মেয়েটা দেখতে সত্যি সুন্দরী। আগের চারটে মেয়ের মধ্যে সুলক্ষণা নামের মেয়েটা সবচেয়ে সুন্দরী ছিল। মেয়েটা ঘটনার পর বিস্তর কান্নাকাটি করেছিল। করবেই তো! ওর বয়েস যে ছিল মাত্র উনিশ! তবে মোহনদাস ওকে দু-হাজার টাকা দিয়েছিল। বিয়ে করবে এরকম একটা মেকি শপথও করেছিল। এতে সুলক্ষণার কান্না থেমে গিয়েছিল। এবং মোহনদাস প্রায় দু-মাস মেয়েটাকে ভোগ করতে পেরেছিল।

এভাবেই দিব্যি চলছিল, কিন্তু কে যে সুলক্ষণার মাথায় কুমতলব ঢোকাল কে জানে! মেয়েটা হঠাৎই একদিন উধাও হয়ে গেল। তার কদিন পরেই পুলিশি ঝঞ্ঝাট, কোর্ট-কাছারি। কত টাকা আর বুদ্ধি খরচ করে সেবার মোহনদাস পিঠ বাঁচাতে পেরেছিল।

এই মেয়েটার বয়েস হয়তো সাতাশ-আঠাশ হবে, তবে সুলক্ষণার চেয়েও সুন্দরী দেখতে, আর জিনিসও ভালো।

মল্লিকার কথার উত্তরে মোহনদাস অভয় দেওয়ার হাসি হাসল দ্বিতীয়বার। বলল, 'কী যে বাচ্চা মেয়ের মতো কথা বলো! তোমাকে ছেড়ে দেব না-তো কি আটকে রাখব! তুমি লাইফ নষ্ট করার কথা বলছ কেন, মল্লিকা? আমরা দুজনে এই বৃষ্টির সন্ধ্যায় যদি বন্ধ ঘরে একটু বুলবুলি করি তাহলেই তোমার লাইফ নষ্ট হয়ে যাবে! আরে, দিদিমণি, লাইফ কি এতই সস্তা!' গলাখাঁকারি দিল মোহনদাস। আর-একবার চুমুক দিল গ্লাসে। না, বেশি মদ গিললে চলবে না। তাতে শরীরের হাঁকুপাঁকু ভাবটা বাড়বে, শরীরটা

চাগাড় দিয়ে উঠবে—কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যাট করা যাবে না। কিছুক্ষণ ঠুকঠুক করেই আউট। মল্লিকার সঙ্গে মোহনদাস অনেকক্ষণ তারিয়ে-তারিয়ে ব্যাট করতে চায়। এরমধ্যেই মোহনদাস বেশ বুঝতে পারছে, ওর শরীরটা অধীর হয়ে উঠেছে।

মল্লিকার চোখে এবার সত্যি-সত্যি জল এসে গেল। ভাঙা গলায় ও কোনওরকমে উচ্চারণ করল, 'আপনি...আপনি একটা রেপিস্ট!'

মল্লিকা কী ভেবে এসেছিল, আর কী হচ্ছে! ও মন শক্ত করে এসেছিল মোকাবিলা করতে, লড়াই করতে, শোধ নিতে—অথচ এভাবে ভেঙে পড়ছে! কোনও রেপিস্টের সামনে মেয়েদের মনটাই বোধহয় আগে তছনছ হয়ে যায়, তারপর শরীর।

মোহনদাস জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, 'মল্লিকা, তুমি বড্ড উলটোপালটা কথা বলো! ব্যাপারটা রেপ হবে কি হবে না তার সবটাই ডিপেন্ড করছে তোমার ওপরে। তুমি যদি কোনওরকম ঝামেলা না-করে ব্যাপারটা ইয়ে...মানে...এনজয় করো, তা হলে সেটাকে মোটেই রেপ বলা যায় না। আর তুমি যদি ফালতু-ফালতু চিৎকার-চেঁচামেচি করো, হাত-পা ছুড়ে ঝামেলা পাকাও তা হলেও রেজাল্ট সেই একই—তবে তখন ব্যাপারটা ওই রেপ হয়ে দাঁড়াবে।' মোহনদাস হাসল চাপা শব্দ করে : 'এখানে যে লড়াই বা চেঁচামেচি করে বিশেষ সুবিধে হবে না সেটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ?'

হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পেরেছে মল্লিকা। এই ঘরটা এই বেপরোয়া জহ্লাদটার প্রাইভেট অফিস। তবে বড্ড বেশি প্রাইভেট।

আজ সকাল থেকেই মল্লিকার মনটা কেমন করছিল। মেঘলা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি, আর জোড়ো হাওয়া। কেন যেন ওর মনে হয়েছিল, আজই মোহনদাসের সঙ্গে মোকাবিলার দিন—অথবা, মোকাবিলার রাত। আর হলও ঠিক তাই।

পাঁচটার পর মোহনদাস জোয়ারদার একগাদা টাইপের কাজ চাপিয়ে দিয়েছে মল্লিকার ওপরে। তারপর, সাতটার সময়, যখন ক্লাস হয়ে গেল, ছাত্র-ছাত্রীরা সব চলে গেল একে-একে, তখন মোহনদাস মল্লিকাকে ওর ভেতরের প্রাইভেট অফিসে ডেকেছে ডিক্টেশান দেওয়ার জন্য। গোটা অফিসে তখন ওরা দুজন, আর দারোয়ান-কাম-সিকিওরিটি গার্ড মনোজিৎ। একটু পরেই মোহনদাস 'একমিনিট আসছি।' বলে উঠে গেছে এবং একমিনিট বা ষাট সেকেন্ড পূর্ণ হওয়ার আগেই ফিরে এসেছে।

মল্লিকা আন্দাজ করতে পেরেছিল, মোহনদাস মনোজিৎকে ছুটি দিয়ে এল। আর তখনই ওর বুকের ভেতরে কেউ টিপটিপ করে কিল মারতে শুরু করেছিল। কিন্তু মল্লিকা ঠিক প্রকৃত অর্থে ভয় পায়নি। সেটা পেয়েছে এখন, একটু আগে। আগের চারটে মেয়ের করুণ অবস্থার কথা মল্লিকা এখন আরও ভালো করে বুঝতে পারছে। ওদের জন্য এক অদ্ভুত দুঃখ আর মমতা উথলে উঠছিল মল্লিকার মনে। এমন কী নিজের জন্যও।

ওই চারজন মেয়ের ঘটনা নিয়ে হইচই কম হয়নি। ব্যাপারটা নিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ নারী কল্যাণ সমিতি'-ও অনেক মিটিং-মিছিল করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি। মল্লিকা খবরের কাগজে এই ঘটনার প্রত্যেকটি রিপোর্ট খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছে। আর

তখন থেকেই মোহনদাস জোয়ারদার নামের এই লোকটার ওপরে ওর বিজাতীয় এক রাগ আর আক্রোশ তৈরি হয়েছে। মল্লিকার তো আর কিছু হারাবার ভাবনা নেই। সুতরাং ও সটান বেলঘরিয়ার আস্তানা থেকে একদিন চলে এসেছে রাজা রামমোহন সরণিতে, 'পশ্চিমবঙ্গ নারী কল্যাণ সমিতি'-র ছোট্ট অফিসে। সেখানে ও দেখা করেছে সেক্রেটারি বেলা সরকারের সঙ্গে।

ড্যাম্প ধরা ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মাতঙ্গিনী হাজরা, সরোজিনী নাইডু, মাদার টেরেসা, ইন্দিরা গান্ধী আর কিরণ বেদির ছবি। এদিকে ওদিকে কিছু ব্যানার আর পোস্টার। ঘরের কোণে আঠা-রঙ-তুলি। দুটো বেঞ্চে দুজন মহিলা বসে রয়েছে।

বেলা সরকার একটা বড় টেবিল সামনে রেখে বসেছিলেন। তাঁর বয়েস হয়েছে, চোখে চশমা, পোড়খাওয়া মুখ, সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন নেই।

মল্লিকা ওঁর সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চেয়েছে। সুতরাং বেলা সরকার নরম গলায় কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন দুই সদস্যাকে। ওরা সঙ্গে-সঙ্গেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। মল্লিকা বুঝতে পেরেছিল, 'বেলাদির' নির্দেশ সহজে অমান্য করা যায় না।

মল্লিকা নিজের আক্রোশের কথা জানিয়েছিল বেলা সরকারকে। বলেছিল, 'দিদি, মোহনদাস জোয়ারদারকে আমি শায়েস্তা করতে চাই।'

বেলাদি অবাক হয়ে বলেছেন, 'তুমি—তুমি কেমন করে পারবে! সমিতি থেকে লড়াই করে আমরাই কিছু করতে পারলাম না...।'

'আমি পারব!' জেদের গলায় বলেছে মল্লিকা।

বেলা সরকার অবাক চোখে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখছিলেন। একে কবজায় পেলে মোহনদাস কিছুতেই ছাড়বে না—চোখের পলকে গতি করে দেবে। সুলক্ষণা নামের মেয়েটা কীভাবে না নাস্তানাবুদ হয়েছে! এবার এই মেয়েটা হেনস্থা হতে চায়—সাধ করে!

বেলা সরকারের কোনও বারণই শোনেনি মল্লিকা। শুধু বলেছে, 'আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিন, প্লিজ। আপনাদের না-জানিয়েও আমি যেতে পারতাম...কিন্তু পরে যদি কোনও পুলিশি ঝঞ্ঝাট হয়, সেইজন্যে আপনাদের জানিয়ে কাজে নামতে চাই। আপনারা তখন আমার পেছনে দাঁড়াবেন। দাঁড়াবেন তো?'

মেয়েটার কথায় কী যেন ছিল। বেলা সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মত দিলেন। মল্লিকাকে ওঁর কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছিল। কোথায় যে দেখেছেন মেয়েটার মুখ!

মল্লিকা কাজে নামার আগে আরও দু-দিন বেলাদির সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসেছিল। তারপর সোজা মোহনদাস জোয়ারদারের দপ্তরে।

কিন্তু শায়েস্তা করতে যুদ্ধে নেমে এ কী করুণ অবস্থা মল্লিকার! বারবার বুড়ি মায়ের কথা মনে পড়ছে। চোখ ফেটে জল আসছে। বাইরে বাজ পড়ার শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠছে ও।

ভয়ার্ত চোখে মোহনদাসকে দেখল মল্লিকা। ফরসা, টিকলো নাক, মাথায় টাক, মোটা গোঁফ, গাল দুটো সামান্য ফোলা, চোখে রিমলেস চশমা। বয়েস কত হবে? বড়জোর

পঁয়তাল্লিশ। দেখে কে বলবে সুশ্রী ভদ্র এই মানুষটার খোলসের ভেতরে একটা অমানুষ লুকিয়ে আছে!

মোহনদাস তখন আবার গুনগুন করে গান ধরেছে : 'চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়, চুনরি কে নিচে কেয়া হ্যায়...।'

সুর ভাঁজতে-ভাঁজতেই গ্লাস-বোতল ইত্যাদি আবার ক্যাবিনেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল মোহনদাস। চোখ থেকে চশমা খুলে রেখে দিল ক্যাবিনেটের ওপরে। তারপর আবার এসে বসল সোফায়। গদির ওপরে হাতের চাপড় মেরে বলল, 'এসো, আর দেরি কোরো না...তোমাকে তো আবার বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। এসো, এসো—তোমার কোনও চিন্তা নেই—এটা সোফা নয়, সোফা-কাম-বেড।' বিশ্রীভাবে হাসল, গদিতে আলতো করে তিনটে চাপড় মেরে বলল, 'সোফা মানে তো জানোই। আর কাম কিংবা বেডও তোমার নিশ্চয়ই জানা। কাম, কাম...ফালতু ঝামেলা কোরো না, লক্ষ্মীটি—' সোফা থেকে উঠে তার কলকবজা নেড়ে পিঠের গদিটাকে পেতে দিল মোহনদাস, বলল, 'সোফার কাজ শেষ। এখন শুধু কাম আর বেডের ব্যাপার...'

হঠাৎই মল্লিকার বুকের ভেতরে সমস্তরকম ঝড়-ঝঞ্ঝা থেমে গেল। চোখের কোণে জল থাকলেও বুকের গভীরে উথালপাথাল আর নেই। সাপ যখন ছোবল মারবেই তখন আর কীসের ভয়।

প্রতিশোধের কথা মনে পড়ছিল মল্লিকার, মনে পড়ছিল ওই চারটে মেয়ের কথা। আর একটু পরেই মল্লিকা ওদের দলে যোগ দেবে। তারপর? তারপর সত্যিই কি ক্ষান্ত হবে মোহনদাস? মল্লিকা কি পারবে লোকটার বিষদাঁত ভেঙে দিতে?

মল্লিকা অবাক হয়ে দেখল, ও ধীরে-ধীরে মোহনদাসের সোফা-কাম-বেডের দিকে এগিয়ে চলেছে—সাপের চোখের টানে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো। তবে মল্লিকার শরীরটা এক স্থির কম্পাঙ্কে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। আর কান্না অথবা গোঙানির একটা আওয়াজ পা টিপে-টিপে উঠে আসতে চাইছিল গলা দিয়ে। কিন্তু মল্লিকা দাঁতে দাঁত চেপে শব্দটাকে বন্দি রেখে দিয়েছে গলার ভেতরে।

মল্লিকাকে বেশিদূর এগোতে হল না। অধীর উত্তেজিত মোহনদাস নিজেই উঠে এল সোফা-কাম-বেড থেকে। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একেবারে জাপটে ধরল মল্লিকাকে। মল্লিকা যে সামান্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল সেটা বোধহয় প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বশে। কারণ, ওর চোখে তখন কোনও দৃষ্টি ছিল না, হৃৎপিণ্ডে কোনও শব্দ ছিল না, ফুসফুসে কোনও বাতাস ছিল না। একটা কোমল মৃতদেহ যেন আত্মসমর্পণ করল মোহনদাস জোয়ারদারের হাতে।

ঘরে টিউব লাইট জ্বলছিল। সেই ঝকঝকে আলোতেই মল্লিকার জামাকাপড় ধরে বেপরোয়া টানাটানি শুরু করে দিল মোহনদাস। আর একইসঙ্গে মল্লিকাকে খাঁকড়ে ধরে নিয়ে চলল সোফা-কাম-বেডের দিকে। বলল, 'রুক্মিনি, রুক্মিনি, শাদি কে বাদ কেয়া কেয়া হুয়া—হাঃ, হাঃ, উ-উ-হু—' মল্লিকার গলার খাঁজে মুখ ঘষতে-ঘষতে আরও

করল। 'ফুল ছাড়াই ফুলশয্যা করছি বলে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি...' মোহনদাসের মুখ থেকে হুইস্কি মেশানো বাতাস বেরিয়ে এল।

মল্লিকা আর বাধা দিচ্ছিল না। ওরা পৌঁছে গেল শয্যায়। উজ্জ্বল আলোয় জীবনে এই প্রথম সম্পূর্ণ নগ্ন হল মল্লিকা। মোহনদাস নিজের পোশাক ছিঁড়ে-টিঁড়ে কোনওরকমে খুলে একেবারে হামলে পড়ল মল্লিকার শরীরের ওপরে।

ঘরের টিউব লাইটটা এ-দৃশ্য হয়তো বহুবার দেখেছে, কিন্তু মোহনদাসের জানোয়ারের মতো আচরণে সে-ও একবার কেঁপে উঠল। আর বাইরের বৃষ্টি যেন নিষ্ফল আক্রোশে নিজের মাথা কুটে মরতে লাগল বাইরের দেওয়ালে, জানলার শার্সিতে।

আর ঠিক তখনই অদ্ভুত কান্না একেবারে ভাসিয়ে দিল মল্লিকাকে।

মোহনদাস জোয়ারদার মল্লিকার কান্না খেয়াল করেনি। কারণ মল্লিকা কাঁদছিল প্রায় নিঃশব্দে—শুধু ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছিল। মোহনদাস অর্ধেক চোখ বোজা অবস্থায় সেটাকে মল্লিকার সুখের সংকেত বলে ভুল করল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহে ওর আদরের তীব্রতা বাড়িয়ে দিল। ব্যাট করার আনন্দে খেলার নিয়ম-কানুনের ব্যাপারটা মোহনদাসের আর খেয়াল ছিল না।

খেলা যখন শেষ হল মল্লিকা তখনও কাঁদছে। এক অদ্ভুত টানাপোড়েন চলছিল ওর মনের ভেতরে। কাজটা কি ঠিক হল? শাস্তির পরিমাণটা পাপের তুলনায় বেশি হয়ে গেল না তো! ও চারটে অসহায় মেয়ের কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মন থেকে দুঃখবোধটা মুছে যাচ্ছিল না। মোহনদাস যখন ওকে ছেড়ে দিল, তখনও ওর চোখে জল।

মোহনদাস ক্লান্তভাবে নিজের পোশাক ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল, আর সতর্ক চোখে দেখছিল মল্লিকাকে। মেয়েটা দারুণ! কিন্তু হঠাৎ করে কোনও পাগলামি করে বসবে না তো! বেশ মনে আছে, অনুশ্রী না তনুশ্রী নামের বছর পঁয়ত্রিশের মেয়েটা সবকিছু মিটে যাওয়ার পর হঠাৎই ঘরের টেবিল থেকে একটা পেন-স্ট্যান্ড তুলে নিয়ে ক্ষিপ্তের মতো আক্রমণ করেছিল মোহনদাসকে। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। মোহনদাস সতর্ক তো ছিলই, তা ছাড়া ওর গায়ে জোরও যথেষ্ট। প্রচণ্ড থাপ্পড়ে মেয়েটাকে কাহিল করে দিয়েছিল মোহনদাস।

কাঁদতে-কাঁদতেই শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি পরে নিল মল্লিকা। টিউব লাইটের আলোয় ওর দু-গাল অশ্রুতে চকচক করছিল।

মোহনদাস বিরক্ত জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হল, এখন আবার কাঁদছ কেন? কান্নার কী আছে?'

মল্লিকা ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, 'আপনার জন্যে কাঁদছি।'

বাইরে বৃষ্টির তেজ যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল পলকে। কোথাও বাজ পড়ল কান-ফাটানো শব্দে।

ব্যঙ্গের একটুকরো হাসি তেরছাভাবে ছড়িয়ে গেল মোহনদাসের মুখে : 'কেন, হঠাৎ

আমার জন্যে দুঃখু হচ্ছে কেন?'

মল্লিকা শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিয়ে সেটা দিয়ে চোখ-গাল মুছে বলল, 'আপনি আর নেই বলে—।'

'কী যে সব উলটো-পালটা কথা বলো!' সোফা-কাম-বেড থেকে উঠে দাঁড়াল মোহনদাস জোয়ারদার। ক্যাবিনেটের ওপরে রাখা চশমাটা চোখে দিয়ে মল্লিকাকে কাছে ডাকল : 'এসো, এদিকে এসো। আর-একটু আদর করি। তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। দেখলে তো, একটু-আধটু বুলবুলি করে তোমার লাইফ একটুও নষ্ট হয়নি! আরে বাবা, এক্কি ঘটি-বাটি যে টোল খেয়ে যাবে!'

মল্লিকা পিছিয়ে গিয়েছিল ঘরের এককোণে রাখা একটা টেবিলের কাছে। আলোর দিকে পিঠ করে দাঁড়ানোয় ওর মুখটা আবছা দেখাচ্ছিল। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে শক্ত গলায় মল্লিকা বলল, 'আমি লক্ষ্মী নই—অলক্ষ্মী। তা ছাড়া আমার লাইফ বলে কিছু থাকলে তবে তো আপনি নষ্ট করবেন। তখন ভয় পেয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতো কথা বলেছি। আসলে আমি আপনার কাছে চাকরি নিয়েছিলাম আজকের দিনটার জন্যে। আপনি যে একটার-পর-একটা মেয়ের সর্বনাশ করে যাচ্ছিলেন, সেটা রোখবার জন্যে....আর আপনাকে শায়েস্তা করার জন্যে।'

'শায়েস্তা! আমাকে!' বেশ জোরে হেসে উঠল মোহনদাস।

কিন্তু মল্লিকার কানে হাসিটা ফাঁপা শোনাল। ও বলল, 'খুব খারাপ লাগছে, জানেন—' আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিল মল্লিকা : 'কিন্তু কী করব! আমার তো আর কোনও উপায় ছিল না—?'

'তুমি কী করেছ আমাকে?' চাপা কর্কশ গলায় মোহনদাস কথা বলল।

মল্লিকা ঘাড় ঘুরিয়ে অদ্ভুত চোখে দেখল মোহনদাসকে। হেসে বলল, 'এখনও বোঝেননি? আপনার না আই. কিউ. ভীষণ কম। এইড্‌স-এর নাম শুনেছেন?'

মোহনদাস জোয়ারদারের চোখের সামনে গোটা ঘরটা দুলে উঠল। এইচ.আই.ভি., এইড্‌স—কাগজে এ-নিয়ে কত লেখালেখি চলেছে গত কয়েকবছর ধরে। মেয়েটা কি সত্যি বলছে, না মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে? মোহনদাসের শরীরের ভেতরে কতকগুলো অশরীরী পোকা যেন কিলবিল করে উঠল। ও এপাশ-ওপাশ তাকাল অসহায়ভাবে। আবার বসে পড়ল সোফায়। আমতা-আমতা করে বলল, 'তুমি...তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ। ঠাট্টা করছ।'

মল্লিকার ভীষণ স্নান করতে ইচ্ছে করছিল। মাথায় টিপটিপ ব্যথা আর গা-বমি ভাব। ও সোফায় বসে থাকা লম্পট জানোয়ারটাকে দেখছিল। ওটার দাঁত-নখ আর নেই। সব খতম। মল্লিকার কেমন যেন মায়া হল। বলল শান্ত নরম গলায়, 'না ভয় দেখাচ্ছি না। আপনার অবস্থাটা এখন ঠিক কীরকম জানেন? ধরুন, সাঁতার জানে না, এমন একজন লোক হাওড়া ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিল গঙ্গায়। হিসেবমতো জলে ডোবার পর কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেয়ে তারপর লোকটা মারা যাবে। ওর ফুসফুসে বাতাসের বদলে হুহু করে

ঢুকে পড়বে গঙ্গার জল। তারপর একসময় বেচারা মরবে।'

একটু থামল মল্লিকা। কপাল থেকে চুল সরাল। আয়না দেখার কোনও উপায় নেই। গলার কাছে, গালে সামান্য জ্বালা করছে। শরীরে সামান্য ব্যথা। হাতব্যাগটা রয়েছে রিসেপশান কাউন্টারের ডেস্কের মধ্যে। ওটা পেলে নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে নিত।

'এ তো গেল ডাক্তারি হিসেব।' মল্লিকা আবার বলতে শুরু করল। এতটা মন খুলে নিজের অসুখের কথা কাউকে বলতে পারেনি ও : 'কিন্তু আমার হিসেব কী বলে জানেন? যে-মুহূর্তে লোকটা ব্রিজের আশ্রয় ছেড়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছে সেইমুহূর্তেই যমের খাতায় ওর নাম উঠে গেছে। শূন্যে ভেসে থাকার সময়টুকুই ওর বিচিত্র জীবন—যা থেকেও নেই—অনেকটা মরীচিকার মতো।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মল্লিকা : 'আপনার-আমার জীবনটা এখন তাই। আমার...আমার স্বামী জাহাজে কাজ করত। কোথা থেকে, কোন বিদেশ থেকে, সে এইড্স-এর জীবাণু নিয়ে এসেছিল আমি জানি না। যখন সব জানা গেল, তখন সে-ও শেষ.....আর, আমিও—।'

'মল্লিকা, এসব তুমি কী বলছ!' শিশুর মতো অসহায় সুরে কথা বলল মোহনদাস জোয়ারদার। ওর গলার স্বরে আতঙ্ক নিশ্চিত ছাপ ফেলেছে। ও ভাবতেই পারছে না, ওর জীবনটা এখন শুধু মায়া—'আছে' অথবা 'নেই', এই দুইয়ের মাঝখানে দুলছে। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশের লালচে আভার কথা মনে পড়ল মোহনদাসের। সেতারের তারে শেষবারের মতো টান মেরে সেতারি যখন চলে যায়, তখন সেই সুরের রেশ কী চেষ্টাই না-করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে! মোহনদাসের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। একটু আগেই ওর জীবন কী সম্পূর্ণ ছিল! আর এখন....সব ফাঁকা!

মল্লিকা তখন আপনমনেই বিড়বিড় করে নিজের কথা বলে যাচ্ছে : '...আমার স্বামীর প্রথম ফ্লু মতো হয়েছিল। তারপর জ্বর, গলা ব্যথা। আর দেখতে-দেখতে, বছরখানেকের মধ্যে, সব শেষ।...কিন্তু আমি রয়ে গেলাম...হাওড়া ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দেওয়া ওই মানুষটার মতো...শূন্যে...এখনও গঙ্গা ছুঁতে পারিনি।'

পায়ে-পায়ে মোহনদাসের কাছে এগিয়ে এল মল্লিকা : '...গত বছর কাগজে আমার ছবি বেরিয়েছিল। আপনি বোধহয় ছবিটা খেয়াল করেননি। অবশ্য কেই-বা খেয়াল করে! জানেন, অসুখটা হওয়ার পর এটা নিয়ে কত খোঁজখবর করেছি, কতবার সুইসাইড করার কথা ভেবেছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। আমি মরে গেলে আমার বুড়িমা-টাকে যে দেখার কেউ নেই!' হাত দিয়ে মুখ মুছে নিল মল্লিকা। এমনভাবে বারবার মুখে হাত বোলাতে লাগল যেন অদৃশ্য কতকগুলো মাছি ঘনঘন বসছে ওর মুখের ওপরে : 'আপনি হয়তো জানেন না, এইড্স ছড়ালে ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ২৬৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তাতে ছ-মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে। আবার ২৭০ নম্বর ধারায় এ-জাতীয় রোগ ছড়ালে দু-বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে, ফাইন হতে পারে, এমন কথাও লেখা আছে।' হাসল মল্লিকা—তেতো হাসি, বলল, 'এসব আইনেই হয়েছিল

ব্রিটিশ আমলে, প্লেগের কথা ভেবে। তবে প্লেগের বদলে লেখা হয়েছিল বিপজ্জনক কোনও সংক্রামক অসুখ। এখন তো এইড্‌স এসেছে...আর, প্লেগও একবার উঁকিঝুঁকি মেরে গেছে।...কিন্তু শাস্তির ভয় আমার থাকবে কী করে! ফাঁসির আসামি কখনও জেলের ভয় পায়! তা ছাড়া আমি তো আপনাকে শায়েস্তা করতে এসেছিলাম।'

হঠাৎই মোহনদাস হাউহাউ স্বরে ভাঙা গলায় কাঁদতে শুরু করল। জড়ানো গলায় কীসব বলতে লাগল কে জানে!

মল্লিকা শাড়ি-টাড়ি ঠিকমতো গুছিয়ে নিল শেষবারের মতো। মুখে আঁচল ঘষল কয়েকবার। তারপর বলল, 'নিন, এবার দরজা খুলে দিন...আমি বাড়ি যাব....মা চিন্তা করবে।' একটু হেসে : 'নাকি আপনি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন!'

আচমকা মল্লিকার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহনদাস জোয়ারদার। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে-করতে টিপে ধরল মল্লিকার গলা। লোকটার মুখ থেকে জন্তুর মতো শব্দ বেরোচ্ছিল। তার সঙ্গে মদের গন্ধ।

মল্লিকা প্রাণপণে বাধা দিল। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, 'কী ছেলেমানুষি করছেন! আপনি বুঝতে পারছেন না, আমরা দুজনে কেউই আর ঠিকমতো বেঁচে নেই। আপনি আমাকে খুন করতে চান করুন, কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। একটা মড়া আর একটা মড়াকে খুন করলে কার কী আসে যায়—' ধস্তাধস্তি করতে-করতেই হাসি পেয়ে গেল মল্লিকার। ও হেসে উঠল শব্দ করে।

মোহনদাস কেমন যেন হতভম্ব হয়ে ছেড়ে দিল মল্লিকাকে। লোকটার ফরসা মুখ নীলচে দেখাচ্ছে। আচ্ছা, প্রথম সুযোগেই কি এইচ. আই. ভি. বাসা বাঁধে শরীরে? মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজল মোহনদাস। ওর শরীরের সব শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে। ও সম্মোহিতের মতো প্রাইভেট অফিসের দরজা খুলে দিল। ভয়ঙ্কর সুন্দরী মেয়েটা সহজ পা ফেলে বেরিয়ে গেল বাইরে। মোহনদাসকে রেখে গেল শূন্যে—হাওড়া ব্রিজ আর গঙ্গার মাঝখানে।

ঝমঝম বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল মল্লিকা। মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। মনে পড়ল, মোহনদাসের হাতে হেনস্থা হওয়া চারটে মেয়ের কথা। ওদের কথা ভাবতে-ভাবতে মল্লিকা নিজের বেঁচে থাকা জীবনের একটা মানে খুঁজছিল।

ছলাবউ কলাবউ

সত্যি বলছি স্যার, বউটা আমার যাকে বলে একেবারে স্পেশাল ছিল। 'ছিল' মানে পাস্ট টেন্স। আমাদের ভগবান লোকটা বড় মজার। একদিনের মধ্যে আমার ডাগর সোমত্ত বউটাকে প্রেজেন্ট টেন্স থেকে পাস্ট টেন্স করে দিল। কী বললেন? না, স্যার—সত্যি বলছি—আপন গড, ঋতুপর্ণাকে আমি খুন তো দূরের কথা, ছুঁইনি পর্যন্ত। ছুঁইনি মানে ক্ষতি করার জন্যে ছুঁইনি। ওই আদর-টাদর করার সময় ছুঁতে হয়েছে। না ছুঁয়ে আবার আদর করা যায় না কি!

দুঃখের কথা কী জানেন? বউটা স্বর্গলোকে গিয়েও আমাকে রেহাই দিল না। ওর জন্যেই আমাকে আপনাদের এই থানায় আসতে হল—থানা দেখতে হল, আবার শ্মশানও দেখতে হবে। সবই আমার কপাল!

ঋতুপর্ণা ছিল ভারি অদ্ভুত। প্রবল ঋতুমতী। পুরুষগুলো বোধহয় ওর গন্ধ পেত। সবসময় ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করত। তবে ও বেশিরভাগ সময়েই লোকগুলোকে পাত্তা দিত না। অবশ্য ওদের একেবারে বিদেয় করতেও চাইত না। কারণ, ওরা চলে গেলেই তো ঋতুর বাজারদর পড়ে যাবে।

যখন ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তখন আমাদের মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন সবাই ভেবেছিল, কোষ্ঠীর ছকের কী দারুণ মিল। বিয়ে তো নয়, যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বিয়ের পরে-পরেই আমার বিধবা পিসিমা ঋতুকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, আহা, বউ তো নয়, কলাবউ!

শুনে আমি তো স্যার বেশ তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। দুগ্‌গাপুজোর সময় কলাবউ দেখে আসছি সেই বাচ্চা-বয়েস থেকে। তা কলাবউ বলতে লালপেড়ে সাদা শাড়ি আর একহাত ঘোমটা—শুধু এইটুকুই বুঝি। কাপড় খুললে তো স্রেফ কলাগাছ! ঋতুর সঙ্গে কলাবউয়ের মিলটা কোথায় কে জানে!

তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি ঋতুপর্ণা কী জিনিস। সত্যি, আমার পিসিমা জ্যোতিষী ছিলেন, স্যার। ঋতু তো শুধু কলাবউ ছিল না—একেবারে ছলাবউ কলাবউ। এত ছলাকলা জানে—মানে, জানত। ওরও সেই আধহাত ঘোমটা দেওয়ার অভ্যেস ছিল—গুরুজন বা বাইরের লোকে। সামনে- ঠিক যেন কলাবউ। কিন্তু ওই ঋতুই আবার আধহাত ঘোমটার নিচে সাতহাত খ্যামটা নাচত। আর কাপড় খুললে কলাবউয়ের মতো শুধু কলাগাছ তো নয়, একজোড়া মোচা তার সঙ্গে ফ্রি।

তবে ওই মোচাই সার—কলাটিলা কখনও হয়নি। সে ওর জন্যে, না আমার জন্যে, তা জানি না। আমার কলাবউ নামেই কলাবউ—ফলের বেলায় কাঁচকলা। কিন্তু স্যার

তা নিয়ে কোনও দুঃখ ছিল না আমার। শুধু মাথার ভেতরে মাঝে-মাঝে আগুন জ্বলে উঠত। ঋতুর কাণ্ডকারখানা দেখতাম, একা-একা ঘরময় ঘুরে বেড়াতাম, আর মাথার ভেতর দুনিয়াটা চড়চড় করে জ্বলত, পুড়ত।

এই করে স্যার দশটা বচ্ছর কাটল—দশটা বচ্ছর! আমি অফিস যাই, ফিরে আসি। ঋতু ওর বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকে, আমাকে যেন স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না। শুধু মাঝে-মাঝে মাঝরাতে কলাগাছে জ্বালা ধরলে আমার হাত ধরে টানাটানি করে, আঁচড়ে-কামড়ে দেয়। শাস্ত্র আমাদের মিথ্যে বলেনি, ইন্সপেক্টরসাহেব। ঋতু ছিল একেবারে হস্তিনী টাইপের। আর হাতির সঙ্গে কলাগাছের রিলেশান তো সবাই জানে।

তো একদিন—তা কতদিন হবে? বোধহয় বছরখানেক আগে—ঋতু বাড়ি ফিরল টিপ্‌সি হয়ে। আমি দরজা খুলতেই আমাকে 'ডার্লিং' বলে একেবারে জাপটে ধরে 'চকাং' 'চকাং' করে হাফডজন চুমু খেল। আমার ভীষণ ঘেন্না করছিল, গা রি-রি করছিল। আর মাথার ভেতরে ধুনিটা তখনও জ্বলছিল।

হঠাৎ করে কী যে হয়ে গেল! সেই ধুনিটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। আগুনের লাল জিভগুলো লকলকিয়ে উঠল। এক ধাক্কা দিয়ে ছিটকে দিলাম ঋতুকে। সত্যি বলছি, ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি গলা টিপে ওকে খতম করে দিই। কিন্তু না। আমি নির্বিরোধী ছাপোষা মানুষ। কাউকে খুন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, স্যার। যদি আমিই ঋতুকে কাল রাতে খুন করেছি বলে আপনি ভেবে থাকেন, তবে সেদিনই তো ওকে আমি খতম করে দিতে পারতাম। সত্যি বলছি স্যার, খুনের কথা শুনলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে। তাই সেদিন ঋতুকে কিচ্ছু বলিনি। বড়লোকের ইংরেজি-জানা ফুরতি-ফারতা বাঁজা বউ পার্টি-ফার্টি করে একটু-আধটু মাল খেয়ে ফিরবে এ আর আশ্চর্য কী!

না, ওকে কিছু বলিনি। তবে ওই যে বললাম, মাথার ভেতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। তাই সেটা নেভানোর জন্যে অন্য একটা কেলেঙ্কারি করে ফেললাম। তার জন্যে মার্জনা চাইছি, স্যার।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, বলছি। আমরা—মানে, আমি আর ঋতু—দু-জোড়া বদ্‌রি পাখি পুষতাম। না, এখন আর একটাও নেই—সব কটা মরে গেছে। শুধু হা-হা খাঁচাটা পড়ে আছে। তো সেদিন রাতে মুরগির মাংস রান্না করেছিল অতসী—আমাদের রান্নার লোক। ডাইনিং-টেবিলে সুন্দর করে সাজানো ছিল রাতের খাবার। একটা গোলাপি রঙের কারুকাজ করা বড় চিনেমাটির বাটিতে ঢাকা দেওয়া ছিল গরম মুরগির ঝোল। কী বলছেন? মুরগির মাংসের সঙ্গে বদ্‌রি পাখির কী রিলেশান? আছে, আছে—আর-একটু বললেই বুঝতে পারবেন।

ঋতুর ওই কাণ্ডের পর আমার মাথার ভেতর কী যেন একটা হয়ে গেল। টেবিল থেকে গরম মাংসের পাত্রটা তুলে নিয়ে চলে গেলাম একটু দূরে, ঘরের এককোণে রাখা বদ্‌রি পাখির খাঁচার কাছে। মাংসসমেত গরম ঝোল হড়হড় করে ঢেলে দিলাম মাখনরঙের পাখিগুলোর গায়ে। তারপর চিনেমাটির পাত্রটা ধরে মেঝেতে এক আছাড়।

পাখিগুলো কিচিরমিচির করে ছটফটিয়ে উঠল। দুটো পাখি গরম মাংসের ঝোলে স্নান করে নেতিয়ে পড়ল। আর ঋতু ওই টিপ্‌সি অবস্থাতেই এক চিৎকার দিয়ে উঠল।

আমি কিন্তু ওকে একটি কথাও বলিনি।

ওর চিৎকারে যখন সামনের ফ্ল্যাটের বনমালীবাবু আর তাঁর হোঁতকা স্ত্রী ছুটে এলেন আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায়, তখন আমি বললাম যে, অসাবধানে আমার হাত থেকে মাংসের পাত্রটা পাখির খাঁচার ওপরে পড়ে গেছে। আর ঋতু তো একটু নার্ভাস টাইপের, তাই...।

ওঁরা ভদ্রতা দেখিয়ে দু-চারটে কথা বলে চলে গেলেন।

বাস, সেদিন থেকেই আমার প্রতিবাদের শুরু। তবে সবসময় যে ভেবেটেবে কিছু করতাম তা নয়। যেমন একদিন হঠাৎ করে কী খেয়াল চাপল, বাজার থেকে একটা জ্যান্ত মুরগি কিনে নিয়ে এলাম। ওটা দেখে ঋতু ঠাট্টা করে বলল, কী ব্যাপার, বাড়িতে কি পোলট্রি খুলবে নাকি? আমি কোনও জবাব না-দিয়ে শুধু হাসলাম।

তারপর, সেদিন রাতে, মুরগিটাকে আমাদের শোওয়ার ঘরের ড্রেসিং-টেবিলের পায়ার সঙ্গে একটা হাতচারেক লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। ওটা ঘরের মেঝেতে দিব্যি চরে বেড়াতে লাগল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে ঋতু তো রেগে আগুন। বলল, এসব কী পাগলামি শুরু করেছ! আমি বললাম, হানি, আসল পাগলামি তো এখনও শুরু হয়নি। দ্যাখো না, কীরকম মজা হবে। ও হ্যাঁ, আজ ডক্টর আহুজার পার্টি কেমন জমল? ঋতু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের নিচে কী একটা মোলায়েম মলম মাখতে-মাখতে বলল, ইট ওয়াজ আ ফিয়াসকো। একদম গুবলেট।

ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমি যে ঝুঁকে পড়ে খাটের তলা থেকে আমার হকিস্টিকটা বের করে নিয়েছি, সেটা ও প্রথমে ঠিক খেয়াল করেনি। ছেলেবেলায় এই হকিস্টিকটা নিয়ে আমি স্কুলের মাঠে হকি খেলতাম।

তো হকিস্টিকটা আমার হাতে দেখে ঋতু মলম লাগানো বন্ধ করে আয়নার মধ্যে দিয়ে চোখ বড়-বড় করে আমার দিকে তাকাল। বুঝলাম, আমার হকিস্টিক বাগিয়ে ধরার ভঙ্গি দেখে ও ভয় পেয়েছে।

না, না, ইনস্পেক্টরসাহেব, হকিস্টিক দিয়ে ওকে একটুও মারিনি। আপনিও ঠিক ঋতুর মতোই আমাকে ভুল বুঝলেন। ঋতুকে অবাক করে দিয়ে আমি হকিস্টিক চালাতে শুরু করলাম মুরগিটার ওপরে।

ওটা ডানা ঝাপটে 'কঁক-কঁক' শব্দ করে এদিক-ওদিক পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পালাবে কোথায়! পায়ে তো দড়ি বাঁধা! প্রথম দুটো হিট আমি মিস করলাম, তবে তিন নম্বরটা সোজা গিয়ে লাগল মুরগিটার পাঁজরে। একটা 'ওঁক' শব্দ করে ওটা ছিটকে গেল শূন্যে, কিন্তু দড়িতে টান পড়তেই মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে। আর তখন আমি ঋতুর চোখের সামনেই ওটাকে পাগলের মতো পিটতে শুরু করলাম—যেমন করে ধোপারা মুগুর দিয়ে কাপড় কাচে।

ঘরের মেঝেটা একেবারে যা-তা হয়ে গেল। পালক, রক্ত, মাংস, চটচটে নোংরা—সব একেবারে মাখামাখি। আমার মাথার ভেতরে বিকট স্বরে কতকগুলো দাঁড়কাক ডাকছিল। সেইজন্যেই বোধহয় ঋতুর চিৎকার আমি শুনতে পাইনি। আমি ক্লান্ত হয়ে মেঝেতে লেপটে বসে পড়েছিলাম। অল্প-অল্প হাঁফাচ্ছিলাম। হকিস্টিকটা তখনও হাতে ধরা। সেই অবস্থায় কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আমি ঋতুর দিকে তাকালাম।

ওর মুখচোখ ফ্যাকাসে। বয়েসটা যে ভালো জায়গায় নেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ও অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

একটু পরে ও গালিগালাজের তুবড়ি ছোটাল। আমি যে একটা পাগল, জানোয়ার, অমানুষ—সে-সব বিস্তারিতভাবে আমাকে জানাল। অনেকক্ষণ ধরে ওর মুখ চলল। তারপর যখন বলল, আমাকে পুলিশে দেবে, তখন আমি হেসে বললাম, ডার্লিং, মুরগিটার বদলে যদি তোমার এই হাল করতাম, তবে তুমি—বা অন্য কেউ—পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারতে! মুরগি পিটিয়ে মারলে সেটা দোষের নয়।

আপনিই বলুন, স্যার, আমি কি ভুল বলেছি?

ঋতু সে-রাতে অনেক চিৎকার-চেঁচামেচি করেছিল, যা-নয়-তাই বলে গালিগালাজ করেছিল আমাকে, কিন্তু আমি একটি কথাও বলিনি।

ঘরটা পরিষ্কার করার সময় আঁশটে গন্ধে ঋতু বমি করে ফেলেছিল। আমি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদ-তারা দেখছি, আর ছেলেবেলার কথা ভাবছি।

এখন তো বুঝতেই পারছেন, ইনসপেক্টরসাহেব, খুন করার হলে সেদিনই ওকে আমি খুন করে ফেলতাম। কিন্তু আপনাকে তো বারবার বলেছি, ঋতুর গায়ে কোনওদিন একটা আঁচড় পর্যন্ত আমি কাটিনি। যা কিছু আঁচড় কেটেছি সবই নিজের গায়ে।

তো এমনি করেই চলতে লাগল। আমি যখন খুশি নিজের গায়ে আঁচড় কাটি, আর ঋতু দ্যাখে। আর তখন থেকেই একটু-একটু করে ও পালটাতে শুরু করেছিল। না, না—ওর পার্টি-ফার্টি ছাড়েনি। পালটাতে শুরু করেছিল মানে আমার সঙ্গে কম কথা বলত। এমনকী মাঝে মাঝে যে গলা ছেড়ে গান গাইত, সে-ও বন্ধ হয়ে গেল, স্যার।

কী বললেন? আমি আর কী করেছিলাম? দাঁড়ান, বলছি! একগ্লাস জল খাওয়াবেন? ওঃ—এবার শুকনো গলাটা একটু জুড়োল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। একদিন রাতে—সেদিন ঋতু বাড়ি থেকে বেরোয়নি—ও বিছানায় বসে কী একটা ইংরাজি বই পড়ছিল। ওর কোন এক রীতেনদা আছে—সে নাকি ওকে বইটা পড়তে দিয়েছে। দারুণ বই নাকি! এরকম যে ওর কত 'দাদা' আছে!

আমি ঋতুকে জিগ্যেস করলাম, রাতে কী-কী আছে। মানে, অতসী কী-কী রান্না করেছে। বিয়ের পর প্রথম-প্রথম এরকম প্রশ্ন করলে ঋতু বলত, তুমি কী-কী খাবে বলো। ভাত আছে, ডাল, ইলিশমাছ ভাজা—আর আমি। তখন স্যার আমার রাতের খাওয়া-দাওয়ার লিস্টে লাস্ট আইটেম ছিল ঋতু। ওরও তাই। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরকম খাওয়া-খাওয়ি চলত। তবে ব্যাপারটাকে ওরাল সেক্স ভাববেন না, স্যার। বরং ব্রেইন

খাচ্ছি স্পেশাল মরাল সেক্স।

তো সেদিন ও কী-কী বলেছিল আমার মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, লাস্ট আইটেমটা বাদ ছিল।

রাতে খেতে বসেছি, এমনসময় একটা ফোন এল। ঋতু উঠে গিয়ে ফোন ধরল। শীতেনদার ফোন। বইটা কেমন লাগছে? হি-হি-হি-হি। বলেছিলাম না, দারুণ। খুব ডিপ ব্যাপার। আপনিও তো খুব ডিপ মানুষ, শীতেনদা। তো দশ মিনিট ধরে দুজনে মিলে হা-হা-হি-হি করে এইরকম ডেপ্‌থ চর্চা চলতে লাগল।

ব্যস। আবার সেই খুনির আগুন জ্বলে উঠল আমার মাথায়। দাঁড়কাক ডাকতে লাগল 'কা-কা' করে। ঋতু ফোন সেরে খাওয়ার টেবিলে ফিরে আসতেই আমি বললাম, এসব খেতে আর ভালো লাগছে না। ও অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তার মানে? আমি বললাম, মাংস খেতে ইচ্ছে করছে। ঋতু একইরকম চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, এখন মাংস কোথায় পাব!

ব্যস। আমি চোখের পলকে আমার বাঁ-হাতে এক হিংস্র কামড় বসিয়ে দিলাম। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা কী বলব, ইন্সপেক্টরসাহেব। কিন্তু আমি কামড় ছাড়িনি। আমার হাতটাকে বোধহয় ঋতুর গলা কিংবা শীতেনের ঘাড় ভেবেছিলাম। আমার মুখ দিয়ে 'গোঁ-গোঁ' শব্দ বেরোচ্ছিল। মাথার সবকটা শিরা ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল বারবার। তবুও আমি কামড় ছাড়িনি। শেষ পর্যন্ত এক্টুকরো মাংস ছিঁড়ে এল হাত থেকে। আর একেবারে যাচ্ছেতাই রক্তারক্তি কাণ্ড। আমি মেঝেতে পড়ে গলাকাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগলাম আর চিৎকার করতে লাগলাম। ঋতুও চিৎকার করছিল। তারপর ঠিক কী হয়েছে জানি না। আমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, তাই।

এরপর বেশ কিছুদিন ধরে আমার চিকিৎসা চলল। ঋতু দু-তিনরকম ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল আমার জন্যে। তার মধ্যে একজন ডাক্তার তো স্রেফ ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়ে চলে যেত, আর কাঁড়িকাঁড়ি প্রশ্ন করত। কিছু মনে করবেন না—ঠিক আপনাদের পুলিশি জেরার মতো। তবে ভীষণ উলটোপালটা প্রশ্ন। যেমন, ছোটবেলায় আমি চুপচাপ থাকতাম কিনা। প্রথম 'হিয়ে' শুরু করেছি কত বছর বয়েসে। লাল রঙ পছন্দ করি কি না। একা-একা থাকতে ভালো লাগে, না খারাপ লাগে। এইসব ফালতু প্রশ্ন। আপনিই বলুন, কোনও মানে হয়!

ঋতু একটু-একটু করে মনমরা হয়ে যাচ্ছিল। বাইরে বেরোনোটাও বেশ কমিয়ে দিল। আগের চেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে লাগল আমার।

কী বললেন? ঋতুকে ডিভোর্স করিনি কেন? ডিভোর্স করা মানে তো হেরে যাওয়া। আমার মা আমাকে কখনও হারতে শেখায়নি। আর ঋতু আমাকে ছেড়ে চলে যায়নি কেন? হাসালেন। কী করে যাবে! আমার যে অনেক বিষয়-আশয়। টাকার লোভ বড় সাংঘাতিক জিনিস, স্যার। অনেক মহান মানুষকে দেখেছি টাকার লোভের কাছে কাবু

হয়ে যেতে। ঘরে তারা চুরি করে, কিন্তু বাইরের লোকের কাছে পরোপকারী, মহান সেজে ঘুরে বেড়ায়।

যাই হোক, এরপর তিনবার আমি ক্ষুর দিয়ে আমার বুকে-পেটে-পায়ে দাগ টেনেছি। কাটারি দিয়ে বাঁ-হাতের দুটো আঙুলের ডগা উড়িয়ে দিয়েছি। এই তো, দেখুন না। এই যে—এইসব সেলাই আর দাগ দেখছেন, এইগুলো। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, এসবই করেছি ঋতুর চোখের সামনে। না, কেন করেছি জানি না। হয়তো নিজেকে কষ্ট দিয়ে ওকে বদলাতে চেয়েছিলাম। নাকি ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছি?

না, স্যার, অতশত ভেবে কিছু করিনি। তবে ওই যে বললাম, আমার মাথার ভেতরে একটা ধুনি জ্বলত সবসময়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ঋতুকে আমি খুন করিনি। আমার যে কী অবস্থা তা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না, স্যার। আমি না-পারি মারতে, না-পারি মরতে। এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি শুধু ছটফট করেই গেলাম। আমি নিজেই যেন পায়ে দড়ি বাঁধা একটা মুরগি। ভগবানের মুরগি। আড়ালে থেকে কেউ যেন পাগলের মতো আমাকে হকিস্টিক দিয়ে পেটাচ্ছে...পেটাচ্ছে।

স্যার...স্যার...ঋতুকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। কোথায় রেখেছেন আমার বউকে? আমার কনেবউকে একবারটি দেখান না, স্যার। একটিবার ওর মরামুখ দেখতে না-পেলে আমি পাগল হয়ে যাব, একফোঁটা শান্তি পাব না। বিশ্বাস করুন, স্যার, সত্যি বলছি...।

অস্থির কলঙ্করেখা

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আদমের পাঁজর থেকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন প্রথম রমণী—ইভ। আর সেইমুহূর্ত থেকেই বোধহয় বক্ররেখার বাঁকা অর্থ জন্ম নিয়েছিল। সুতরাং ধোঁয়ার আঁকাবাঁকা রেখায় যদি আমি নগ্ন তরুণীর লাস্য খুঁজে পাই, তা হলে সে আমার দোষ নয়। তা ছাড়া তারক হালদার সবিস্তারে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সবকিছু। সেইদিন থেকেই ধোঁয়া দেখলে আমি ভয় পাই। বিশেষ করে সিগারেটের ধোঁয়া।

সিগারেটের অগ্নিবিন্দু থেকে সাদা ধোঁয়ার রেখা যখন সাবলীল ভঙ্গিতে শূন্যে ভেসে যায়, তখন মনে হয় কোনও নর্তকী যেন তার কুচ-কোমর-নিতম্ব হেলিয়ে-দুলিয়ে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ছলাকলা বিস্তার করছে শূন্যে। অন্যায় কলঙ্কের রেখা এঁকে যাচ্ছে আপনমনে।

না, আগে আমার এমনটা মনে হত না। সবকিছুর মূলে ওই তারক হালদার—এক অদ্ভুত বিচিত্র মানুষ। তিনি আমাকে স্পষ্ট করে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন, সিগারেট খাওয়া কেন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লেখা ওই বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের আসল অর্থই-বা কী।

তারক হালদারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অনুপম। না, সরাসরি ঠিক পরিচয় করিয়ে দেয়নি। তারক হালদারের একটা ভিজিটিং কার্ড ও আমাকে দিয়েছিল। বলেছিল, 'ট্রাই করে দেখ, এই মানুষটা তোর জীবন একেবারে বদলে দেবে। প্রমিস—।'

অনুপমের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। অফিসের মিটিং-এ দিল্লি যাব বলে ডিপারচার লাউঞ্জে বসে আছি। কাচের দেওয়ালের বাইরে ভোরের সকাল। রানওয়ের ওপরে কুয়াশা জমে আছে। তারই মাঝে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে এয়ারবাস। আমাদের দিল্লি নিয়ে যাবে। আমি আনমনাভাবে বসে মৌসুমীর কথা ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম ছেলে তাপসের কথা।

অফিসের কাজে মাসের মধ্যে ছ-সাতবার কলকাতা-দিল্লি করা নিয়ে কাল রাতেও একটু-আধটু ঝগড়া হয়েছে মৌসুমীর সঙ্গে। এমনিতে যে-কোনও ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করাটা মৌসুমীর বেশ পছন্দের। তার ওপর গতকালের বিষয় ছিল 'তাপসের পড়াশোনার ক্ষতি ও পিতার নির্লিপ্ত অবহেলা'। যথেষ্ট গুরুতর বিষয়। সুতরাং আলোচনা বেশ ভালোরকম তাপমাত্রায় পৌঁছেছিল। আমি সাধারণত যাকে 'ঝগড়া' বলি, মৌসুমী তাকেই বলে 'আলোচনা'।

মোল্ডেড প্লাস্টিকের চেয়ারে আরাম করে বসে সেই 'আলোচনা'র অ্যাকশান রিপ্লে করছিলাম মনের পরদায়, আর ডানহাতের দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়ছিল। এমন

সময় আমার পাশে এসে কেউ বসল। আলতো চাপড় মারল কাঁধে : 'কীরে, কেমন আছিস?'

তাকিয়ে দেখি অনুপম। ফিটফাট ঝকঝকে চেহারা। এই পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই বয়েসেও স্বাস্থ্য রেখেছে দারুণ। গত বছরেও ওর চোখে চশমা ছিল। এখন বোধহয় কনট্যাক্ট লেন্স নিয়েছে। ওর মধ্যে আমি ছাত্রজীবনের অনুপম মুখার্জিকে দেখতে পাচ্ছিলাম। ও 'ফর্টি প্লাস' নামে কোনও ট্যাবলেট খাচ্ছে নাকি?

অনুপম ছাত্রজীবনে আমার পাড়ার কাছাকাছি থাকত। দুজন দু-কলেজে পড়লেও ফাইনাল পরীক্ষার আগে আমরা একসঙ্গে পড়াশোনাও করেছি। পরে পাশটাশ করে ও 'সেঞ্চুরি পাবলিসিটি' নামের একটা অ্যাড এজেন্সিতে চাকরি নেয়। এখন 'অ্যাডফোক্স' অ্যাড এজেন্সিতে ডেপুটি ম্যানেজার। আর আমি আছি 'ফোর স্কোয়ার কনসালট্যান্টস'-এ।

চাকরি পাওয়ার কিছুদিন পরেই অনুপম বিয়ে করে বেলেঘাটার দিকে কোথায় যেন ফ্ল্যাট কিনে চলে যায়। তারপর থেকে ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হতই না। হঠাৎ করে বছরদশেক ধরে ওর সঙ্গে আমার এয়ারপোর্টেই বলতে গেলে দেখা হয়। কোম্পানির কাজে ও দিল্লি-বম্বে-মাদ্রাজ করে বেড়ায়। আর আমিও তাই। সুতরাং এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে অথবা প্লেনে বসেই আমাদের সুখ-দুঃখের গল্প হয়। তা ছাড়া দিল্লি-বম্বে-মাদ্রাজে মিটিং-এর পর হাতে সময় থাকলে আমরা আড্ডা মারতে বসি হোটেলে-রেস্তরাঁয় বা কোম্পানির গেস্ট হাউসে।

অনুপমের সঙ্গে একবছর আগে আমার দেখা হয়েছিল দিল্লি এয়ারপোর্টে। দুজনে একসঙ্গে কলকাতা ফিরেছিলাম।

আমি ওর দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুই তো দেখছি বিশবছর বয়েস কমিয়ে ফেলেছিস!'

ও হাত নেড়ে বলল, 'আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি—।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ছাত্রজীবন থেকে যে-অনুপম মুখার্জি চেইন স্মোকার, যে চেইন রিঅ্যাকশন ঘটিয়ে আরও অন্তত একডজন চেইন স্মোকারের জন্ম দিয়েছে, গত বছর দিল্লিতেও যে চেইন স্মোকার ছিল, সেই অনুপম মুখার্জি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে!

আমিও চেইন স্মোকার হয়েছি অনুপমের হাতে পড়ে। সুতরাং হেসে বললাম, 'শোন, যারা তোর-আমার মতো চেইন স্মোকার তারা যদি মাঝে-মাঝে প্রতিজ্ঞা করে পাঁচ-সাতদিনের জন্যে সিগারেট না-ছাড়ল তবে আবার চেইন স্মোকার কীসের!' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললাম, 'রোহিণীকে ছুঁয়ে দিব্যি করেছিস না কি?'

রোহিণী ওর বউয়ের নাম। মৌসুমীকে ছুঁয়ে দিব্যি কেটে আমিও সাত-আটবার সিগারেট ছেড়েছি। তবে প্রত্যেকবারই ওই দিব্যির এফেক্ট সাত-আটদিনের বেশি স্থায়ী হয়নি।

আমার ঠাট্টায় অনুপম হাসল না। বরং বেশ সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'নারে, আমি সত্যি-সত্যি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি।'

আমি একটু হকচকিয়ে গেলেও ঠাট্টার সুরটা বজায় রেখে বললাম, 'হঠাৎ এরকম সাধু মতলবের কারণটা জানতে পারি?' হাতের সিগারেট ছোট হয়ে গিয়েছিল। সেটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা ধরালাম।

অনুপমের ফরসা মুখে সতেজ ছোঁয়া লাগল। অস্বস্তির ভাবটা ঝেড়ে ফেলে ও বলল, 'প্রথম-প্রথম বেশ কাশি হত, বুঝলি। তো ডাক্তার দেখালাম। তার তো একটাই প্রেসক্রিপশান : সিগারেট জীবনের মতো ছাড়তে হবে। কিন্তু তুই তো জানিস, আমার যে-রকম চেইন স্মোকিং-এর অভ্যেস—ছাড়ব বললেই কি আর ছাড়া যায়! রেশ্মিও সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করত। শেষকালে একেবারে বিরক্ত হয়ে ছেড়েই দিলাম। কিন্তু সিগারেট কি আর অত সহজে আমাকে ছাড়তে চায়! দিনে পাঁচ-ছ' প্যাকেটের জায়গায় দু-তিনটে করে লুকিয়ে-চুরিয়ে খেতে লাগলাম। তো কাশিটা লেগেই রইল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, এভাবে কিছু হবে না, কিন্তু কী করব! তারপর একদিন...।'

এমনসময় আমাদের ফ্লাইটের অ্যানাউন্সমেন্ট হল। ক্লোজড সার্কিট টিভিতে ভেসে উঠল নির্দেশ। আধ-খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলাম। অনুপম ওর ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে বলল, 'চল্‌, যেতে-যেতে বলছি—।'

রানওয়ের খোলা জায়গায় বেরোতেই বোঝা গেল শীত এখনও পুরোপুরি যায়নি। তার থাবায় আঁচড় কাটার মতো এখনও কয়েকটা নখ রয়ে গেছে। সূর্য বেশ খানিকটা ওপরে উঠে যাওয়ায় কুয়াশা ফিকে হয়ে এসেছে। প্যাসেঞ্জার কারে করে প্লেনের দিকে যাওয়ার সময় হুহু বাতাসে আমার বেশ শীত করে উঠল।

অনুপম সিট নিয়েছে নন-স্মোকিং জোনে। আর আমি যথারীতি ধোঁয়াটে অঞ্চলে। কিন্তু ওর গল্পের টান আমাকে যেন বঁড়শিতে গেঁথে ফেলেছিল। তাই ওর পাশেই একটা ফাঁকা সিট দেখে বসে পড়লাম। গল্পের শেষটুকু শোনা হয়ে গেলে স্মোকিং জোনে ফিরে যাওয়া যাবে।

লুকোনো স্পিকারে আলতোভাবে সেতারের সুর বাজছিল। মাথার ওপরে লাগেজ ক্যাবিনেটে হাতব্যাগ রেখে যাত্রীরা যে-যার সিট খুঁজে নিতে ব্যস্ত। আজকের ফ্লাইটে ভিড় খুব বেশি নেই।

অনুপমের পাশে গুছিয়ে বসে বললাম, 'তারপর কী হল বল—।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। একদিন আমার এক বন্ধু—কোম্পানির মিটিং করতে গিয়ে আলাপ, নাম বললে তুই চিনবি না—সে আমাকে একটা কার্ড দিল। এলগিন রোডের একটা কোম্পানি, তারা নাকি সিগারেট ছাড়ানোর ব্যাপারে স্পেশালিস্ট। তো আমি সেখানে গেলাম। ভাবখানা ছিল, গিয়েই দেখি না কী হয়। বিশ্বাস কর, তারপর থেকে আমি আর সিগারেট ছুঁইনি।'

আমি অবিশ্বাসের গলায় বললাম, 'কী করে ওরা তোর নেশা ছাড়াল? কোনও ওষুধ-

ওষুধ দিয়েছিল?'

'না, না, ও সব কিছু না—' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে তার ভেতরে কী খুঁজতে লাগল অনুপম, আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'দু-চারটে কার্ড আমার কাছে ছিল। ওরা বলেছিল বন্ধুবান্ধবদের দরকার পড়লে দেবেন। কোথায় গেল?...এই তো।'

মানিব্যাগ থেকে একটা সাদামাটা ভিজিটিং কার্ড বের করে আমার হাতে দিল অনুপম।

Dr. Tarak Halder
Anti-smoking specialist

'Mukti'
7, LALA LAJPAT RAI SARANI
CALCUTTA-700 020
✆ : 475-2137

'জানিস তো, এলগিন রোডের নতুন নাম লালা লাজপত রাই সরণি। কার্ডটা ইচ্ছে হলে তুই রাখতে পারিস, রাজীব। ওরা তোর সিগারেটের নেশা একদম ছাড়িয়ে দেবে। পাক্কা গ্যারান্টি। "মুক্তি" নাম ওদের সার্থক।'

'কী করে ছাড়াবে বল তো।' কার্ডটা আমি পকেটে রেখে দিলাম।

'সেটা বলতে পারব না।'

'বলতে পারবি না? তার মানে?'

'ওদের ওখানে একটা এগ্রিমেন্ট আমাকে সই করতে হয়েছে। তাতে লেখা আছে, ওসব কথা কাউকে বলা যাবে না। তবে তোর চিন্তা নেই। প্রথমদিন ইন্টারভিউর সময় ডক্টর হালদার তোকে সব বলে দেবেন।'

'তোকে এগ্রিমেন্ট সই করতে হয়েছে!' আমি অবাক হলাম।

'হ্যাঁ—।'

'আর সেজন্যে তুই সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিস?'

'তা বলতে পারিস।' অনুপম একটু হাসল।

আমি একটু জেদ করেই বললাম, 'রাখ সে তোর এগ্রিমেন্ট! আমাকে ব্যাপারটা একটু খুলে বল দেখি—কে আর জানতে পারবে!'

অনুপম কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল, এ-নিয়ে ও আর বেশি আলোচনা করতে চায় না। আমার কথায় মুখ ফেরাল, বলল, 'না রে, বলা যাবে না। দেখবি, এগ্রিমেন্ট সই করার পর তুইও ওসব কথা কাউকে বলতে পারবি না।'

'আচ্ছা, ডক্টর হালদার যদি সত্যি করেই সিগারেট ছাড়ানোর স্পেশালিস্ট হন তা হলে এত লুকোচুরি কীসের? তা ছাড়া সিনেমায় বা টিভিতে "মুক্তি"র বিজ্ঞাপনও তো দেখিনি!'

অনুপম হাসল : 'ডক্টর হালদারের কোনও বিজ্ঞাপন লাগে না। ওইসপারিং ক্যামপেইনেই ওরা গাদা-গাদা ক্লায়েন্ট পেয়ে যায়। আর পাবে না-ই-বা কেন! ওঁর কোম্পানির সাকসেস রেট নাইনটি এইট পারসেন্ট।'

'তুই নিজে অ্যাড লাইনের লোক হয়ে এ-কথা বলছিস!'

অনুপম শুধু মুচকি হাসল।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে জিগ্যেস করলাম, 'ওরা কি হাত-পা বেঁধে একটার-পর-একটা সিগারেট খাওয়াতে থাকে, যতক্ষণ না সিগারেট দেখলেই বমি পায়?'

অনুপম মাথা নাড়ল : 'না।'

'এমন কোনও ওষুধ খাওয়ায় যাতে সিগারেট ধরালেই শরীর খারাপ লাগে?'

'না—।'

'সিগারেটের মতো দেখতে কোনও হালকা নেশার লজেন্স ধরিয়ে দেয়? পরে সেই লজেন্সের বদলে আরও হালকা কোনও লজেন্স ধরায়, তারপর...।'

'না, তাও নয়।' এবার মজা পেয়ে চওড়া হাসল অনুপম, বলল, 'তুই নিজে গিয়েই দেখ না—তোর কি সিগারেট খেতে সত্যি খুব ভালো লাগে, বল?'

না, সিগারেট খেতে সত্যি যে আমার খুব ভালো লাগে তা নয়। কিন্তু এত পুরোনো একটা অভ্যেস—হাতে সিগারেট না-থাকলেই মনে হয় কী যেন নেই।

অনুপম বেশ খুঁটিয়ে আমাকে দেখছিল। নরম গলায় বলল, 'ডক্টর হালদার আমার জীবনটা একেবারে বদলে দিয়েছেন। নিজেই বুঝতে পারি, আমার শরীর-স্বাস্থ্য আগের চেয়ে কত ভালো হয়েছে। রোহিণীর সঙ্গে রিলেশানও বেটার হয়েছে। বেশ আছি রে। ট্রাই করে দেখ, এই মানুষটা তোর জীবন একেবারে বদলে দেবে। প্রমিস—।'

'কিন্তু তুই তো আমাকে বেশ ঝামেলায় ফেললি। আমার যে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, কী করে...।'

'সরি, রাজীব, আমাকে রিকোয়েস্ট করিস না। এসব ব্যাপারে নিজে সরাসরি জেনে নেওয়াটাই ভালো।'

অনুপমের সিরিয়াস মুখ আমাকে বলে দিল আমি কানাগলি দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করছি।

এরপর ও কথাবার্তা শুরু করল অফিস নিয়ে। সামনের মাসে ও ম্যানেজার হয়ে যাচ্ছে। এখন দিল্লিতে মিটিং-এ যাচ্ছে বড়ো ক্লায়েন্ট বাগাতে।

ম্যানেজার হওয়ার খবর শুনে আমি ওকে আগাম অভিনন্দন জানালাম। তারপর বললাম আমার অফিসের ঝামেলার কথা, বাড়ির অশান্তির কথা, শরীরের নানা সমস্যার কথা।

অনুপম হেসে চোখ মারল আমাকে : 'মুক্তি!'

প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি 'পরে আবার দেখা হবে' বলে স্মোকিং জোনে নিজের সিটে ফিরে গেলাম।

* * *

মাসখানেক পর একদিন দুপুরবেলা একটা ফারনেস ডিজাইনের কাজ নিয়ে ওয়েসম্যান ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে গেছি। কাজের শেষে অফিসের গাড়ি নিয়ে লালা লাজপত রাই সরণি, মানে, এলগিন রোড দিয়ে ফিরছিলাম। হঠাৎই সাত নম্বর বাড়িটা চোখে পড়ল।

দু-আঙুলের ফাঁকে যথারীতি সিগারেট জ্বলছিল। কী কারণে জানি না, গলা খুসখুস করে উঠে কাশি হল কয়েকবার। আর ঠিক তখনই কোনও শয়তানি দাবার চালে সাত নম্বর বাড়িটা দেখতে পেলাম। একইসঙ্গে 'মুক্তি' লেখা ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডটাও চোখে পড়েছিল আর অনুপমের কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল।

অফিসের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি নেমে পড়লাম রাস্তায়। কটকটে রোদ্দুরে পা ফেলে এগিয়ে গেলাম 'মুক্তি'র দিকে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে অনুপমের দেওয়া ভিজিটিং কার্ডটা একবার দেখে নিলাম।

ঝকঝকে শৌখিন তিনতলা বাড়িটার রঙ সাদা। বাড়ির ঠিক সামনে ফুটপাথের ওপরে একটা অশ্বত্থ গাছ। গাছতলায় এক টিয়াপাখি-জ্যোতিষী বসে ঝিমোচ্ছে।

বাড়িটার বাইরের দেওয়ালে অন্তত গোটা পাঁচেক কোম্পানির সাইনবোর্ড। দরজায় উর্দিপরা দারোয়ান। তাকে জিগ্যেস করে জেনে নিলাম, 'মুক্তি' দোতলায়। কিন্তু ভিতরে ঢোকার আগে কী ভেবে হাতের সিগারেটটা রাস্তায় ফেলে দিলাম।

লিফট নেই। তবে আধুনিক চওড়া অথচ খাটো উচ্চতার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে কোনও কষ্ট হল না। সামনেই বড় কাচের দরজা। কাচের ওপরে লাল রঙ দিয়ে ভিজিটিং কার্ডের কথাগুলোই লেখা। দরজার নবে সোনালি শিকলিতে একটা প্লাস্টিকের বোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা : OPEN।

কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, সাজানো-গোছানো, সুন্দর। দেওয়ালে ক্রিম রঙের ডিসটেম্পার। হঠাৎ করে থ্রি স্টার হোটেলের রিসেপশান বলে ভুল হয়। ডানদিকে দেওয়াল ঘেঁষে বাদামি ভেলভেটে মোড়া সোফা-সেটি। তার সামনে পালিশ করা মেহগনি কাঠের টেবিলে কারুকাজ করা পিতলের ফুলদানি আর ম্যাগাজিন। দুজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক ব্যাজার মুখে সোফায় বসে আছে। কে জানে, আমারই মতো বৈরাগী হতে এসেছে কি না!

নীল রঙের ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকে মোড়া রিসেপশান কাউন্টারে সালোয়ার-কামিজ পরা একটি সুন্দরী মেয়ে বসে ছিল। সামনে রাখা পারসোনাল কম্পিউটারের কিবোর্ডে ওর নেলপালিশ রাঙানো সরু আঙুল দ্রুত নড়াচড়া করছে।

আমাকে দেখে আঙুল থামাল মেয়েটি। কম্পিউটারের পরদা থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল। ওর গভীর দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

আমি একটু ইতস্তত করে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। গোলাপি আর কালোয় ছাপা সালোয়ার-কামিজে বেশ মানিয়েছে ওকে।

পকেট হাতড়ে মানিব্যাগ বের করে তার ভেতর থেকে ভিজিটিং কার্ডটা বের করলাম। সেটা তরুণীর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এটা এক বন্ধু আমাকে দিয়েছিল। ও এখান থেকে ট্রিটমেন্ট করিয়েছে...।'

মেয়েটি হাসল, বলল 'আমাদের ক্লায়েন্টরা আমাদের কখনও ভোলে না। আপনার নাম?'

'রাজীব দত্ত।'

কম্পিউটারের কিবোর্ডের ওপরে মেয়েটির হাত চলতে শুরু করল আবার।

'ঠিকানা?'

'থ্রি বাই ফোর গৌরীবাড়ি লেন, ক্যালকাটা ফোর।'

'আপনি কি ম্যারেড, মিস্টার দত্ত?'

'হ্যাঁ—' কিন্তু বিয়ের সঙ্গে সিগারেটের সম্পর্ক কী!

'ওয়াইফের নাম?'

'মৌসুমী দত্ত।'

'ছেলেমেয়ে?'

'একটি ছেলে—'

'নাম?'

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তাপস দত্ত।'

'আমাদের কোম্পানির কথা আপনাকে কে বলেছে, মিস্টার দত্ত?'

'আমার এক পুরোনো বন্ধু—অনুপম মুখার্জি।'

কিবোর্ডের ওপরে মেয়েটির আঙুল পেশাদারি ভঙ্গিতে চলতেই লাগল। একটু পরে ও কী একটা বোতাম টিপতেই পাশে রাখা ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে একটা ফ্যানফোল্ড পেপার ছাপা হয়ে বেরিয়ে এল। সেটা হাতে নিয়ে মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সোফার দিকে আঙুল দেখিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলল, 'একটু ওয়েট করুন, মিস্টার দত্ত। আমি দেখছি যাতে আপনাকে বেশিক্ষণ বসতে না-হয়।'

মেয়েটি স্বচ্ছন্দ পা ফেলে একটা কাচের দরজা ঠেলে মসৃণ করিডর ধরে চলে গেল ভেতরে। আর আমি আনমনা পায়ে এগিয়ে লম্বা সোফার একপ্রান্তে গা এলিয়ে বসে পড়লাম। পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গিয়ে লক্ষ করলাম, টেবিলে কোনও অ্যাশট্রে নেই। এটাই কি ডক্টর হালদারের ট্রিটমেন্টের প্রথম ধাপ? সুতরাং সিগারেটের মায়া ছেড়ে টেবিল থেকে একটা 'সানডে' ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলাম। আড়চোখে দেখলাম, সোফায় বসা অন্য দুজন ভদ্রলোক বেশ উসখুস করছে।

ঠিক তখনই মিষ্টি গলা কানে এল : 'মিস্টার দত্ত, আপনি ভিতরে যান—।'

রিসেপশানের সুন্দরী ফিরে এসেছে।

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ভেতরে যাওয়ার দরজা ঠেলে করিডরে পা রাখলাম। এবার কোনদিকে যাব? এ-কথা ভাবামাত্রই কোথা থেকে একজন স্বাস্থ্যবান লোক এসে

হাজির হল আমার পাশে। তার পরনে জিন্স, আর নীল টি-শার্ট। টি-শার্টে লেখা : 'CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH'। লেখাটার ঠিক নিচেই একটা নরকরোটির ছবি। সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

লোকটি চাপা গলায় আমাকে বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন—।'

অনেকগুলো বন্ধ দরজা পার হয়ে গেলাম আমরা। তারপর করিডরের শেষে ডানদিকে ঘুরেই একটা দরজা সামনে পেলাম। দরজার গায়ে প্লাস্টিকের হরফে ডক্টর তারক হালদারের নাম লেখা। নামের নীচে গোটা তিনেক ডিগ্রি। তার মধ্যে এম. বি. বি. এস.-টাই শুধু আমার চেনা।

দরজায় টোকা দিয়ে সামান্য অপেক্ষা করল লোকটি। কয়েকসেকেন্ড পরেই বেশ মোলায়েম গলায় কেউ বলে উঠল : 'কাম ইন—'

দরজা ঠেলে আমরা দুজন ভেতরে ঢুকলাম।

ছোট অথচ ছিমছামভাবে সাজানো ঘর। এক অদ্ভুত ঠান্ডা নরম স্নিগ্ধ আলো সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। বেশ বড় মাপের একটা টেবিলের ও-পাশে বসে আছেন ডক্টর হালদার। দোলানো চেয়ারে অল্প-অল্প দুলছেন। সৌম্য চেহারায় আত্মীয়ের ছাপ। ডানহাতে একটা কাগজ।

আমাকে দেখেই হেসে বললেন, 'আসুন, মিস্টার দত্ত, বসুন। আপনার ডেটা শিটটাই দেখছিলাম।' হাতের কাগজটা সামান্য নাড়লেন তিনি। তারপর আমার সঙ্গের লোকটিকে বললেন, 'প্রতাপ, তুমি এখন এসো। আমরা একটু প্রাইভেট কথাবার্তা বলব—।'

সঙ্গে-সঙ্গে প্রতাপ চলে গেল ঘর থেকে।

চেয়ারের দুলুনি থামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর হালদার। আমি এবার ওঁকে মনোযোগ দিয়ে দেখলাম।

বয়স বড়জোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। ফরসা। মাথার সামনেটা টাক, তবে পেছন দিকে ঘাড় পর্যন্ত চুল। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। তীব্র চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা। নাকের ডগায় একটা আঁচিল। পরনে সাদা অ্যাপ্রন। আর গলায় স্টেথো ঝুলছে।

ঘরের দুটো জানলাই পরদা ঢাকা। এ ছাড়া ডক্টর হালদারের পেছনের দেওয়ালে ছোট মাপের আয়তাকার লম্বা একটা জানলা—তার ওপরেও সবুজ পরদার আড়াল।

ঘরের বাঁদিকের দেওয়ালে বেশ বড়সড় একটা তেলরঙ ছবি। ছবিতে আপাদমস্তক শীর্ণকায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পরনে দামি পোশাক। চোখে খর দৃষ্টি। গাল ভাঙা। এবং হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

আমার গলা খুসখুস করছিল। পকেটে রাখা সিগারেটের প্যাকেটটার ওপরে একবার হাত বুলিয়ে নিলাম। খাঁচায় বন্দি আমার পোষা পাখি।

পায়চারি করতে-করতেই ডক্টর হালদার মোলায়েম আন্তরিক গলায় বললেন, 'মিস্টার দত্ত, আপনি কি সত্যি-সত্যি সিগারেট ছাড়তে চান?'

আমি ইতস্তত করে একবার ঢোক গিলে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ...ছাড়তেই তো এসেছি।'

'ভালো কথা—খুব ভালো কথা।' আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে হাসলেন তারক হালদার। হাতের কাগজটা টেবিলে রাখলেন। চেয়ারের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে একটা ড্রয়ার খুললেন। তার একটু পরেই একটা টাইপ করা এগ্রিমেন্ট বের করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

'আমাদের ক্লিনিকের কয়েকটা ফরমালিটি আছে। এই এগ্রিমেন্টটা পড়ে নিয়ে সই করে দিন, প্লিজ—।'

আমি চট করে চোখ বুলিয়ে নিলাম কাগজটায়। 'মুক্তি'-র চিকিৎসাপদ্ধতি আমি গোপন রাখব। কোনওভাবেই ক্লিনিকের স্বার্থবিরোধী কাজ করব না। ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সুতরাং টেবিল থেকে একটা বলপয়েন্ট পেন তুলে নিয়ে খসখস করে সই করে দিলাম।

ডক্টর হালদার মুখে তৃপ্তির একটা শব্দ করলেন। আমার কাছে এসে কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে এগ্রিমেন্টের কাগজটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন টেবিলের ও-পাশে। ড্রয়ারে আবার রেখে দিলেন কাগজটা।

হাতে হাত ঘষে শব্দ করে হাত ঝাড়লেন তারক হালদার। হেসে বললেন, 'মিস্টার দত্ত, এভাবেই রিলেশান তৈরি হয়। এখন থেকে আপনি আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড। আসলে যারা স্মোক করে তাদের সবার সঙ্গেই আমি রিলেশন তৈরি করতে চাই।'

টেবিলের ডানপাশে একটা পারসোনাল কম্পিউটার বসানো ছিল। তার সফ্‌ট হোয়াইট মনিটরে আয়তাকার কারসর দপদপ করে জ্বলছে। ওটার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে ডক্টর হালদার বললেন, 'আমার কাছে যতগুলো কেস আসে, তার সবকটাই আমি নিজে হ্যান্ডল করি। নেহাত পেরে না-উঠলে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টদের সাহায্য চাই...।'

তারক হালদার চেয়ারে বসে পড়লেন। কম্পিউটারের কিবোর্ডের বোতাম টিপতে-টিপতে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন আমাকে : 'বলতে পারেন, ভারতে প্রতি সেকেন্ডে কটা সিগারেট বিক্রি হয়?'

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে আন্দাজে ঢিল ছুড়লাম : 'দুশো?'

শব্দ করে হাসলেন হালদার। কম্পিউটারের পরদায় তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই বললেন, 'উঁহু, আড়াই হাজারের ওপর। বছরে বিক্রি হয় প্রায় আশি বিলিয়ন সিগারেট।'

সংখ্যাটা আমাকেও নাড়া দিল। কিন্তু গলাটা ভীষণ শুকনো লাগছে। এখান থেকে বেরিয়েই যদি একটা সিগারেট না-ধরাই তা হলে আমি আর বাঁচব না। কেন যে অনুপমের কাছ থেকে কার্ডটা রাখতে গেলাম!

'মিস্টার দত্ত, সিগারেট খেলে স্বাস্থ্যের অনেকরকম ক্ষতি হয়।' কম্পিউটারের দিক থেকে সরে এসে আমার মুখোমুখি তাকিয়ে হালদার বললেন, 'টোব্যাকোতে নিকোটিন আছে তা তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। প্রায় ৪০০ বছর ধরে তামাকের ব্যবহার চলে আসছে। সেই তুলনায় সিগারেট খাওয়ার শখ মাত্র ৯০ কি ১০০ বছরের পুরোনো। আমরা এটা অভ্যেস করেছি সাহেবদের কাছ থেকে।' তারক হালদার মাথা নাড়লেন : 'খুব খারাপ অভ্যেস—।'

হায় ভগবান। এরকম জ্ঞান দিয়েই কি ডক্টর হালদার আমাকে সিগারেট ছাড়াবেন?

'সিগারেটের ধোঁয়াতে, বুঝলেন, মিস্টার দত্ত—চার হাজারেরও বেশি জিনিস রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটা ফারমাকোলজিক্যালি অ্যাকটিভ : অ্যান্টিজেনিক, সাইটোটক্সিক, মিউটাজেনিক আর কারসিনোজেনিক। এগুলো নানাভাবে শরীরের ক্ষতি করে।'

আমার মুখের চেহারা দেখে হালদার বোধহয় কিছু একটা অনুমান করলেন। একটু তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'জানি, আমি একটু টেকনিক্যাল কথাবার্তা বলছি, কিন্তু তবু এসব আপনার জানা উচিত। আজকেই যা আমাদের একটু বেশি সময় লাগবে। এরপর থেকে সবই খুব ছোটখাটো ব্যাপার।'

কম্পিউটারের মনিটরের দিকে একবার তাকিয়ে থুতনিতে আলতো করে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'সাধারণত তামাকপাতায় কার্বোহাইড্রেট, ননফ্যাটি অরগ্যানিক অ্যাসিড, নাইট্রোজেন কম্পাউন্ড আর রেজিন থাকে। সিগারেট ধরালে ঠোঁটের দিকটায় টেম্পারেচার হয় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর আগুনের দিকে প্রায় ৯০০ ডিগ্রি। এই হিটে পাইরোলিসিস রিঅ্যাকশান হয়ে নানারকম রাসায়নিক তৈরি হয়। তার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগই হল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড। বাকি ১০ ভাগে গ্যাস, বাষ্প বা সূক্ষ্ম কণার অবস্থায় থাকে কার্বন মনোক্সাইড, টার, নিকোটিন, ফিনল, বেনজোপাইরিন এইসব। ধোঁয়ার এক মিলিলিটারে ০.৩ থেকে ৩.৩ বিলিয়ন পার্টিকল থাকে। এদের মাপ হল, ০.২ থেকে ০.৫ মাইক্রোমিটার। সুতরাং খুব সহজেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে চলে যায়। এসব তথ্য আপনাকে জানানো আমার ডিউটি।'

তারক হালদার হাসলেন মিটিমিটি। হাতে হাত ঘষে বললেন, 'মিস্টার দত্ত, ব্যাপারটা অনেকটা চণ্ডীপাঠের মতো শোনাচ্ছে, তাই না? আপনার হয়তো ঘুম পাচ্ছে—।'

আমি তাড়াতাড়ি একটু নড়েচড়ে বসে জবাব দিলাম, 'না, না খারাপ লাগছে না—আপনি বলুন। এরকম করে আমাকে কখনও কেউ বুঝিয়ে বলেনি।'

শালা অনুপম! দাঁড়া, আবার কখনও তোর সঙ্গে আমার এয়ারপোর্টে দেখা হোক! তোর ইয়েতে আমি চারমিনারের ছ্যাঁকা দেব।

এখন এই ঠগটা কত টাকা চাইবে কে জানে! একটা সিগারেট পেলে ভালো হত।

'মিস্টার দত্ত, আমরা চণ্ডীপাঠ দিয়ে শুরু করি বটে, তবে জুতো সেলাই দিয়ে খতম করি। আচ্ছা, বলুন তো, দিনে মাত্র এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়া মানে বছরে সিগারেটে মোট কটা টান দেওয়া?'

আমি মাথা নাড়লাম। আন্দাজে বোকার মতো উত্তর দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

সবজান্তার ঢঙে মাথা দোলালেন তারক হালদার : 'সত্তর হাজারেরও বেশি। এতে কী হয় জানেন? মুখ, নাক, ফ্যারিংস আর ট্রাকিওব্রংকিয়াল ট্রি-র মেমব্রেনগুলোতে তামাকের ধোঁয়া লাগে। ধোঁয়ার কতকগুলো কম্পাউন্ড সরাসরি মেমব্রেনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে, আর বাকিগুলোর কিছু রক্তে মিশে যায়, নয়তো মুখের লালার সঙ্গে পেটে চলে যায়। যারা রেগুলার স্মোক করে তাদের দেখবেন মাঝে-মাঝে শ্বাসকষ্ট হয়, কাশি হয়।

তা ছাড়া কার্ডিয়াক প্রবলেম, পেপটিক আলসার হওয়া ছাড়াও লাংস, ল্যারিংস বা ফুড পাইপেও ক্যান্সার হতে পারে।'

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বাঁ-হাতটা বরাভয় ভঙ্গিতে তুলে স্মিত হাসলেন হালদার, বললেন, 'জানি, এ নিয়ে বিতর্ক আছে—তবে এসব রোগের ভয়টা নিছক অহেতুক নয়।'

ডক্টর হালদার আবার কম্পিউটারের দিকে মনোযোগ দিলেন, কিবোর্ডের বোতাম টিপলেন পটাপট। তারপর আমার দিকে না-তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট খান, মিস্টার দত্ত?'

'উইলস্ ফিল্টার—।'

'হুঁ। একটা সিগারেটের লেংথ ৭৪ মিলিমিটার, ফিল্টারের লেংথ ২২ মিলিমিটার, ডায়ামিটার সাড়ে সাত মিলিমিটার। আর একটা সিগারেটের ওজন ৯৪০ মিলিগ্রাম। নিকোটিনের পরিমাণ তেমন মারাত্মক নয়। বরং চারমিনারের ওজন ৮৬৫ মিলিগ্রাম আর লেংথ ৬৮ মিলিমিটার হলেও নিকোটিনের সমস্যাটা একটু বেশি। আসলে নিকোটিন নিয়েই যত সমস্যা আমাদের।'

'হ্যাঁ, দেখেছি—রুমালে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে হলদে ছাপ পড়ে।'

'না, না।' মাথা নাড়লেন ডক্টর হালদার : 'পিওর নিকোটিনের কোনও রং নেই। দশটা কার্বন পরমাণু, চোদ্দটা হাইড্রোজেন পরমাণু, আর দুটো নাইট্রোজেন পরমাণু দিয়ে এই ভয়ঙ্কর বিষ তৈরি। প্রকৃতির এমনই লীলা, তামাক পাতার মধ্যে এই বিষ রয়েছে—অবশ্য খুব সামান্য পরিমাণে। আসলে কী জানেন? নিকোটিনের মধ্যেই একটা নেশার টান থাকে। যার জন্যে অনেকেই সহজে সিগারেট ছাড়তে পারে না। আমার কাছে এলে অবশ্য আর কোনও প্রবলেম থাকে না—।'

এই লোকটার কথা যতই শুনছি ততই সিগারেটের তেষ্টা পাচ্ছে আমার।

'আমরা কীভাবে সিগারেটের নেশা ছাড়াই সেটা বলার আগে অন্যান্য ক্লিনিক কী করে সেটা একটু বলি। ডাক্তাররা প্রায় সকলেই একমত যে, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু আশ্চর্য, সিগারেটের নেশা ছাড়ানোর ব্যাপারে ডাক্তারদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। যেসব ডাক্তাররা সিরিয়াসলি ট্রিটমেন্ট করতে চান, তাঁরা কেতাবি ঢঙে পেশেন্টদের সাহায্য করেন। যেমন, পেশেন্টের স্মোক করার হিস্ট্রি জানতে চান। বন্ধুর মতো তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, সিগারেট খাওয়া কী-কী কারণে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সিগারেটের নেশা ছেড়ে দিলে আখেরে কী-কী লাভ হতে পারে সেগুলোর ওপরে জোর দেন। সিগারেট ছাড়ার ব্যাপারে পেশেন্টকে পরামর্শ দেন, তাকে অ্যাসিস্ট করেন। পেশেন্টের সেল্ফ-হেল্প-এর জন্যে বইপত্তর পড়তে দেন। দরকার হলে ফরমাল ট্রিটমেন্ট প্রোগ্রামে পেশেন্টকে ভর্তি করে নেন। সিগারেট ছেড়ে দেবার পর পেশেন্ট যাতে আবার সিগারেট না-ধরে তার জন্যে পেশেন্টকে সাহায্য করেন, উৎসাহ দেন। মোট এই সাতটি কেতাবি ধাপ। আমি এর নাম দিয়েছি "সপ্তপদী"।'

কথাটা বলে বেশ মজা করে হেসে উঠলেন তারক হালদার। টেবিলে ছোট্ট একটা চাপড় মেরে বললেন, 'কী বিচিত্র চিকিৎসা! এতে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা এতটুকু কমেছে বলে আপনার মনে হয়?'

আমি প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে গিয়ে বললাম, 'শুনেছি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলে মাথা ঘোরে, মাথা টনটন করে, পেট ফেঁপে যায়...।'

তারক হালদার মাথা নাড়লেন, বললেন, 'এর বেশিরভাগটাই মনের অসুখ। তবে সিগারেট হঠাৎ ছেড়ে দিলে কিছু-কিছু অসুবিধে হয় বইকি। এ-জন্যে বিদেশে নিকোটিনওলা চুয়িংগাম পাওয়া যায়। সিগারেটের বদলে পেশেন্টরা ওটা খায়—অবশ্য ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তবেই খায়।'

আমি আর থাকতে না-পেরে বললাম, 'ডক্টর হালদার, আপনি এখনও আমার ট্রিটমেন্টের কথা কিছুই বলেননি—।'

তারক হালদার মিষ্টি করে হাসলেন। কম্পিউটারের কিবোর্ডে একটা চাটি মারলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মনিটরের সব লেখা মুছে গেল। কালো পরদায় শুধু একটা ডস প্রম্পট আর সাদা কারসর দপদপ করতে লাগল।

চোখের চশমাটা খুলে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন হালদার। মাথা ঝুঁকিয়ে দু-আঙুলে নাকের গোড়া টিপলেন কয়েকবার। তারপর এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। তাঁর লম্বা চুল ঝাঁকুনি খেল। হঠাৎই আবার মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখের কনীনিকা সামান্য কটা বলে মনে হল এখন।

'মিস্টার দত্ত, আমার ট্রিটমেন্টের কায়দা কোনও বইতে লেখা নেই। এটা খুব সহজ, কিন্তু দারুণ কাজ দেয়। কে কী বলল-না-বলল তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা স্রেফ রেজাল্ট চাই—পজিটিভ রেজাল্ট।'

ডক্টর হালদার উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। হাত নেড়ে হেসে বললেন, 'আমরা কোনও ওষুধ দিই না, নিকোটিনওলা কোনও চুয়িংগামও দিই না। মহাপুরুষদের বাণী শুনিয়ে জ্ঞান দিই না। পেশেন্টকে কোনওরকম ডায়েটিং করতে বলি না। আর—' চওড়া করে হাসলেন হালদার। তাঁর সুন্দর দাঁতের সারি দেখা গেল। বললেন, 'পেশেন্ট সিগারেট ছেড়ে যদি টানা একবছর থাকতে পারে তবেই আমরা টাকা নিই। আর তাও খুব সামান্য—পেশেন্টের পাঁচবছরের সিগারেটের নেশার খরচ।'

'সে কী!' আমার মুখ দিয়ে শব্দ দুটো যান্ত্রিকভাবে বেরিয়ে এল। ডক্টর হালদার বলছেন কী! এত সস্তা!

'কেন, অনুপমবাবু আপনাকে এ-কথা বলেননি?'

'না—।'

'আচ্ছা, ভালো কথা, মিস্টার মুখার্জি কেমন আছেন? ভালো আছেন তো?'

'হ্যাঁ, ভালো আছে।'

'বাঃ, ফাইন। এবারে কয়েকটা প্রশ্ন করব, মিস্টার দত্ত। প্রশ্নগুলো একটু...ব্যক্তিগত,

তবে কথা দিচ্ছি এর উত্তরগুলো আর কেউ জানবে না।'

'বলুন?' আমার গলাটা শুকিয়ে যেন সাহারা হয়ে গেছে।

'আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালোবাসেন?'

আমি বিরক্ত চোখে তারক হালদারের দিকে তাকালাম, কিন্তু তিনি অবিচলিতভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

সুতরাং অস্পষ্ট গলায় বিড়বিড় করে বললাম, 'হ্যাঁ, ভালোবাসি—'

'বাঃ, বেশ, বেশ।' টেবিলের পাশ দিয়ে আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন ডক্টর হালদার। তারপর আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'আপনার ছেলে তাপসকে আপনি ভালোবাসেন?'

আমি বেশ রেগে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। অনেকটা চেঁচিয়ে বললাম, 'সিগারেট ছাড়ার সঙ্গে এসব প্রশ্নের কী সম্পর্ক?'

অবুঝ ছেলের রাগ দেখে বুদ্ধিমান পিতা যেমনভাবে ক্ষমার হাসি হাসেন, ঠিক সেইভাবে হাসলেন তারক হালদার। তারপর বললেন, 'সম্পর্ক আছে, মিস্টার দত্ত। বসুন। উত্তেজিত না-হয়ে আপনি দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন—'

'হ্যাঁ, ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি,' বলে আবার বসে পড়লাম চেয়ারে।

'বাঃ, চমৎকার! কোন স্কুলে পড়ে তাপস?'

'সে জেনে আপনি কী করবেন?' একটা সিগারেট! ওঃ, একটা সিগারেট কেউ দয়া করে আমাকে দিক!

তারক হালদার হাসলেন। থুতনিতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, বলতে হবে না। আমরা জেনে নেব। কাল বিকেল তিনটে থেকে আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হবে। যদি আপনার কোনও প্রশ্ন থাকে তা হলে কাল তার উত্তর পাবেন।'

'আজ তা হলে আসি—' আমি উঠে পড়লাম। বাইরে বেরিয়েই সিগারেট ধরাতে হবে।

ডক্টর হালদার আবার ফিরে গেছেন নিজের চেয়ারের কাছে।

'শেষ একটা প্রশ্ন, মিস্টার দত্ত। প্রায় ঘণ্টাখানেক আপনি কোনও সিগারেট খাননি। কেমন লাগছে বলুন—।'

'ভালোই লাগছে,' মিথ্যে কথা বললাম। এই বুজরুকটাকে আমি নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব। তবে ওর ট্রিটমেন্টের টেকনিকটা জানার জন্যে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

'ভালো, খুব ভালো,' স্মিত হেসে বললেন হালদার। চশমাটা টেবিল থেকে তুলে আবার বসালেন নাকের ওপর : 'আজ যত পারেন সিগারেট খান। কাল ট্রিটমেন্ট শুরু হওয়ার পর থেকে আর কখনও আপনি সিগারেট খাবেন না। সিগারেটে আপনার অ্যালার্জি হয়ে যাবে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, মিস্টার দত্ত। এটা আমার গ্যারান্টি।' দেওয়ালের ছবির মানুষটার দিকে একপলক তাকিয়ে আমি ডক্টর হালদারের চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

প্রতাপ কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল আমার পাশে। চুপচাপ আমাকে এগিয়ে দিল রিসেপশন পর্যন্ত।

পরদিন 'মুক্তি'-র রিসেপশানে যখন হাজির হলাম তখন কাঁটায়-কাঁটায় তিনটে।

গতকাল সারাটা সন্ধে আর আজ সকালটা শুধু দোটানায় ভুগেছি : তারক হালদারের সঙ্গে আর দেখা করব কি করব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটো কারণে দেখা করতে এসেছি। প্রথমত, মনুপমের একটা কথা আমার কানে বাজছিল : ট্রাই করে দেখ, এই মানুষটা তোর জীবন একেবারে বদলে দেবে। প্রমিস—।' আর দ্বিতীয়ত, আমার কৌতূহল।

মৌসুমীকে 'মুক্তি'-র কথা কিছু বলিনি। কে জানে, গোটা ব্যাপারটা হয়তো একটা ধাপ্পা। পরে ও উঠতে-বসতে এ নিয়ে আমাকে খোঁটা দেবে। ব্যাপারটা আর-একটু এগোক, তারপর না-হয় দেখা যাবে।

'মুক্তি'-র অফিসে ঢোকার আগে বাড়িটার দরজায় দাঁড়িয়ে প্রাণভরে সিগারেটে টান দিয়েছি। একেবারে ফিল্টার পর্যন্ত খেয়ে তারপর টুকরোটা ফেলেছি। এটাই বোধহয় আমার জীবনের শেষ সিগারেট—অন্তত ডক্টর হালদার গতকাল সে-রকমই বলেছেন। কিন্তু সিগারেটের শেষ টানটা কেমন বিচ্ছিরি লাগল।

রিসেপশানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ভেতরে যাওয়ার ডাক পেলাম। প্রতাপ আমাকে পৌঁছে দিল ডক্টর হালদারের ঘরে। তারপর চলে গেল ঘর ছেড়ে।

তারক হালদার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে। বললেন, 'আসুন, আসুন, মিস্টার দত্ত। আপনি এসেছেন—আমি খুব খুশি হয়েছি। আমাদের বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট প্রথম ইন্টারভিউর পর আর আসেন না। মনে হয়, তাঁরা সিগারেট ছাড়ার ব্যাপারে তেমন সিরিয়াস নন। আশা করি আপনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাওয়া যাবে—।'

হিপনোটাইজ-টিপনোটাইজ করে কিছু করবে না কি? এখন তো হিপনোটিজ্‌ম ছাড়া আর কিছু আমার মাথায় আসছে না।

'আমার—ইয়ে, মানে, ট্রিটমেন্ট কখন শুরু হবে?' ইতস্তত করে জিগ্যেস করলাম।

এবার তারক হালদার একটুও না-হেসে বললেন, 'শুরু হবে নয়, শুরু হয়ে গেছে, মিস্টার দত্ত। আপনি আমার ঘরে ঢোকামাত্রই আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। এখন আপনার সিগারেট না-ছেড়ে আর উপায় নেই। আপনার কাছে সিগারেট আছে?'

আমি একটু অবাক চোখে ডক্টর হালদারকে দেখলাম, বললাম, 'হ্যাঁ, আছে।'

ডক্টর হালদার প্রথমে চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখলেন। সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সাদা অ্যাপ্রনটা খুলে ফেললেন গা থেকে। সেটা টেবিলের একপাশে রেখে হাত বাড়ালেন আমার দিকে।

'সিগারেটগুলো আমাকে দিন—।'

আমি প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করে হালদারের হাতে দিলাম। প্যাকেটে তিনটে

সিগারেট ছিল।

প্যাকেটটা টেবিলে রেখে তারক হালদার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বুঝতে পারলাম, মানুষটাকে এখন যেন অন্যরকম লাগছে। চশমা, স্টেথো আর অ্যাপ্রন খুলে ফেলায় হালদারকে মোটেই আর ডাক্তার বলে মনে হচ্ছে না। যদিও তাঁর ফুলহাতা চেক শার্ট আর টেরিকটনের প্যান্ট যথেষ্ট আধুনিক এবং নিখুঁত।

হঠাৎই ডানহাত মুঠো পাকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটার ওপরে এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলেন হালদার। তাঁর কটা চোখ জ্বলজ্বল করছে, সরু ঠোঁটে একচিলতে হাসি।

মুখের ভাব এতটুকু না-পালটে প্যাকেটটার ওপরে ঘুষির-পর-ঘুষি মেরে চললেন তিনি। ঘুষির শব্দে বন্ধ ঘরটা যেন কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। সিগারেটের প্যাকেটটা দলা পাকিয়ে গেল, থেঁতলে গেল, সিগারেটের টুকরো ছিটকে গেল, তামাক ছড়িয়ে গেল টেবিলে।

শব্দেই বোঝা যাচ্ছিল, তারক হালদারের ঘুষির জোর নেহাত কম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মুখের হাসিতে এতটুকু চিড় ধরেনি। আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল।

তারক হালদার একসময় থামলেন। তাঁর স্বাস্থ্যবান শরীরটা সামান্য হাঁফাচ্ছিল। টেবিল থেকে তামাকের গুঁড়ো আর থেঁতলানো প্যাকেটটা নিয়ে ফেলে দিলেন বাজে-কাগজ-ফেলার ঝুড়িতে। বললেন, 'মিস্টার দত্ত, বিশ্বাস করুন, এ-কাজে আমি দারুণ আনন্দ পাই। এত বছর হয়ে গেল এ-ব্যবসায় নেমেছি, কিন্তু এই তৃপ্তিতে একটুও ভাটা পড়েনি।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'আপনার কি মনে হয় এতেই আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেব? এই বিল্ডিং-এর ঠিক উলটো দিকে একটা পানের দোকান রয়েছে—।'

'ধীরে, মিস্টার দত্ত, ধীরে।' হাত তুলে আমাকে বাধা দিলেন তারক হালদার : 'এত অল্পে অধৈর্য হবে না। আমি ছেলেমানুষ নই যে, ভাবব এই সিগারেটের প্যাকেট থেঁতলানো দেখেই আপনি সিগারেটের নেশা ছেড়ে দেবেন। সবাই যদি এতই সুবোধ হত তা হলে আমাদের দেশে এত সমস্যা থাকত না। আর আমাদের মতো ডাক্তারের প্রয়োজন পড়ত না।'

মানুষটাকে আমার কেমন অসহ্য লাগছিল। কিছু একটা বলার জন্যে যেই মুখ খুলতে গেছি অমনি তারক হালদার বাধা দিলেন আমাকে। কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ে ফটাফট কিবোর্ডের বোতাম টিপলেন। একগাদা লেখা ফুটে উঠল মনিটরে।

সেদিকে তাকিয়ে হালদার বললেন, 'আপনার ছেলে হেয়ার স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। কথায় সামান্য তোতলামি ভাব আছে। বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর পদবি ছিল নন্দী। উনি ইকনমিক্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছেন। আপনারা আগে—।'

আমি রাগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। উত্তেজিতভাবে বললাম, 'এসব আপনি কোত্থেকে জানলেন? কোন সাহসে আপনি আমার ফ্যামিলি—।'

তারক হালদার এতটুকু বিচলিত হলেন না। শান্ত গলায় বললেন, 'আমি তো কালই

আপনাকে বলেছি, দরকার পড়লে আমরা সব জেনে নেব। তবে আপনার কোনও চিন্তা নেই, এসব আর কেউ জানতে পারবে না।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি চললাম।' সিগারেটের নেশা আমি ছাড়তে চাই না।' আমি চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে এগোতে গেলাম দরজার দিকে।

'মিস্টার দত্ত!'

তারক হালদারের ডাকে থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালাম। অবাক হয়ে দেখলাম মানুষটার মুখ ভাবলেশহীন। বাঁ-হাতে ঘাড়ের কাছে লম্বা চুলগুলো একটু নেড়ে তিনি বললেন, 'এখুনি যাবেন না, মিস্টার দত্ত। দয়া করে একটু বসুন, কথা আছে।'

আমি ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসলাম। হালদার তখন মিটিমিটি হাসছেন—যেন এরকম ছেলেমানুষি উত্তেজনা দেখে-দেখে তিনি ক্লান্ত।

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, মিস্টার দত্ত, আমরা কাজের লোক—শুধু কাজ বুঝি। আমরা শুধু রেজাল্ট চাই, রেজাল্ট। সিগারেটের নেশা ছাড়ানো যে কী ঝামেলার তা আমরা হাড়ে-হাড়ে জানি। এ-নেশা যাঁরা ছাড়েন তাঁদের শতকরা প্রায় সত্তরভাগ আবার পুরোনো হ্যাবিটে ফিরে যান। অথচ দেখুন, ড্রাগের নেশা যাঁরা একবার ছাড়েন, তাঁদের শতকরা পাঁচজনও ওই ড্রাগের নেশায় আর ফিরে যান না। সেদিক থেকে সিগারেটের নেশাটা বড় অদ্ভুত। এককথায় এক্সট্রর্ডিনারি।'

ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের দিকে চোখ গেল আমার। প্রায় ইঞ্চিদেড়েক লম্বা একটা সিগারেটের টুকরো দেখা যাচ্ছে। ওটা ধরিয়ে অনায়াসে গোটাকয়েক টান দেওয়া যায়। কিন্তু তারক হালদার আমাকে লক্ষ করছিলেন। একটু হেসে টুকরোটা তুলে নিলেন বাজে-কাগজ-ফেলার ঝুড়ি থেকে। দু-আঙুলে রগড়ে ওটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন। তারপর আবার স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করলেন।

'ছবির ওই মানুষটাকে দেখুন, মিস্টার দত্ত—' আঙুল তুলে অয়েল পেন্টিং-এর শীর্ণকায় মানুষটিকে দেখালেন তারক হালদার : 'সিগারেটের বিষাক্ত ধোঁয়া ওই কর্মঠ মানুষটার জীবন অকালে শেষ করে দিয়েছে। প্রথমে স্মোকার্স লাঙ, তারপর লাঙ ক্যান্সার, আর সবশেষে মৃত্যু—অকালমৃত্যু। লক্ষ-লক্ষ টাকার মালিক ছিলেন ভদ্রলোক। যখন বুঝতে পারলেন, শেষদিন আর বেশি দূরে নেই, তখন তাঁর শেষ ইচ্ছের কথা বলেছিলেন : সিগারেটের কুৎসিত নেশাকে উচ্ছেদ করতে হবে। সিগারেটের ধোঁয়া তাঁর চোখে ছিল অশ্লীল। তাই অঢেল টাকা ঢেলে গড়ে তুলেছিলেন "মুক্তি" ফাউন্ডেশন। মারা যাওয়ার সময় আমার দু-হাত চেপে ধরে জানিয়েছিলেন তাঁর সাধের কথা। আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম। তাই আমার চোখের সামনে এই ছবি রেখেছি। ছবির ওই মহৎ মানুষটা সবসময় তাকিয়ে থাকে আমার চোখের দিকে, আমাকে শাসনে রেখেছে—যেন আমার শপথের কথা আমি কখনও ভুলে না যাই।'

কথা বলার সময় তারক হালদারের মুখের রেখা নরম হয়েছিল। নিজেকে সামলে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন তিনি। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন ধীরে-ধীরে, 'মিস্টার দত্ত, সবচেয়ে আশ্চর্য হল, ওই মানুষটি নিজে ডাক্তার ছিলেন—ডক্টর

মহেন্দ্রনাথ হালদার। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তিনি সিগারেটের নেশা ছাড়তে পারেননি। এটাই হচ্ছে ট্র্যাজেডি।'

'উনি কি আপনার কেউ...'

'হ্যাঁ। আমার বাবা। আমার নাম উনি রেখেছিলেন তারকনাথ। কিন্তু ওঁর মৃত্যুর পর অকালে যখন অনাথ হলাম নিজের নাম থেকে ওই নাথটুকু আমি ছেঁটে ফেলে দিয়েছি। এখন আমার সামনে শুধু একটাই লক্ষ্য। আমার ক্লিনিকের লাভটা বড় কথা নয়, কাজটাই বড় কথা।'

তারক হালদার হাত বুলিয়ে মুখ মুছলেন, বললেন, 'আচ্ছা, মিস্টার দত্ত, সিগারেটের ধোঁয়া যখন এঁকেবেঁকে শূন্যে ভেসে যায় তখন মনে হয় না কোনও তরুণীর শরীরের কোমল ভাঁজ-খাঁজ এসব ফুটে উঠছে?'

আমি বিরক্ত হয়ে জবাব দিলাম, 'না, কখনও ভেবে দেখিনি।'

'এবার থেকে ভেবে দেখবেন। আসলে পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই একটা বিকৃত যৌনকামনা লুকিয়ে আছে। এই যে লম্বা সরু সিগারেট দু-ঠোঁটে চেপে ধরে আপনারা চোষেন—মানে টানেন, সেটাও ওই সেক্সের ব্যাপার। ফ্রয়েড দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। অথচ দেখুন, সিগারেটের নেশাকে আমাদের সমাজ মোটেই অন্যায় বলে মনে করে না—' একটু চুপ করে থেকে চোয়ালের রেখা শক্ত করে তারক হালদার চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি অন্যায় বলে মনে করি। সমাজ অসুস্থ বলে আমি তো আর অসুস্থ হতে পারি না—।'

'এবারে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা দয়া করে বলবেন?' আমার ধৈর্য ক্রমশ কমে আসছিল।

'হ্যাঁ, এবার সে-কথাই বলব।' দাঁত বের করে হালদার হাসলেন : 'দেখবেন, আমার টেকনিকটা শোনার পর আপনার সমস্ত রাগ গলে জল হয়ে যাবে। আসুন, এদিকে আসুন—।'

তারক হালদার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, পেছনের দেওয়ালের সবুজ পরদা ঢাকা ছোট জানলাটার কাছে গেলেন। কী একটা বোতাম টিপতেই পরদা সরে গেল। ততক্ষণে আমি ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

গোটা জানলাটা কাচে ঢাকা। কাচের মধ্যে দিয়ে ও-পাশের একটা ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে। ঘরের মেঝেটা ইস্পাতের তৈরি। তার ঠিক মাঝখানে একটা প্লেটে কিছু কচি ঘাস আর লেটুস পাতা রয়েছে। গলায় টুকটুকে লাল ফিতে বাঁধা একটা সাদা-কালো খরগোশ প্লেটের ওপরে ঝুঁকে পড়ে আপনমনে ঘাস-পাতা খাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক মাথা নাড়তেই ওর লম্বা-লম্বা কান দুটো নড়ছে।

প্রাণীটার মখমলের মতো লোম এত লোভনীয় যে, হাত বুলিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ডক্টর হালদার খরগোশটা আমাকে দেখাচ্ছেন কেন? খরগোশের সঙ্গে সিগারেটের সম্পর্ক কী?

'খরগোশটার দিকে নজর রাখুন, মিস্টার দত্ত।' কথাটা বলেই তারক হালদার

জানলার তাকে লাগানো একটা লাল বোতাম টিপতে লাগলেন, আর নিরীহ প্রাণীটা খাওয়া থামিয়ে তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাগল।

ওটার চোখ গোল-গোল হয়ে গেল। গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল শজারুর কাঁটার মতো। আর লাফাতে লাগল পাগলের মতো।

'কী করছেন কী! খরগোশটাকে মেরে ফেলবেন না কি!'

আমার চিৎকারে এতটুকুও বিচলিত না-হয়ে তারক হালদার বললেন, 'না, মরবে না। খুব অল্প ভোল্টেজের ইলেকট্রিক শক দিয়েছি—।'

লক্ষ করলাম, একটা সরু তার কোথা থেকে যেন এসে খরগোশটার গলার ফিতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

'দেখুন, খরগোশটা এবার কী করে।' বোতাম থেকে হাত সরিয়ে তিনি বললেন।

খরগোশটা প্লেট থেকে প্রায় ছ-সাত ফুট দূরে সরে গেছে। গুটিসুটি মেরে বসে থরথর করে কাঁপছে। চোখে দিশেহারা ভয়।

'খাওয়ার সময় যদি খরগোশটাকে বারবার এরকম শক দেওয়া হয় তা হলে ও ধরে নেবে, খেতে গেলেই ব্যথা পেতে হবে। সুতরাং, ও খাওয়া ছেড়ে দেবে। শক দিতে-দিতে এরকম একটা অবস্থা আসবে, মিস্টার দত্ত, যখন সামনে খাবার থাকা সত্ত্বেও খরগোশটা ভয়ে খাবার ছুঁয়ে দেখবে না। স্রেফ উপোস করে মরে যাবে। এটাকে বলে "অ্যাভারশন ট্রেনিং"। আমি এর বাংলা নাম দিয়েছি "বিতৃষ্ণা-থেরাপি"।'

কথা শেষ করে হো-হো করে হেসে উঠলেন ডক্টর হালদার। ওঁর চোখ অদ্ভুতভাবে চকচক করতে লাগল। আর আমি সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারলাম, আমার সিগারেটের নেশা ছাড়াতে ওঁর ট্রিটমেন্ট ঠিক কোন পথ ধরে এগোবে। সুতরাং আর একটি কথাও না-বলে আমি সোজা এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে।

'মিস্টার দত্ত, প্লিজ, আমার কথাটা আগে শুনুন—।'

আমি দরজার হাতল ধরে টান মারলাম।

দরজা বন্ধ!

'ডক্টর হালদার, যদি এক্ষুনি দরজা না-খুলে দেন তা হলে দশমিনিটের মধ্যে পুলিশ এখানে চলে আসবে।'

বরফের মতো ঠান্ডা গলায় তারক হালদার বললেন, 'বসুন, মিস্টার দত্ত।'

তারক হালদারের সবকিছুই যেন এখন পালটে গেছে। ওঁর চোখে এখন মহেন্দ্রনাথ হালদারের শাণিত দৃষ্টি। চোয়ালের রেখা শক্ত। জিভ বুলিয়ে নিলেন ঠোঁটে। টেবিলে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ায় কাঁধের পেশি ফুলে উঠেছে। ঠোঁটের একটা কোণ সামান্য বেঁকিয়ে এক অদ্ভুত বেপরোয়া হাসি ফুটিয়ে তুললেন। কপালের একটা শিরা কাঁপছে। সব মিলিয়ে শিকারি যেন শিকারের দৌড় দেখছে।

মানুষটাকে এই প্রথম সাইকোপ্যাথ বলে মনে হল। এই মুহূর্তে একটা সিগারেটের বিনিময়ে আমি একটা সাম্রাজ্য দিয়ে দিতে পারি।

'আমার সহজ ট্রিটমেন্টের কায়দাটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি।'

'ঢের হয়েছে, ডক্টর হালদার। আপনার ট্রিটমেন্টে আমার আর কোনও আগ্রহ নেই। এই সোজা ব্যাপারটা আপনার মাথায় কেন যে ঢুকছে না বুঝতে পারছি না!'

'না, ব্যাপারটা বরং উলটো। আপনি কেন বুঝতে পারছেন না, মিস্টার দত্ত, আপনার আর ফেরার পথ নেই। আমি যখন বলেছি আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে তখন সত্যি-সত্যিই শুরু হয়ে গেছে। বসুন, আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি...।'

'সে আপনি যতই বোঝান, এখান থেকে বেরিয়েই আমি পাঁচ প্যাকেট সিগারেট কিনব। তারপর সেগুলো টানতে-টানতে থানায় পৌঁছে যাব।' টের পাচ্ছিলাম, নেহাত অকারণেই আমার বুকের ভিতরে হাতুড়ির শব্দ হচ্ছে।

'আপনার যা মরজি। তবে আমার ধারণা, পুরো ব্যাপারটা শোনার পর আপনি বোধহয় মত পালটাবেন।' তারক হালদার একইভাবে টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্তভাবে কথাগুলো বললেন।

আমি বিরক্তভাবে চেয়ারের কাছে এলাম। অযথা শব্দ করে চেয়ারটা হ্যাঁচকা মেরে টেনে নিয়ে বসে পড়লাম : 'বলুন, শুনি—।'

'ট্রিটমেন্টের প্রথম মাসটায় আমার লোকেরা আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরে রাখবে। চব্বিশ ঘণ্টায় যদি আপনাকে ওরা সিগারেট খেতে দ্যাখে তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে ফোন করে জানাবে।'

'আর আপনি আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসে ওই খরগোশের খেলা খেলাবেন?' আমার কথায় খানিকটা ব্যঙ্গ আর তাচ্ছিল্যের ছোঁয়া ছিল, কিন্তু মনের গভীরে একটা আতঙ্ক জন্ম নিচ্ছিল ধীরে-ধীরে। আমি বোধহয় কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছি।

'না, না। আপনি ভুল বুঝেছেন, মিস্টার দত্ত।' তারক হালদার সাপের মতো হাসলেন : 'এই ইলেকট্রিক শক আপনাকে দেওয়া হবে না—দেওয়া হবে আপনার স্ত্রীকে। আর আপনি জানলা দিয়ে দেখবেন। আপনি তো জানেন, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে ডক্টর হালদারকে দেখছিলাম। আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালোবাসেন? আপনার ছেলে তাপসকে আপনি ভালোবাসেন? এসব অদ্ভুত প্রশ্নের কারণ বোধহয় এখন বোঝা যাচ্ছে।

'মিস্টার দত্ত, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর—এই বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ আপনি বহুবার দেখেছেন, কিন্তু আমল দেননি। এর কারণ কী জানেন? কারণ, এই ওয়ার্নিং-এর আসল অর্থটা আপনি বোঝেননি।'

তারক হালদার আক্ষেপে মাথা নাড়লেন, হাতে হাত ঘষলেন।

'আপনার আর কী দোষ! এই ওয়ার্নিং-এর আসল অর্থটা বেশিরভাগ লোকই বোঝে না। আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আপনি সিগারেট খেলে শুধু আপনার নয়, আপনার ফ্যামিলিরও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, আপনার ছেলের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, আর আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি তো হবেই। হাইলি ইনজুরিয়াস।'

ডক্টর হালদার পায়ে-পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর সহজ ট্রিটমেন্টের

কায়দাটা জলের মতো বুঝিয়ে দিলেন আমাকে।

আমার প্রথম ভুলের জন্যে মৌসুমীকে তুলে নিয়ে এসে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হবে। দ্বিতীয়বার অবাধ্য হলে আমার কপালে জুটবে ওই শাস্তি। তৃতীয়বার আমাদের দুজনকেই শক দেওয়া হবে। আর চতুর্থবার যদি সিগারেট ধরানোর ভুল করি তা হলে বাধ্য হয়ে ডক্টর হালদার তাপসের স্কুলে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। সুযোগ বুঝে ছেলেটাকে ধরে একটু 'পালিশ' দেওয়া হবে।

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে ডক্টর হালদার বললেন, 'বাচ্চাটার কী কপাল দেখুন! বাপি কথা শুনছে না দেখে সে মার খাচ্ছে—।'

'আপনি মানুষ না জানোয়ার!' রাগে আমার মাথা দপদপ করছিল। বুকের ভিতরেও কেমন এক ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেছে।

তারক হালদার মোলায়েম হেসে বললেন, 'তবে ভয়ের কিছু নেই, মিস্টার দত্ত। আমার কাছে যত ক্লায়েন্ট আসে তাদের ফর্টি পার্সেন্টের ক্ষেত্রে কোনও স্টেপ আমাকে নিতে হয় না। আর তিন-তিনবার অবাধ্য হয় এরকম ক্লায়েন্টের সংখ্যা মাত্র টেন পার্সেন্ট। এতে আপনার ভরসা পাওয়া উচিত।'

ভরসা দূরের কথা, একটা ঠান্ডা ভয় আমাকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরছিল।

'যদি পাঁচবারের বার আপনি একই ভুল করেন, তা হলে...।'

'কী বলতে চান আপনি?'

হালদার নিষ্পাপ হাসলেন : 'আপনাকে আর মিসেস দত্তকে শক দেওয়া হবে। তাপসকে আবার পালিশ দেওয়া হবে, আর মিসেস দত্তকে একটু-আধটু রগড়ে দেওয়া হবে—।'

আমি ধৈর্য হারিয়ে ক্ষিপ্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম ডক্টর হালদারের ওপরে। ওঁর জামাটা খামচে ধরে অশ্রাব্য গালিগালাজ দিতে লাগলাম। কিন্তু ডক্টর হালদার চোখের পলকে একটু সরে গিয়ে হাঁটু চালিয়ে দিলেন আমার তলপেটে। বাঁহাতে আমার চুলের মুঠি ধরে টান মেরে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন একপাশে। তারপর ডানহাতের শক্ত আঙুলে আমার টুঁটি টিপে ধরে সজোরে এক ধাক্কা মারলেন। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম মেঝেতে। আহত জন্তুর মতো হাঁফাতে লাগলাম।

'শান্ত হয়ে বসুন, মিস্টার দত্ত। আপনাকে তো বলেছিলাম, আমরা চণ্ডীপাঠ দিয়ে শুরু করি...আর জুতো সেলাই দিয়ে শেষ করি।'

হাত ধরে আমাকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন তারক হালদার। তাঁর ভাবখানা এমন, যেন কিছুই হয়নি।

'আসুন, এবার ভদ্রলোকের মতো কথাবার্তাগুলো শেষ করে নেওয়া যাক।'

আমি বড়-বড় শ্বাস নিতে-নিতে ভাবছিলাম, এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন কখন শেষ হবে।

'মুক্তি'-র চিকিৎসা-পদ্ধতিতে শাস্তির ধাপ রয়েছে দশটি। ছ'নম্বর, সাত নম্বর আর আট নম্বর ধাপ হল ইলেকট্রিক শক আর পালিশ। তবে শকের ভোল্টেজের মাত্রা যেমন বাড়বে তেমনই বাড়বে পালিশের তেজ। সেইসঙ্গে মিসেস দত্তকে শ্লীলতাহানি থেকে

শুরু করে ধর্ষণের ভয় পর্যন্ত দেখানো হবে। ন' নম্বর ধাপ হল তাপসের যে-কোনও একটা হাত ভেঙে দেওয়া।

'আর দশ নম্বর?' আমার গলার ভিতরে ধুনি জ্বলছে। টের পাচ্ছি, ঘাম গড়িয়ে পড়ছে কপাল বেয়ে। শীততাপনিয়ন্ত্রণ গোল্লায় গেছে।

তারক হালদার হতাশভাবে মাথা নেড়ে বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে।

'তখন আমরা হাল ছেড়ে দিই, মিস্টার দত্ত। মাত্র টু পার্সেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার ট্রিটমেন্ট ফেইল করে। আপনি তখন সেই টু পার্সেন্টের দলে পড়বেন—।'

'সত্যি আপনি হাল ছেড়ে দেন?'

'বলতে গেলে একরকম তাই।' কথা বলতে-বলতে ডক্টর হালদার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা সাইলেন্সার লাগানো কোল্ট অটোমেটিক পিস্তল বের করে টেবিলে রাখলেন : 'তবে সেই অবাধ্য দু-পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট জীবনে আর কখনও সিগারেট খায় না। আমার আগমার্কা গ্যারান্টি—'

রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে টিভিতে 'দ্য ওয়ার্ল্ড দিস উইক' দেখছিলাম। মৌসুমী থালায় ভাত-তরকারি সাজিয়ে দিচ্ছিল আর মাঝে-মাঝে টিভির দিকে তাকাচ্ছিল। তাপস আগেই খেয়েদেয়ে পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিলাম, আর অন্যমনস্ক হয়ে বারবার দাঁত দিয়ে নখ কাটছিলাম।

খাওয়া শুরু করেই মৌসুমী জিগ্যেস করল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো! সেই তখন থেকে কেমন করছ!'

আমি খেতে-খেতেই গম্ভীরভাবে বললাম, 'না, কিছু না। মানে...আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

এরকম ঘোষণা মৌসুমী আগে অনেক শুনেছে। তাই খাওয়া থামিয়ে ও হাসল। হাসলে ওর ডান গালে টোল পড়ে। দারুণ দেখায়। ওকে প্রায়ই বলি, 'তোমার ওই টোলে পড়ে আমার আইবুড়ো জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে গেল।' এখন বলতে ইচ্ছে করল না।

ওর চোখে তাকিয়ে সিরিয়াসভাবে বললাম, 'সত্যি ছেড়ে দিয়েছি।'

ও হেসে বলল, 'কখন ছেড়েছ? পাঁচমিনিট আগে?' আবার খেতে শুরু করল।

'না, বিকেল তিনটে থেকে।'

'তখন থেকে একটাও সিগারেট খাওনি!' মৌসুমীর খাওয়া একেবারে থেমে গেছে।

'না।' আমি কখন আবার যেন দাঁত দিয়ে নখ কাটতে শুরু করেছি।

'এরকম একটা দারুণ খবর—কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না। কিন্তু হঠাৎ ছাড়তে গেলে কেন?'

'তোমার জন্যে...আর, তাপসের জন্যে...।'

মৌসুমী এবার চোখ বড় করে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর একটু দূরে একটা খাটো টেবিলে রাখা অ্যাশট্রের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'হঠাৎ এই সুবুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে জানি না, তবে এই প্রতিজ্ঞা টিকলে হয়।'

এই প্রতিজ্ঞা টিকবে, মৌসুমী। না-টিকলে তোমাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে-দিয়ে ওরা নীল করে দেবে। তোমার গালের ওই টোল সমান করে দেবে ক্ষুর দিয়ে। তাপসকে ওরা চুরমার করে দেবে। আমাদের জীবন একেবারে বদলে দেবে।

মুখে বললাম, 'এবার আমাকে পারতেই হবে।'

মৌসুমী খেতে শুরু করল আবার : 'পারলে তো ভালোই। পয়সা বাঁচবে। তা ছাড়া তোমার সিগারেটের ওই উৎকট ধোঁয়া আমার একটুও ভালো লাগে না।'

ডক্টর হালদারের ভাবলেশহীন মুখটা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। তলপেটটা এখনও ব্যথা করছে। আতঙ্ক জমাট বেঁধেছে শরীরের ভেতরে কোথাও। দরকার পড়লে ওই মানুষটা যে নির্মম হতে পারে তার প্রমাণ পেয়েছি আমি। আমার সঙ্গে বন্দি খরগোশটার কোনও তফাত নেই।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু চোখে ঘুম এল না।

মৌসুমী তাপসের সঙ্গে পাশের ঘরে শুতে চলে গেছে। যাওয়ার আগে আমার বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে কপালে হাত বুলিয়ে আদর করে গেছে। আর নিচু গলায় বলেছে, 'ইচ্ছে করলে সিগারেট খেয়ো। আমি রাগ করব না।' রাগ না-করলে মৌসুমীর কোনও তুলনা নেই।

আমি উত্তর না-দিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরেছি। অকূল সাগরে মৌসুমী আর তাপসই আমার খড়কুটো।

ওর হাতে আলতো করে চুমু খাওয়ার পর ও চলে গেল। দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাতে শোওয়ার আগে একটা সিগারেট আমার বড় প্রিয় ছিল। বিছানার পাশেই তাকে রয়েছে সিগারেট আর লাইটার। অন্ধকারে ওগুলো ব্যবহার করছি সাতবছর ধরে। চোখে না-দেখতে পেলেও ওদের স্থানাঙ্ক আমার ভুল হয় না। যদি হাত বাড়াই তা হলে এখনও ভুল হবে না। প্যাকেটে এখনও চারটে সিগারেট আছে আমি জানি। কিন্তু...। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিলাম একবার। তাকালাম মাথার কাছের জানলার দিকে। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। কেউ কি এখনও লক্ষ রাখছে আমার ওপরে?

তারক হালদারের কথাগুলো মনে পড়ছিল। প্রথম মাসে চব্বিশ ঘণ্টা আমার ওপরে নজর রাখা হবে। পরের দু-মাসে আমি নজরবন্দি থাকব দিনে আঠেরো ঘণ্টা করে। কিন্তু কোন আঠেরো ঘণ্টা সেটা বুঝতে পারব না। চতুর্থ মাসটাই পেশেন্টের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক। তখন তাদের মনটা আঁকুপাঁকু করে একটা সিগারেটের জন্যে। সেই কারণেই তারক হালদার তখন আবার চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারির ব্যবস্থা করেন—

পেশেন্টদের স্বার্থে। তারপর আটমাস ধরে দিনে বারো ঘণ্টা করে। একটানা বারো ঘণ্টা নয়, এলোমেলো বারো ঘণ্টা। তারপর?

তারপর সারা জীবন ধরে চলবে এই নজরদারি। তারক হালদারের খেয়ালখুশি মতো।

সারাটা জীবন আমাকে 'মুক্তি'-র বন্দি হয়ে থাকতে হবে।

ডক্টর হালদারের ভয়ঙ্কর হাসিটা মনে পড়ল।

'সবসময়েই আপনাকে আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হবে, মিস্টার দত্ত। কেউ কি এই মুহূর্তে লুকিয়ে লক্ষ করছে আমাকে? দু-বছর পর হয়তো একদিন-বাদে-একদিন নজর রাখব আপনার ওপরে। কিংবা টানা একসপ্তাহ, বা মাসে দশদিন। আপনি কিচ্ছু টের পাবেন না। যদি কখনও লুকিয়ে সিগারেট টান দেন, তা হলে সে-রিস্ক আপনার। যদি সাধ করে সাপ নিয়ে খেলতে চান খেলবেন। কিন্তু আপনার মনে ভয় থাকবে : কেউ কি জানতে পেরেছে? তাপসকে কেউ কিডন্যাপ করেনি তো? আমার বউকে কেউ তুলে নিয়ে যায়নি তো? কী চমৎকার কায়দা বলুন তো, মিস্টার দত্ত! এই অবস্থায় যদি আপনি সিগারেটে লুকিয়ে একটি টানও দেন, তা হলে দেখবেন কী বিচ্ছিরি তার টেস্ট। মনে হবে, আপনি যেন বউ আর ছেলের রক্ত চুষে খাচ্ছেন।'

কিন্তু এখন, এই নিঝুম রাতে, কেউ কি সত্যিই নজর রেখেছে? মনে হয় না। তাছাড়া জানলা দিয়ে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তারক হালদার বলেছিলেন, 'নজরদারির কাজ যারা করবে তাদের দু-একজনকে হয়তো আপনি চিনে ফেলবেন, কিন্তু সবাইকে চিনতে পারবেন না...।'

নিকুচি করেছে তারক হালদারের! উচ্ছন্নে যাক 'মুক্তি' আর ওই সিড়িঙ্গে বুড়ো মহেন্দ্রনাথ হালদার!

আমার অবাধ্য হাত অন্ধকারে পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। অন্ধকারে আগুন জ্বলে উঠল। উপোসী ঠোঁট যেন একযুগ পর সিগারেটের স্বাদ পেল। আঃ—!

কীসের একটা শব্দ হল না? কোনদিক থেকে এল শব্দটা? বুকের ভেতরে আচমকা একটা ঢিপঢিপ শব্দ শুরু হয়ে গেল। সিগারেট ধরা হাতটা কাঁপতে লাগল অবাধ্য হয়ে। সিগারেটের ধোঁয়া ফুসফুসের ভিতরে জট পাকিয়ে কাশি পেল। দম আটকে যেতে চাইল কাশির দমকে। তাড়াতাড়ি সিগারেটটা নিভিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম জানলা দিয়ে। আবছা অন্ধকারে হাত নেড়ে ধোঁয়ার রেখা সাফ করে দিতে চাইলাম। হে ভগবান, কেউ যেন দেখতে না-পায় আমার এই অবাধ্য আচরণ! মৌসুমী...তাপস...সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

শত চেষ্টাতেও ঘুম আসতে চাইল না চোখে। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে শুয়ে রইলাম অন্ধকারে। শুনতে লাগলাম আমার ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি।

সকালে চায়ের কাপ, খবরের কাগজ, শীতের বারান্দা—অথচ সিগারেট নেই! প্রাত্যহিক কাজে টয়লেটে বন্দি, অথচ সিগারেট নেই! অফিসের ইয়ার এন্ডিং-এর বাড়তি কাজ বাড়িতে বয়ে নিয়ে এসে রাত জেগে ফাইল ওলটানো, অথচ সিগারেট নেই! রাতের খাওয়া সেরে খোলা বারান্দায় 'ওয়াক এ মাইল' অথচ সিগারেট নেই!

শেষ পর্যন্ত আমি বাঁচব তো!

কী করে যে এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম! স্রেফ অনুপমের জন্যে! ও তো স-ব জানত! তবু কেন আমাকে এই ভয়ঙ্কর ফাঁদে ফাঁসাল? ওকে একবার হাতের কাছে পাই!

আবার কানে এল শব্দটা। দরজার কাছ থেকে কি শব্দটা ভেসে এল?

উঠে দরজার কাছে গিয়ে শুনব ভালো করে?

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। অন্ধকারে পা টিপে-টিপে গেলাম দরজার কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরজা খোলার সাহস পেলাম না।

পায়ে-পায়ে আবার বিছানায় ফিরে এলাম। এই অসহায় মুহূর্তে আমার মন ভীষণভাবে মৌসুমীকে পাশে চাইছিল। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে সময় কাটতে লাগল আমার।

ভোরবেলার দিকে বোধহয় সামান্য তন্দ্রা এসে থাকবে, কারণ মৌসুমীর ডাকে ঘুম ভাঙল। চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে ও বলল, 'এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছ, অফিসে যে দেরি হয়ে যাবে।'

জানলা দিয়ে চোখে রোদ এসে পড়েছিল। বিছানায় উঠে বসলাম। চোখ জ্বালা করছে। মাথা দপদপ করছে। জিভে তেতো স্বাদ।

তড়িঘড়ি চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে জিভে ছ্যাঁকা লেগে গেল।

মৌসুমী চোখ মটকে বলল, 'এখনও তুমি সিগারেট-অনশন চালিয়ে যাচ্ছ, না কি একটা-আধটা টেনেছ?'

আমি জড়ানো গলায় জবাব দিলাম, 'না, খাইনি।'

কাল রাতের ওই একটা-দুটো টানকে কি আর খাওয়া বলে!

'দেখবে, অফিসে গিয়েই তোমার প্রতিজ্ঞা পিঠটান দেবে—।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম,' কী হচ্ছে, মউ! আমি কোথায় সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাতে হেল্প না-করে তুমি উলটে...।'

'আচ্ছা বাবা, ভুল হয়েছে, সরি—।'

আমি বাঁ-হাতটা মৌসুমীর কাঁধে রাখলাম। ওর ঘাড়ের কাছে আলতো করে আঙুল চালালাম। এ যে কী মারাত্মক প্রতিজ্ঞা সেটা তোমাকে কেমন করে বোঝাই বলো তো, মউ! এ যে আমার ভীষণ গোপন কথা।

বাথরুমের দরজায় আওয়াজ হল।

'যাই, তাপস বোধহয় স্নান করে বেরিয়েছে—' মৌসুমী সরে গেল আমার কাছ থেকে। তাপসকে ও ভীষণ ভালোবাসে—হয়তো আমার চেয়েও বেশি। কিন্তু আমি যে ওদের দুজনকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ওরা যদি জানত, আমার সমস্ত প্রতিজ্ঞা শুধু ওদেরই জন্যে!

অফিস থেকে বাড়িতে ফিরেই একটা ধাক্কা খেলাম।

কলিংবেল বাজাতে দরজা খুলল শান্তির মা। কিন্তু মৌসুমী বাড়িতে থাকলে ও-ই দরজা খোলে। আমার বেল বাজানোর ঢং ওর খুব চেনা। এসময়ে ও কোথায় বেরোল?

তাপস চার্টার্ড বাসে করে স্কুলে যায়-আসে। যাওয়ার সময় মৌসুমী ওকে নিয়ে যায় অরবিন্দ সেতুর মুখে, বাসে তুলে দেয়। আর ছুটির সময় তাপসকে বাস থেকে নামতে হয় ওই একই জায়গায়। সেখান থেকে ওকে নিয়ে আসে আমাদের কাজের লোক শান্তির মা। তাপসকে নিয়ে বাড়ি ফিরে ও বউদিদিমণিকে পায়নি। কলিংবেলের শব্দে কেউ সাড়া দেয়নি। তখন পাশের ফ্ল্যাট থেকে ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে শান্তির মা আমাদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলে। এমার্জেন্সি অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যে আমাদের ফ্ল্যাটের একটা বাড়তি চাবি পাশের ফ্ল্যাটে রাখা থাকে। শান্তির মা সেটা জানে।

শান্তির মায়ের কথা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাপস সরল নিষ্পাপ মুখে আমার দিকে তাকিয়ে। ওর স্কুল থেকে ফেরার সময়ে মৌসুমী কখনও ফ্ল্যাট ছেড়ে যায় না। হঠাৎ গেলেও খবর রেখে যায়। পাশের ফ্ল্যাটের রবীনবাবুকে সে-ব্যাপারে জিগ্যেস করতে যাব ভাবছি, এমনসময় টেলিফোন বেজে উঠল।

কে ফোন করছে? কোনও হসপিটাল থেকে? না কি পুলিশ?

'দাদাবাবু, একটু আগে কে একজন আপনাকে ফোন করেছিল...।'

শান্তির মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি ছুটে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে চেপে ধরেছি।

'হ্যালো—।'

'রাজীব দত্ত?' একজন পুরুষের গলা।

'কথা বলছি।' অকারণেই আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেল।

'সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।'

এইবার গলাটা চিনতে পারলাম। ডক্টর তারক হালদার।

কিন্তু আমি কিছু বলে ওঠার আগেই তিনি বললেন, 'দত্তবাবু, আপনি সাতটা নাগাদ আমার চেম্বারে একবার আসতে পারবেন? একটু দরকার ছিল।'

'মৌসুমী...আমার স্ত্রী কোথায়?'

'কোথায় আবার, আমার কাছে।' হালদার চিবিয়ে-চিবিয়ে হাসলেন।

আমার চোখের সামনে হাজার-হাজার সরষে ফুল নাচছিল আর একটা সাদা-কালো খরগোশ লাফাচ্ছিল পাগলের মতো। কাল রাতে আমি সিগারেটে দুটো টান দিয়েছি।

'ডক্টর হালদার, প্লিজ, ওকে কিছু করবেন না...ছেড়ে দিন। কাল রাতে...আমি মাত্র দুটো টান দিয়েছি...শরীরটা কেমন খারাপ লাগছিল...প্লিজ, ওকে ছেড়ে দিন!'

আমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। আরও অনেক কিছু বলতে চাইছিলাম, কিন্তু—।

'সাতটায় আমাদের দেখা হচ্ছে।' তারক হালদার নির্লিপ্ত গলায় বললেন। তারপরেই টেলিফোনের লাইন কেটে গেল।

ঠিক সাতটায় গিয়ে হাজির হলাম 'মুক্তি'-র রিসেপশানে।

ফাঁকা ঘরে বসে রিসেপশনিস্ট মেয়েটি কম্পিউটারের বোতাম টিপছিল। আমাকে দেখে একচিলতে হেসে টেলিফোন তুলে নিল। আমার উদভ্রান্ত অবস্থাকে কোনও আমল দিল না।

'ডক্টর হালদার, মিস্টার রাজীব দত্ত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'যান, ভিতরে যান।'

করিডর ধরে হেঁটে এগিয়ে চলেছি, প্রতাপ কোথা থেকে এসে হাজির হল আমার পাশে। একটু হাসল। ওর হাতে একটা রিভলবার।

ডক্টর হালদারের ঘরে ঢুকতেই উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে : 'আসুন, মিস্টার দত্ত। এ কী চেহারা হয়েছে আপনার!'

আমি তারক হালদারের কাছে এগিয়ে গেলাম, বললাম, 'ডক্টর হালদার, প্লিজ, এবারের মতো ছেড়ে দিন। আমি...আমি যা টাকা লাগে দেব...।'

'অবুঝ হবেন না, মিস্টার দত্ত। ক্যান্সার আমার বাবাকে ছেড়ে দেয়নি। আসুন, এই জানলার কাছে আসুন। আমি কথা দিচ্ছি, মিসেস দত্তর তেমন একটা লাগবে না—অন্তত এই প্রথমবার।'

আমি রাগে কাঁপতে লাগলাম। এই সাংঘাতিক লোকটাকে তুলোধোনা করতে পারলে তবে আমার মন শান্ত হবে।

ডক্টর হালদার পেছনের দেওয়ালের ছোট জানলার কাছে গিয়ে পরদা সরিয়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বোধহয় আমার মনের অবস্থা আঁচ করতে পারলেন। তাই ঠান্ডা গলায় বললেন, 'উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই, দত্তবাবু। প্রতাপ আপনার উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করবে। না, গুলি করবে না। বাজে খরচ আমি অপছন্দ করি। ও রিভলবারের বাঁট দিয়ে আপনার মাথায় একটু ইয়ে করবে। আর মিসেস দত্তকে আমার ক্লিনিকের নিয়মমাফিক শক দেওয়া হবে। সুতরাং আপনার ওসব ছেলেমানুষি উত্তেজনা দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। আসুন, এদিকে আসুন।'

আমি আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে গেলাম জানলাটার কাছে। পেছন থেকে প্রতাপ একবার আমাকে রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিল।

শয়তান ডাক্তারটা বউকে এখন ইলেকট্রিক শক দেবে, আর আমাকে সেটা দেখতে হবে।

'বাস্টার্ড!' বলতে চাইনি, কিন্তু কীভাবে যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল শব্দটা।

তারক হালদার আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলেন : 'মিস্টার দত্ত, এ-পর্যন্ত যত গালাগাল আমি খেয়েছি, গালাগালপিছু প্রত্যেকে যদি একটা করে টাকা আমার হাতে দিত তা হলে এতদিনে আমি টাটা-বিড়লা হয়ে যেতাম। তা ছাড়া, যারা সমাজের জন্যে, দেশের জন্যে, ভালো কাজ করতে চায় তাদের কপালে চিরকাল গালাগালই জোটে। আসুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে—।'

জানলা দিয়ে মৌসুমীকে দেখতে পেলাম।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও হতবাক হয়ে এদিক-ওদিক দেখছে। ওর ডানহাতের

কবজিতে একটা সরু তার জড়ানো।

'মউ! মউ!' আমি বিপন্ন গলায় চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে।

ডক্টর হালদার আমার পিঠে হাত রাখলেন : 'ডেকে লাভ নেই। ও-ঘর থেকে কিছু শোনা যায় না, কিছু দেখা যায় না।' কাচের জানলাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এটা সাধারণ কাচ নয়, ওয়ান ওয়ে মিরার। ও-ঘর থেকে এটাকে আয়না বলে ভুল হয়। যাকগে, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিই। আপনার প্রথমবারের ছোটখাটো ভুল— পনেরো সেকেন্ডের বেশি দেওয়াটা ঠিক হবে না। প্রতাপ—।'

প্রতাপ হাতের রিভলবারটা আমার শিরদাঁড়ায় চেপে ধরল। আর ডক্টর হালদার লাল বোতামটা টিপে ধরলেন।

আমার জীবনের দীর্ঘতম পনেরো সেকেন্ড শেষ হল একসময়। মাথা ঝিমঝিম করছে, পা দুটো যেন রবারের, চোখের নজর ঝাপসা।

ডক্টর হালদার আমার পিঠে মোলায়েমভাবে হাত রেখে বললেন, 'গা গুলোচ্ছে? বমি পাচ্ছে?'

আমি কোনওরকমে মাথা নেড়ে 'না' বললাম।

তারক হালদার জানলার পরদা টেনে দিলেন। আমার হাত ধরে বললেন, 'আসুন—।'

'কোথায়?' কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে আমার।

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন আসুন।'

কী করে মৌসুমীকে মুখ দেখাব আমি? ওকে আমি ভালোবাসি! এই আমার ভালোবাসার নমুনা!

প্রতাপ আগেই কখন যেন ঘর ছেড়ে চলে গেছে। আমি আচ্ছন্নের মতো ডক্টর হালদারকে অনুসরণ করলাম।

করিডর দিয়ে কিছুটা পথ চলার পর ডক্টর হালদার একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'যান, ভেতরে যান। কোনও চিন্তা নেই, উনি আপনাকে ভুল বুঝবেন না।'

আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে উনি চলে গেলেন। ধবধবে সাদা দেওয়ালে ঘেরা ঘরটায় শুধু একটা লম্বা সোফা রয়েছে। মৌসুমী সোফায় বসে মুখ নিচু করে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'মউ!'

ও চমকে তাকাল আমার দিকে। সোফা থেকে প্রায় ছুটে এসে জাপটে ধরল আমাকে। বুকে মুখ গুঁজে ডুকরে উঠল, 'রাজীব! রাজীব!'

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। কপালে, মাথায় চুমু খেলাম বারবার।

মৌসুমী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে যা বলল তার সারমর্ম হল এই : দুপুর দুটো নাগাদ অচেনা তিনটে লোক হঠাৎই ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে; ও ভেবেছিল ওরা বোধহয় ডাকাত, বা অন্য

কোনও বদ মতলবে ঢুকেছে; কিন্তু লোকগুলো মৌসুমীর নাকে ভেজা তুলো চেপে ধরে; সেই অবস্থাতেই ওকে চাদরে মুড়ে তুলে নেয়; তারপর ওর আর কিছু মনে নেই; পরে জ্ঞান ফিরলে দ্যাখে একটা ছোট ঘরে ও বন্দি; তারপর...তারপর,...।

'রাজীব, এই লোকগুলো কেন আমাকে এরকম টরচার করল বলো তো—?'

'আর বলতে হবে না, মউ, থাক।' আমি দু-হাতে আঁজলা করে মৌসুমীর মুখটা তুলে ধরলাম। ধরা গলায় বললাম, 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলার আছে, মউ। এই মুহূর্তে সব খুলে না-বলতে পারলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। এসো, বসো এখানে—'

ওকে সব কথা বলার পর আমি মাথা হেঁট করে বসে রইলাম। বিড়বিড় করে বললাম, 'ছি ছি! তোমার চোখে কত ছোট হয়ে গেলাম আমি...।'

মৌসুমী আমার থুতনিতে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরল ওর দিকে। গাঢ় স্বরে বলল, 'রাজু, তোমাকে আমি এখনও আগের মতোই ভালোবাসি।'

'সত্যি!' আমার চোখে জল এসে গেল।

'হ্যাঁ, সত্যি। ডক্টর হালদার তোমার ভালোর জন্যেই সব করছেন। সিগারেট খাওয়া তুমি একেবারে ছেড়ে দাও।'

এখন তো আর না-ছেড়ে উপায় নেই। আমি অবাক চোখে মৌসুমীকে দেখছিলাম। গালে টোল পড়া মেয়েটা হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে টপ করে গালে একটা চুমু খেল। বলল, চলো, 'বাড়ি চলো। তাপস অনেকক্ষণ ধরে একা আছে...।'

দু-সপ্তাহ পর একদিন রাতে টেলিফোন বেজে উঠল।

ফোন ধরতেই ডক্টর হালদারের গলা চিনতে পারলাম। একটা দলাপাকানো ভয় উঠে এল গলার কাছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'ডক্টর হালদার, আপনি ভুল করছেন। আমি একটিবারের জন্যেও সিগারেট ঠোঁটে ছোঁয়াইনি—বিশ্বাস করুন—।'

'না, সে আমি জানি। একটা কাজের ব্যাপারে ফোন করছি। কাল বিকেল পাঁচটায় আমার চেম্বারে একবার আসতে পারবেন? একটু কথা আছে।'

'সেটা কি...?'

'না, না, সিরিয়াস কিছু নয়। আসুন, একটু আলোচনা করব। ও হ্যাঁ, তাপসের পরীক্ষার রেজাল্ট তো খুব ভালো হয়েছে! তাপসকে কনগ্রাচুলেশান জানাবেন। কাল ওর জন্যে একটা চকোলেটের বাক্স পাঠিয়ে দেব।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'জানতে হয়, মিস্টার দত্ত। জানাটা আমার ট্রিটমেন্টের একটা ভাইটাল পার্ট।'

তারক হালদার ফোন কেটে দিলেন।

সেই মুহূর্ত থেকেই আমি পরদিন বিকেল পাঁচটার অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পরদিন পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিটে তারক হালদারের মুখোমুখি যখন হাজির হলাম তখন বুঝলাম, অকারণেই আমি ভয় পেয়েছি।

হালদার আমার মুখের চেহারা লক্ষ করে হেসে বললেন,'কী ব্যাপার? মুখটা এরকম করে রেখেছেন কেন? ভয় নেই, কেউ আপনাকে শক দেবে না। আসুন, এটার ওপরে উঠে দাঁড়ান।'

ওজন করার একটা যন্ত্র।

'সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার পর আমার ওজন বোধহয় একটু বেড়ে গেছে—।'

'সেটাই স্বাভাবিক। আমার ক্লায়েন্টদের প্রায় সিক্সটি সেভেন পার্সেন্টের এরকম সিম্‌টম দেখা গেছে। আসুন, উঠুন এটার ওপরে—।'

যন্ত্রের প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়ালাম। আটষট্টি কেজি।

'আচ্ছা, নেমে আসুন।' বলে অ্যাপ্রনের পকেট থেকে একটি ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকের কার্ড বের করে তারক হালদার কী যেন দেখতে লাগলেন।

'আপনার হাইট কত, মিস্টার দত্ত?'

'পাঁচ-পাঁচ।'

'তা হলে আপনার ওজন হওয়া উচিত তেষট্টি কেজি। কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, এগুলো ঠিকমতো খাবেন। আর বডি ওয়েটের দিকে খেয়াল রাখবেন। আজ এপ্রিল মাসের তিন তারিখ। আপনি প্রতিমাসের ঠিক তিন তারিখে আমার কাছে ওজন নিতে আসবেন। যদি কখনও না-আসতে পারেন তা হলে আগে ফোন করে অবশ্যই খবর দেবেন। যেন কোনওরকম ভুল না-হয়।'

'যদি আমার ওয়েট তেষট্টি কেজির বেশি হয়ে যায়?'

তারক হালদার হাসলেন, বললেন, 'ওজন বেড়ে যাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। যদি আপনার ওজন তেষট্টির বেশি হয়ে যায় তা হলে আমার লোক আপনার বাড়িতে যাবে। চপার দিয়ে আপনার বউয়ের একটা করে আঙুল কেটে নেবে। ঠিক আছে, তা হলে সামনের মাসের তিন তারিখে আমাদের দেখা হচ্ছে, মিস্টার দত্ত—।'

এরপর তিনমাসের মধ্যে আমার মেদ আর বয়েস, দুটোই অনেকটা করে কমে গেল। জামা-প্যান্টগুলো সব ঢোলা-ঢোলা হয়ে গেল। তা নিয়ে মৌসুমী কম ঠাট্টা করল না। তাছাড়া একদিন রাস্তায় কেনাকাটায় বেরিয়ে ও বলল, 'তোমার পাশে এখন আমাকে বুড়ি-বুড়ি লাগে।'

আমি বললাম, 'তোমার কথার কোনও মাথামুণ্ডু নেই!' কিন্তু ভেতরে- ভেতরে ভালো লাগল।

আজকাল পাড়ায় আর অফিসে পরিচিত সকলেই বলে, আমার বয়েস নাকি বোঝা যায় না। ওরা এর রহস্য জানতে চায়। আমি বলি, 'সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি, তাই।'

'আমিও অনেকবার ছেড়ে দিয়েছি, ভাই। কিন্তু এমনই বদ অভ্যেস, আবার ঘুরে

এসেছে।'

একদিন রাতে তারক হালদারের ফোন পেলাম।

'মিস্টার দত্ত, কেমন আছেন?'

'ভালো—'

'কোনওরকম অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না, না।'

'আমার ক্লিনিকের জন্যে একটা ছোট্ট উপকার করতে হবে আপনাকে। কালই আমি আমার পঞ্চাশটা ভিজিটিং কার্ড আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আজ থেকে ঠিক এক বছরের মধ্যে অন্তত চারজন ক্লায়েন্ট আমি চাই। মনে হয় না, চারজন স্মোকারকে সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে কনভিন্স করাতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে। আপনার বন্ধু, মিস্টার অনুপম মুখার্জি, আপনাকে নিয়ে মোট ছ'জনকে পাঠিয়েছে। সুস্থ সমাজ তৈরির জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, মিস্টার দত্ত। এ-কাজে আপনারা সবাই যদি হেল্প না-করেন, তা হলে...।'

'চারজনকে আ-আমি পাঠাব।' এরই নাম হুইসপারিং ক্যাম্পেইন!

তারক হালদার হাসলেন : 'জানতাম আপনি রাজি হবেন। ও হ্যাঁ, আমাদের এগ্রিমেন্টের ওই পয়েন্টটা মনে আছে তো? মানে, ট্রিটমেন্টের কায়দা একদম টপ সিক্রেট?'

'হ্যাঁ, ভুলিনি।'

'থ্যাঙ্ক য়ু। আমরা কিন্তু নজরদারির কাজ চালিয়ে যাচ্ছি—' তারক হালদারের গলাটা হঠাৎই কেমন ঠান্ডা শোনাল। সঙ্গে-সঙ্গে খরগোশটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। ডক্টর হালদার ফোন রেখে দিলেন।

এর মাসদেড়েক পর একদিন বিকেলে নিউ মার্কেটে অনুপমের সঙ্গে দেখা হল আমার। ও একা নয়—সঙ্গে রোহিণীও ছিল।

অনুপমের বউকে আমি এই প্রথম দেখলাম। ফরসা, লম্বা, সুশ্রী। চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে। অনুপম আমার সঙ্গে ওর বউয়ের আলাপ করিয়ে দিয়ে মজা করে বউকে বলল, 'আমার দশবছরের হাওয়া-দোস্ত, বুঝলে! বলতে গেলে, শুধু এয়ারপোর্ট আর প্লেনেই ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়। কলেজ লাইফের পর এই প্রথম কলকাতার ডাঙায় দেখা হল, কী বলিস?' কথা শেষ করে আমার কাঁধ চাপড়ে দিল অনুপম। একটু থেমে আবার বলল, 'রাজীব, তোকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে। ডায়েটিং করে স্লিম হয়েছিস?'

'না রে, আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। ডক্টর তারক হালদার আমার জীবনটা একেবারে বদলে দিয়েছেন।' আমার বুকের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছটফট করছিল।

অনুপম আমার দিকে গভীর চোখে তাকাল। আমিও ওকে দেখলাম। এখন আমরা সত্যিকারের বন্ধু। পরস্পরের গোপন ব্যথা আমরা জানি।

ঠিক তখনই রোহিণীর বাঁহাতের কাটা কড়ে আঙুলটা আমার নজরে পড়ল।

গোলাপের জন্য গোলাপ

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিল সুনীল। না, কোথাও কোনও খুঁত নেই। ভালোবাসায় হাবুডুবু খাওয়া এক দিশাভ্রান্ত যুবক। আজ সকাল থেকেই ওর বুকের ভেতরে উনটোপানটা শব্দ হচ্ছে। কেমন একটা ভয়ও আঁকড়ে ধরেছে একইসঙ্গে। গোলাপ ওর কথা শুনবে তো!

এই তো সেদিন...সন্ধেবেলা...ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের হ্রদের কিনারে বসে গোলাপের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল।

ঝগড়ার সূত্রপাত খুবই সামান্য ব্যাপার থেকে।

গোলাপ বলছিল, নানারঙের পাখি পুষতে ওর ভীষণ ভালো লাগে। সেই কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে সুনীল বলেছিল, 'পাখির মাংস খেতে আমার খুব ভালো লাগে।'

এই কথায় চোখ কপালে তুলে গোলাপ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ছিল সুনীলের দিকে। তারপর চাপা গলায় নির্মম সুরে বলেছে, 'ছিঃ! তুমি পাগল না রাক্ষস!' এবং উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় আঁচল ঘুরিয়ে হনহন করে হাঁটা দিয়েছে। পড়ন্ত বিকেলের রোদ গোলাপের পিঠে মোলায়েম হাত রেখে ওকে পৌঁছে দিয়েছে বাগানের এলাকা ছাড়িয়ে পিচের রাস্তায়।

তার পর থেকে গোলাপ আর ফিরে আসেনি সুনীলের কাছে।

সুনীল কত চেষ্টা করেছে ওর সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু গোলাপ দেখা করেনি। সুনীল কতবার যে টেলিফোন করেছে ওর বাড়িতে! কিন্তু গোলাপ একটিবারের জন্যও 'বাড়ি ছিল না।'

সুনীল একা-একা বিছানায় মুখ গুঁজে কত দিন কত রাত চোখের জল ফেলেছে। তারপর ও ঠিক করেছে গোলাপকে রাস্তায় খুঁজবে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গোলাপের খুব প্রিয়। হয়তো কোনও একদিন সন্ধেবেলা ও চলে আসবে সেখানে। নয়তো উলটোদিকের নৃত্যরত ফোয়ারার রঙিন আলোর ছটায় হঠাৎই একদিন দেখা যাবে গোলাপকে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রয়েছে চঞ্চল জলধারার দিকে। সুন্দর সবসময়েই গোলাপকে টানে—চুম্বকের মতো টানে।

তাই প্রতি শনিবার সন্ধেবেলা সুনীল গোলাপকে খুঁজতে বেরোয়। গোলাপের পছন্দ মতো সেজেগুজে একগুচ্ছ গোলাপ হাতে নিয়ে ও ছায়া-নেমে-আসা রাস্তায় আকুল হয়ে খোঁজে অভিমানী মেয়েটাকে। একগুচ্ছ টাটকা গোলাপের সঙ্গে থাকে সুন্দর হাতের লেখায় আঁকা কয়েকটি লাইন। সাদা কার্ডের মোলায়েম আস্তরে নিখাদ ভালোবাসা দিয়ে সুনীল লিখেছে :

বন্ধুত্ব করব বলে শত্রুতা করেছিলাম,
ভাব করব বলেই আমি সেদিন আড়ি করেছিলাম,
নতুন করে বাঁচব বলে সেদিন আমি মরেছিলাম।

গোলাপের দেখা পেলেই সুনীল ওর পথ আগলে দাঁড়াবে। গোলাপফুলের গুচ্ছ আর কবিতার কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বলবে, 'গোলাপ, এই দ্যাখো, তোমার জন্যে গোলাপ ফুল নিয়ে এসেছি। আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না, লক্ষ্মীটি। এতদিন মরে ছিলাম...এখন আমাকে দয়া করে বাঁচিয়ে তোল। তুমি কি জানো, যাকে ভালোবাসি তাকে ভালোবাসতে না-পারলে কী কষ্ট!'

সুনীল জানে তারপর কী হবে।

গোলাপ টানা-টানা চোখ মেলে ধরবে সুনীলের করুণ মুখের ওপর। ওর চোখের কোণে অশ্রুর ফোঁটা চিকচিক করে উঠবে। গাছের ছায়ার আড়ালে সুনীলের বুকের ওপরে আছড়ে পড়বে গোলাপ। ওর বুকে মুখ ঘষতে-ঘষতে বলে উঠবে কান্না মেশানো গলায়, 'তুমি আমাকে ছেড়ে আর কখনও চলে যেয়ো না। যাবে না তো?'

প্রত্যেক শনিবার সুনীল যখন পরিপাটি সেজেগুজে তৈরি হয়ে রাস্তায় পা রাখে তখন ওর বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়তে থাকে। আজ নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যাবে গোলাপের সঙ্গে। গোলাপের অভিমান ভাঙবে তো! গোলাপ শুনবে তো সুনীলের কথা! তারপর...তারপর শুধুই রঙিন ফোয়ারার মতো জীবন, যে-জীবনে কান্না নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। বাতাসে ভর করে ভালোবাসার ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে দেবে ওরা দুজনে। চিরদিনের জন্য।

আজও ঠিক এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সুনীল। পকেটে হাত দিয়ে কবিতার কার্ডটা একবার অনুভব করল। তারপর একটা ফাঁকা ট্রামে চড়ে বসল।

ধর্মতলায় নেমে নিউ মার্কেট থেকে একগুচ্ছ লাল গোলাপ কিনল সুনীল। সোনালি রাংতা দিয়ে সেটাকে সুন্দর করে মুড়ে দিল ফুলের দোকানদার। তারপর সেলোফেন পেপারে মুড়ে গোলাপের তোড়াটা তুলে দিল নবীন যুবকের হাতে।

প্রৌঢ় দোকানি চশমার পুরু কাচের ভেতর দিয়ে ঘোলাটে চোখে দেখছিল সুনীলকে। ভালোবাসার বয়েসটাকে সবাই ভালোবাসে। কী সুন্দর চেহারা ছেলেটার! প্রাণবন্ত টগবগে যুবক। মনে হচ্ছে, ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে এক্ষুনি ছুট লাগাবে ওর ভালোবাসার মেয়ের কাছে। মেয়েটা যত দূরেই থাক, এই যুবকের কাছে সেটা মোটেই দূর নয়। গোটা পৃথিবী এখন ওর হাতের মুঠোয়।

দোকানদারকে ফুলের দাম মিটিয়ে দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে রাস্তায় নেমে এল সুনীল। কী অপরূপ সুন্দর এই গোলাপ ফুলগুলো! তবে গোলাপের চেয়ে বেশি সুন্দর নয় মোটেই। সুনীল ফুলের তোড়াটাকে নাকের কাছে নিয়ে এল। আলতো করে ঘ্রাণ নিতে চাইল তাজা গোলাপের। ওর মনে পড়ে গেল গোলাপের কথা। দুই

গোলাপ যখন মুখোমুখি হবে তখন কী দারুণ হবে! সময় থেমে যাবে আচমকা। পাখিরা গাছের পাতার ফাঁকে ঘুম ভেঙে সুরেলা শিস দিয়ে উঠবে। গাঢ় অন্ধকার ছায়া-ছায়া পথ চোখের পলকে ভেসে যাবে পড়ন্ত বিকেলের সোনালি রোদে। বারবার সূর্য উঁকি দেবে পুব আকাশে। সূর্যাস্ত বলে আর কিছু থাকবে না।

সন্ধে গাঢ় হয়েছে। রাস্তার এপাশে-ওপাশে বিদ্যুতের আলোর ঝিলিক। সার বেঁধে ধীরে-ধীরে গড়িয়ে চলেছে অসংখ্য গাড়ির চাকা। গাড়ির হেডলাইটের আলো, গাড়ির সারের ফাঁক-ফোকর দিয়ে চকিতে রাস্তা পার হয়ে যাওয়া ব্যস্ত পথচারী, নানা সুরের অধৈর্য হর্ন, আর অজস্র মানুষের ভিড়—সব মিলিয়ে এক গোলকধাঁধা। সুনীলের কেমন পাগল-পাগল লাগছিল। ও চটপট পা চালিয়ে লিন্ডসে স্ট্রিট পিছনে ফেলে পৌঁছে গেল চওড়া রাস্তায়। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথ ধরে পার্ক স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। এদিকটায় ভিড় অনেক কম। ও বেশ নিশ্চিন্তে গোলাপের কথা ভাবতে-ভাবতে এগিয়ে চলল। ওর কোনও তাড়া নেই। সন্ধে আরও ঘন হোক, আঁধার হোক। তখনই গোলাপকে খুঁজে পেতে সুবিধে হবে। সুনীলের ঠোঁটে তখনও গুনগুন গানের কলি : '...ভালোবাসা কারে কয়, সে কি কেবলই যাতনাময়...'।

বিড়লা তারামণ্ডলের কাছে পৌঁছে ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল সুনীল। ওকে অতিক্রম করে চলে যাওয়া প্রতিটি মেয়েকে খুঁটিয়ে নজর করে দেখল। না, গোলাপ নেই। তখন...কতক্ষণ পর কে জানে...ও হাঁটতে শুরু করল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে। বড়-বড় গাছপালায় সাজানো রাজপথ এখন আরও অন্ধকার, আরও রহস্যময়।

হঠাৎই দূর থেকে হেঁটে আসা একটি মেয়েকে দেখতে পেল সুনীল। মেয়েটি একা নয়। তার সঙ্গে একজন পুরুষ রয়েছে। হালকা শীতের বাতাস কেটে যেন ভেসে-ভেসে ওরা এগিয়ে আসছে। মেয়েটি গোলাপ নাকি? এরমধ্যেই সুনীলকে ভুলে গিয়ে অন্য পুরুষকে পছন্দ করে ফেলেছে! অসম্ভব! একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল সুনীল। আরও একটু কাছাকাছি এগিয়ে আসুক ওরা। তখন ভালো করে দেখা যাবে।

কিন্তু ওরা দুজনে আরও এগিয়ে আসতেই তৃতীয় একজন পুরুষকে দেখতে পেল সুনীল। লোকটার ভাবভঙ্গি এমন, যেন বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনকে অনুসরণ করছে সে।

কে ওই লোকটা? সুনীলের মতোই কেউ... যে তার নিজের গোলাপকে খুঁজছে! না কি...।

হঠাৎই ভয় পেল সুনীল। ওই লোকটা সেই লোকটা নয় তো!

গত তিন বছরে চারজন মানুষ খুন হয়ে গেছে এই এলাকায়। তিনজন তরুণী, একজন যুবক। অচেনা অজানা কোনও বিকৃত মনের নৃশংস মানুষ ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে খতম করেছে ওই চারজন হতভাগাকে। পুলিশ অনেক ফাঁদ পেতেও ধরতে পারেনি খুনিকে।

মনটা কু-ডাক ডেকে উঠল সুনীলের। গোলাপের কিছু হয়নি তো!

ঠিক তখনই সেই পুরুষ ও রমণী সুনীলের কাছে পৌঁছে গেল। অচেনা দুটো মুখ। নিজেদের কথাতেই ওরা বিভোর। সুনীলকে ওরা খেয়ালই করল না। সহজ ছন্দে পা ফেলে ওরা সুনীলকে পেরিয়ে গেল।

না, অনুসরণ করে আসা লোকটাকেও ওরা দেখতে পায়নি।

কিন্তু ওই লোকটা দেখতে পেল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সুনীলকে।

অনুসরণের কাজ বন্ধ রেখে সে চকিতে সরে এল গাছের গুঁড়ির দিকে—সুনীলের খুব কাছে।

লোকটার চেহারা পেটানো। অন্ধকারে মুখচোখ স্পষ্ট ঠাহর করা যাচ্ছে না। পরনে ফুলহাতা শার্ট, কালচে রঙের প্যান্ট। লোকটার বাঁ-হাতে নলের মতো পাকানো কিছু কাগজ—হয়তো খবরের কাগজ।

সুনীল ভয় পেয়ে হকচকিয়ে গেল।

লোকটা একটু রুক্ষ অথচ চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, এখানে একা-একা ঘুরঘুর করছেন কেন?'

'না...মানে...এমনই...মানে একজনের আসার কথা আছে...।'

সুনীলের নিষ্পাপ বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটার কেমন মায়া হল। আশ্চর্য! কত বয়েস হবে এই ছেলেটার? বাইশ, তেইশ...নয়তো বড়জোর চব্বিশ। এর মনে কি এতটুকু ভয়ডর নেই?

তখনই সুনীলের হাতে-ধরা ফুলের তোড়াটা দেখতে পেল সে। লোকটার ঠোঁটের কোনে একচিলতে হাসি খেলে গেল। ছেলেটার মুখ দেখেই বোঝা গিয়েছিল, বেচারা নবীন প্রেমিক। ফুলের তোড়াটা দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল। প্রেমে পড়লে ভয়ডর নির্ঘাত কমে যায়।

লোকটা পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ বের করে সুনীলের মুখের ওপরে আলো ফেলল। ভয়ে সুনীলের বুক কেঁপে উঠল।

'নাম কী? কোথায় থাকেন?' প্রশ্ন দুটো শেষ হওয়ামাত্রই আলো নিভে গেল।

সুনীলের গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু অনেক চেষ্টায় কোনওরকমে যা-হোক-কিছু উত্তর দিল ও।

সেটা শুনে লোকটা বলল, 'এখানে বেশিক্ষণ থাকবেন না। জায়গাটা ভালো নয়। কাগজে পড়েননি, এদিকটায় তিন-চারটে মার্ডার হয়ে গেছে।'

কথা বলার সময় আধো-আঁধারিতে লোকটার দাঁত দেখা গেল।

সুনীল ঠোঁটের ওপরে জিভ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি...আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। মানে...এই ফুলটা দিয়েই...।'

লোকটা হাসল, বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি। সেটা না-বুঝলে আপনাকে এক্ষুনি অ্যারেস্ট

করতাম। আমরা সন্ধের পর থেকে এই এলাকায় রেগুলার ওয়াচ রাখছি। যান, যান—জলদি কেটে পড়ুন।'

লোকটা আর দাঁড়াল না। জোর পায়ে হেঁটে চলে গেল বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের দিকে।

সুনীলের বুক ঠেলে স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ওঃ, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। ফুলের তোড়াটাই আজ বোধহয় ওকে বাঁচিয়ে দিল।

গোলাপ ফুলের তোড়াটার কথা মনে পড়তেই ওর মনে পড়ে গেল অন্য গোলাপের কথা। সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হয়ে পড়ল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে।

অন্ধকার পথে পা চালিয়ে যাওয়ার সময় সুনীলের বুকের ভেতরে এক অদ্ভুত বাজনা শুরু হয়ে গেল। গোলাপের খোঁজে যখনই ও এখানে আসে তখনই এই বাজনার শব্দ শুনতে পায়।

নির্জন শুনশান এলাকা পেরিয়ে সুনীল চলে এল আরও নির্জন এলাকায়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সদর দরজা, নাচনি-ফোয়ারা সব পিছনে ফেলে ও এগিয়ে এসেছে। রাস্তার ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের কমলা রঙের আলো। তারই কিছু অংশ শুয়ে আছে ফুটপাথে।

অনুসন্ধানী চোখে এদিক-ওদিক তাকাল সুনীল। কোথায় গোলাপ? ওই তো! আনন্দে চোখে জল এসে গেল সুনীলের। এতদিনে তা হলে অপেক্ষা শেষ হল!

রাস্তার ওপারে গাছের ছায়ার আড়ালে ধীরে-ধীরে হেঁটে যাচ্ছে মেয়েটি। কমলা রঙের আলো ওর সুঠাম শরীরে লুকোচুরি খেলছে।

চট করে রাস্তা পার হয়ে ওর কাছাকাছি চলে গেল সুনীল। একটা গাড়ি গর্জন তুলে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল রাস্তা দিয়ে। তারপর আবার সব চুপচাপ।

'গোলাপ!' সুনীল ভালোবাসার গলায় ডেকে উঠল।

গোলাপের কাঁপানো হর্স টেইল করা চুল। চুলের গোড়ায় রঙিন বো। এ ছাড়া পারফিউমের গন্ধও যেন ভেসে এল সুনীলের নাকে।

'গোলাপ, আমি এসেছি—।'

মেয়েটি ঘুরে তাকাল। পাউডারে-পাউডারে মুখ ফ্যাকাসে, ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিকের রং। নাকে নাকছাবি, কপালে কাচপোকা টিপ।

সুনীলের দিকে কটাক্ষ হেনে তাকিয়ে পেশাদারি গলায় ও বলল, 'পঞ্চাশ টাকা লাগবে। বারগেইনিং চলবে না।'

'গোলাপ!' গাঢ় স্বরে বলল সুনীল।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, 'গোলাপ বলে ডাকো আর জবা কি শেফালি বলে ডাকো—ওই পঞ্চাশ টাকাই লাগবে।'

সুনীলের বুকের ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। ও কার জন্য গোলাপ নিয়ে

এসেছে! এ তো গোলাপ নয়! এ তো একটা খারাপ মেয়ে! গোলাপ, গোলাপ তুমি কোথায়?

গোলাপের তোড়াটা হাত থেকে ফেলে দিল সুনীল। অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় দু-পা ফেলে পৌঁছে গেল মেয়েটির প্রায় গায়ের ওপরে। কড়া পারফিউমের গন্ধে সুনীলের গা গুলিয়ে উঠল। প্যান্টের পকেট থেকে চোখের পলকে ও একটা ছুরি বের করে নিল। বোতাম টিপতেই ঝকঝকে ফলাটা ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে এল সামনে।

মুহূর্তে মেয়েটির চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। চিৎকার করার জন্য বিশাল মাপের হাঁ করে ফেলল ও। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

এতবড় আস্পর্ধা! চিৎকার করতে চাইছে! একলহমায় সুনীলের ছুরি নিষ্ঠুরভাবে ছোবল মারল মেয়েটির গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল, কিন্তু সুনীল থামল না। আবার ছুরি চালাল, ছুরি চালাল, ছুরি চালাল...।

মেয়েটি লুটিয়ে পড়েছে ধুলোর ওপরে, তবে একফোঁটা চিৎকার করতে পারেনি। ও গোলাপ নয়, তাই ওর বেঁচে থাকার মানে হয় না। সুনীলের শুধু গোলাপকে চাই, আর কাউকে না, কাউকে না! তিনটি বছর ধরে ও একনাগাড়ে গোলাপকে খুঁজে চলেছে, কিন্তু পায়নি।

সুনীলের সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছিল। ছুরিটা ভাঁজ করে আবার পকেটে রেখে দিল ও। ওর জামাকাপড় রক্তে ভেসে গেছে। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি নেই। গাছের আড়ালে গিয়ে জামাকাপড় খুলে সেগুলো লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে সুনীল। তারপর শুধু অন্তর্বাস পরে ও চলে যাবে নিরাপদ জায়গায়। তবে যাওয়ার আগে গোলাপের তোড়াটা নিয়ে যেতে ও ভুলবে না। কারণ, পুলিশের জন্য কোনও সূত্রই ও রেখে যেতে চায় না।

ওকে যে এখনও অনেকবার গোলাপের খোঁজে আসতে হবে!

আমার স্ত্রীর আততায়ী

ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা দেখেই বুকটা যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। কোনও-কোনওদিন অফিস থেকে ফিরে দরজা যে সামান্য খোলা পাই না তা নয়। কিন্তু আজ এমনভাবে এমন ভঙ্গিতে দরজার পাল্লাদুটো খোলা রয়েছে যে, দেখামাত্রই একটা অশুভ ঘণ্টা বুকের ভেতরে ঢং-ঢং করে বাজতে শুরু করেছে। ঘুমন্ত মানুষ ও মৃতদেহের মধ্যে ঠিক এইরকম তফাতই বুঝি থাকে। অজান্তেই বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজতে শুরু করে।

চকিতে নজর চলে গেল হাতঘড়ির দিকে। সাড়ে সাতটা সবে পেরিয়েছে। রোজ এরকম সময়েই অফিস থেকে ফিরি। বন্ধ দরজায় ঠকঠক করলে কুসুম এসে দরজা খুলে দেয়। সকালে আমি অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে সারাটা দিন বলতে গেলে ও একাই থাকে। শুধু কাজলের মা এসে সকাল-বিকেল দু-বেলার ঠিকে কাজটুকু সেরে দিয়ে যায়। কুসুমকে সবসময় বলি দরজা বন্ধ করে সাবধানে থাকতে। দরজায় কেউ নক্ করলে হুট করে দরজা না-খুলতে। ওর সুবিধের জন্য দরজায় একটা 'ম্যাজিক আই' বসিয়ে দিয়েছি। যাতে দরজায় দাঁড়ানো মানুষটিকে ভেতর থেকেই ও দেখতে পায়। বুঝতে পারে সে চেনা কি অচেনা।

ফ্ল্যাটের দরজার আলোটা জ্বলছিল। পঁচিশ পাওয়ারের বাল্‌ব। এ-বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলোর বেশিরভাগেরই দরজায় কোনও আলো নেই। বাল্‌ব লাগানোর দরকার মনে করেনি ভাড়াটেরা। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ-খরচ বাঁচিয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী কুসুম একা থাকে। রাতে দরজায় কেউ নক্ করলে 'ম্যাজিক আই' দিয়ে নজর করে আগন্তুককে ওর দেখা দরকার। তাই আমি বিদ্যুৎ-খরচের কথা ভাবিনি।

খোলা দরজা পেরিয়ে সরু একচিলতে করিডর। ডানদিকে রান্নাঘর আর বাথরুম। দুটোই অন্ধকার। বাঁদিকে বসবার ঘর। সেখানে আলো রয়েছে। সামনে শোওয়ার ঘর। সেখানেও আলো জ্বলছে।

কুসুমের নাম ধরে মাঝারি গলায় বারদুয়েক ডাকলাম। কোনও সাড়া নেই। বুকের ধুকধুকুনি বাড়তে লাগল।

জুতোজোড়া করিডরে একপাশে চটপট খুলে রেখে বসবার ঘরে ঢুকলাম। আবার কুসুমের নাম ধরে ডাকলাম।

বসবার ঘর খালি। একজোড়া সোফা, টেবিল, বুককেস, ফুলদানি—সবই জায়গামতো পরিপাটি করে সাজানো। ঘরে কেউ নেই। এসেছিল বলেও মনে হয় না। কারণ সোফার গদিতে কোনও গভীর ছাপ নজরে পড়ল না।

উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় প্রথমে খেয়াল করিনি। কিন্তু এখন একধরনের থমথমে নীরবতার মধ্যে একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর কানে এল। ভেতরে শোওয়ার ঘরে কেউ যেন

কথা বলছে। কিন্তু সদর দরজা হাট করে রেখে শোওয়ার ঘরে বসে কুসুম কারও সঙ্গে কথা বলবে কি? বসবার ঘর থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলাম। প্রায় ছুটে শোওয়ার ঘরে গেলাম। পুরুষের কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল।

শোওয়ার ঘরে ঢুকেই একটা ভীষণ ধাক্কা খেলাম।

যে-লোকটির কথা বসবার ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম এখন তাকে দেখতে পেলাম। টিভি-র চৌকো ফ্রেমের মধ্যে সে অভিব্যক্তিহীন মুখে খবর পড়ছে। ঘরে কেউ নেই। গোটা ঘর লন্ডভন্ড। যেন একডজন কালবৈশাখী জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে হাড়ুডু খেলেছে।

প্রথমেই চোখে পড়ে বিছানা। কুসুম খুব গোছানো স্বভাবের মেয়ে। ঘর গোছানো ওর শখ। কিন্তু এখন, এইমুহূর্তে, বিছানার যে-হাল চোখে পড়ছে তা আর বলার নয়। বেডকভারটা কেউ খামচে টেনে এনেছে খাটের কিনারায়। কিছুটা অংশ শাড়ির আঁচলের মতো ঝুলছে। বম্বে ডাইং-এর সুন্দর চাদরটা ছিঁড়ে ফালাফালা। একটা বালিশ মেঝেতে। অন্য আর-একটা বিছানার মাঝখানে। ফেটে তুলো বেরিয়ে এসেছে। অন্য বালিশগুলোও এলোমেলো।

টিভি-তে পড়া খবরের একটা শব্দও আমার কানে ঢুকছিল না। বুকের ভেতরে বারবার বাজ পড়ছিল। চেষ্টা করে চোখের নজর পরিষ্কার রাখতে হচ্ছিল।

চট করে হাত বাড়িয়ে টিভি অফ করে দিলাম। নিস্তব্ধতার প্যারাশুট নিঃশব্দে ঘরে নেমে এল। আমি কুসুমের নাম ধরে নরম গলায় বারকয়েক ডাকলাম। দেখছি ঘর খালি, অথচ কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমি যদি তেমন করে ডাকতে পারি তা হলে কুসুম নিশ্চয়ই অলৌকিক কোনও উপায়ে কোথাও-না-কোথাও থেকে আমার সামনে এসে হাজির হবে।

আগোছালো ঘরের ছোট-বড় টুকিটাকি চিহ্নগুলো একে-একে নজরে পড়ছিল। ড্রেসিং-টেবিলের আয়না ভেঙে চৌচির। মাকড়সার জালের মতো ফাটল একটা বিন্দু থেকে জন্ম নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আয়নার পরিসীমার দিকে। ড্রেসিং-টেবিলে সাজিয়ে রাখা চিরুনি, পাউডার, লিপস্টিক, সিঁদুর—সবই এখন ছত্রখান। কুসুম সাজতে ভালোবাসতো, সাজাতে ভালোবাসতো। এখন কষ্ট করেও সেটা বোঝবার উপায় নেই।

মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে একটা পেতলের ফুলদানি, জল, থেঁতলানো রজনীগন্ধার স্টিক, কাচের চুড়ির টুকরো, ভাঙা শাঁখা, আর ছোট মাপের কয়েকটা কালচে ছোপ। রক্ত কি না জানি না। পরীক্ষা করে দেখতে ভয় করল।

আমার কান্না পাচ্ছিল। নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে এই ফ্ল্যাটের শোওয়ার ঘরে। ভাঙা গলায় কুসুমের নাম ধরে আবার ডাকলাম। কোনও সাড়া নেই।

এখন কী করব? চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব, না পুলিশে খবর দেব? সন্দেহ নেই, চোর, লুঠেরা অথবা ডাকাতের দল হানা দিয়েছিল ফ্ল্যাটে। কিন্তু তারপর তারা কী করেছে? কুসুমকে কিডন্যাপ করেছে, না কি...?

ভয়ঙ্কর কতকগুলো সম্ভাবনা মাথায় রঙিন বাল্বের মতো দপদপ করে উঠল। মাথায় হাত চেপে হতছাড়া মেঝেতে বসে পড়লাম। শরীরের ভেতর থেকে তৈরি হয়ে নির্লজ্জভাবে বেরিয়ে আসা থরথর কাঁপুনিকে চেষ্টা করেও বশে আনতে পারলাম না।

আর ঠিক তখনই একটা অস্পষ্ট চাপা গোঙানির শব্দ আমার কানে এল। আমাকে প্রচণ্ডভাবে চমকে দিল।

বেডকভারটা খাটের কিনারায় ঝুলে থাকায় খাটের তলাটা একরকম আড়ালই হয়ে গিয়েছিল। মনে হল যেন গোঙানির শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে খাটের কাছে এগিয়ে গেলাম। একটানে বেডকভারটাকে ফেলে দিলাম মেঝেতে। খাটের তলায় চোখ গেল। কুসুম—অথবা কুসুমের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম।

খাটের তলায় আধো অন্ধকার, তবে দেখতে কোনও অসুবিধে হল না। বিচিত্র ভঙ্গিতে দলা পাকিয়ে কুসুম পড়ে রয়েছে। জায়গার অভাবে একটা ট্রাঙ্ক আর একজোড়া সুটকেস খাটের নীচে থাকত। সেগুলো এখন ছিটকে গেছে দেওয়ালের গায়ে কোণের দিকে। সেই একটা সুটকেস অদ্ভুতভাবে খাঁকড়ে ধরে কুসুম কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে। গোঙাচ্ছে।

কুসুম। কুসুম! —অনেক কিছু মিশে ছিল এই ডাকের মধ্যে : উদ্বেগ, ভয়, স্বস্তি, আনন্দ, আরও কত কী!

ঝুঁকে পড়ে খাটের নীচে ঢুকে গেলাম খানিকটা। হাত বাড়িয়ে কুসুমকে ধরলাম। ছোঁওয়ামাত্রই ও যেন আঁতকে উঠল। ছিটকে সরে যেতে চাইল আমার কাছ থেকে। একটা অদ্ভুত চাপা-আর্তনাদ করে উঠল।

আমি অন্ধকারের মধ্যেই ওর কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম। বললাম, কুসুম, আমি রণবীর—রুণু।

তারপর ওকে টেনে বের করে নিয়ে এলাম খাটের তলা থেকে। পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলাম ছত্রখান বিছানায়। দেখলাম, সেখানে ও চমৎকার মানিয়ে গেছে। কারণ, ওর শরীরটাও ছত্রখান।

খোঁপা খুলে চুল এলোমেলো। সিঁদুর ঘষে গিয়ে করসা কপাল লালচে। ডান-চোখের নিচটা বিশ্রীভাবে ফুলে রয়েছে, কালসিটে পড়ে গেছে। বাঁ-গালে ছোট-ছোট দুটো ক্ষতের দাগ, চামড়া কেটে মাংস দেখা যাচ্ছে। ওপরের ঠোঁট জখম হয়ে কষ বেয়ে রক্তের দাগ নেমেছে। একইরকম রক্তের দাগ দেখলাম হাতে, বাহুতে, কোমরে। শাড়ি ছিঁড়ে জট পাকিয়ে কোমরের কাছে জড়ানো। ব্লাউজ গলার কাছে টান মেরে ছেঁড়া। ধবধবে গলায়, বুকে, নখের আঁচড়ের কয়েকটা সমান্তরাল দাগ চোখে পড়ল। অন্তর্বাস জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ছিঁড়েছে ব্লাউজের হাতা, কোমরের কষি।

সব মিলিয়ে সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

কুসুম কোনওরকমে চোখ খুলে আমাকে দেখতে চেষ্টা করল। তারপর আমার কোলে মুখ গুঁজে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। আমি ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরলাম। বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল।

কুসুম, কী হয়েছিল?

যতটা সম্ভব শুশ্রূষা, পরিচর্যা করে কুসুমকে কিছুটা সুস্থ করে তুলেছি। এক্ষুনি

ডাক্তারকে খবর দিতে যাব। কিন্তু তার আগে, সবকিছু জানাজানি হওয়ার আগে, পরিস্থিতির ওজনটুকু আঁচ করা দরকার।

কুসুমের সামনে যতই সহানুভূতির ভাব ফুটিয়ে তুলি না কেন ভেতরে-ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর রাগ দাপাদাপি করছিল। যে করেই হোক, আমার বউয়ের ওপরে এই অত্যাচারের শোধ তুলতেই হবে। যেমন করেই হোক বদলা আমার চাই-ই চাই। অতি কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে শুয়ে থাকা কুসুমকে আবার নরম গলায় প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছিল, কুসুম?

দুর্বল অস্পষ্ট গলায় থেমে-থেমে বহুক্ষণ ধরে ও যা বলল তার সারমর্ম হল এই : হাতের কাজ-টাজ সেরে রোজকারমতো ছটা বত্রিশে ও টিভি দেখতে বসে। কাজলের মা তার একটু আগেই চলে গেছে। কতক্ষণ টিভি দেখেছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ শোনে দরজায় কেউ নক্ করছে। কেন যেন ওর মনে হয়েছিল, নক্ করার ভঙ্গিটা ঠিক আমার মতো। ভেবেছিল, আমি হয়তো অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি। তবুও অভ্যাসবশে দরজার কাছে গিয়ে ও 'ম্যাজিক আই'-এ চোখ রাখে। যে নক্ করছিল সে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল, কারণ, শুধু তার কাঁধের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। আর আশ্চর্য, যে-নীল রঙের জামাটা কুসুমের চোখে পড়ে আমার ঠিক সেইরকম একটা জামা আছে—যদিও আজ অন্য রঙের জামা পরে আমি অফিসে গেছি। কিন্তু সেইমুহূর্তে কুসুমের সেটা খেয়াল হয়নি। মোটামুটিভাবে আমি ফিরে এসেছি ভেবেই ও দরজা খুলে দেয়।

লোকটি ঢুকেই বলে যে, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, একটু অপেক্ষা করবে। অস্বস্তি হলেও কুসুম তাকে ঠিক মুখের ওপরে 'না' বলতে পারেনি। বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলেছে। কিন্তু মনে আছে, লোকটা সোফায় না-বসে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। অপরিচিত একজন পুরুষ ফ্ল্যাটে ঢোকার ফলে ইচ্ছে করে ফ্ল্যাটের দরজাটা ও আর বন্ধ করেনি। হাট করে খুলে রেখে দিয়েছে। তারপর চায়ের আয়োজন করবে বলে শোওয়ার ঘরে আসে কাচের আলমারি খুলে সুদৃশ্য কাপ-প্লেট বের করার জন্যে : অতিথি-অভ্যাগত এলে তবেই এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শোওয়ার ঘরে ঢুকে আলমারির কাছে পৌঁছনোর আগেই দরজায় একটা শব্দ শুনতে পায় কুসুম। পেছন ফিরে দেখে সেই লোকটা শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তখন তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। কুসুম কিছু একটা বলতে যাবে, তার আগেই লোকটা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। দাঁত বের করে হেসে বলে, 'শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন কেন, মাইরি!' কুসুম চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু সেই চিৎকার আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা বোধহয় শুনতে পায়নি। প্রথমত, ভয়ে কুসুমের গলা প্রায় বুজে গিয়েছিল, তাই চিৎকারের আওয়াজটা হয়তো ঠিকমতো বেরোয়নি। দ্বিতীয়ত, ঘরে টিভি চলছিল। আর তৃতীয়ত, 'সান্ধ্য আইন' অনুযায়ী এ-বাড়ির প্রায় প্রতিটি ফ্ল্যাটেই জোরাল ভলিয়ুমে টিভি চলে।

এরপর যা হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা কুসুমের পক্ষে অস্বস্তিকর। লোকটা হঠাৎই খ্যাপা জানোয়ার হয়ে ওকে আক্রমণ করে। কুসুম নিজেকে বাঁচানোর জন্যে প্রাণপণ লড়াই করেছে। শেষে মরিয়া হয়ে ও ঢুকে পড়ে খাটের তলায়। ধস্তাধস্তি চলতেই থাকে।

হঠাৎই সিঁড়ির কাছে কয়েকজনের কথাবার্তা আর হাসির শব্দ শোনা যায়। লোকটা তাতেই কেমন যেন ভয় পেয়ে কুসুমের মুখে একটা ঘুসি মেরে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করে ওকে ছেড়ে দেয়। ওর তখন মাথা ঝিমঝিম করছে, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে রয়েছে, শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করার মতো সাড়টুকুও নেই। দেখল, লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে কাচের আলমারির আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

লোকটা চলে যেতেই কুসুম বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। কারণ, আমার ডাকে চেতনা ফিরে পেয়ে ও আমাকেই হঠাৎ সেই আততায়ী বলে মনে করেছিল।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কুসুম বারবার কেঁদে ফেলছিল। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিলাম। আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ জ্বালা করছিল। অনেক প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু একটা অজানা আশঙ্কা আমার টুটি টিপে ধরছিল বারবার।

শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্নই করলাম ওকে।

লোকটাকে কেমন দেখতে? আবার দেখলে চিনতে পারবে?

কুসুম ইতস্তত করে বলল, গায়ের রঙ কালো। মুখ ভালো করে দেখিনি—আর আমার মুখের ওপরে যখন মুখ নিয়ে এসেছিল তখন কিছু দেখে থাকলেও মনে নেই। তবে মনে হয়, লোকটার ঠোঁটের নীচে ডানদিকে একটা বড় আঁচিল ছিল। আর ভুরু দুটো খুব ঘন, জংলা—তার নিচ দিয়েই লোকটার চকচকে চোখজোড়া তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। আর...।

আমার মনে পড়ল, কুসুম বলেছে লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসেছিল। তাই জিগ্যেস করলাম, লোকটার দাঁতগুলো মনে আছে?

কুসুম ফ্যালফ্যাল করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আমার চোখে। তারপর বলল, সত্যিই তো একদম খেয়াল করিনি—লোকটার ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত অর্ধেকটা ভাঙা ছিল। এছাড়া আর কিছু মনে নেই।

আর কিছু? আমি মনে-মনে হাসছিলাম। আততায়ীর যে খুঁটিনাটি বর্ণনা কুসুম দিয়েছে তাতে একে খুঁজে বের করতে পুলিশের সাতদিনও লাগবে না—যদি অবশ্য আমি পুলিশে খবর দিই। চেষ্টা করলে আমি নিজেও হয়তো ওই ইতর ছোটলোকটাকে খুঁজে বের করতে পারব। লোকটাকে খুঁজে পাবই, এ-বিশ্বাস মনের মধ্যে নিশ্চিত হলেও একটা ব্যথা বুকের ভেতরে আঁচড় কাটছিল বারবার : কলকাতা শহরে এত বাড়ি থাকতে ওই ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত আততায়ী আমার ফ্ল্যাটটাই বেছে নিল। বুঝতে পারছি, আমার নামটা জানতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি। কারণ, সেটা প্লাস্টিকের হরফে ফ্ল্যাটের দরজার গায়েই লেখা আছে।

কুসুমকে বললাম, আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।

আমাদের বাড়ির তিনটে বাড়ি পরে ডক্টর দাস থাকেন। অসুখ-বিসুখ হলে উনিই আমাদের দেখেন। ওঁর নানারকম বিলিতি ডিগ্রি আছে। ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর সময় কুসুমকে বারবার সাবধান করে দিয়ে বললাম, আমার গলা না-পেলে তুমি একদম দরজা খুলবে না। শুধু আজ বলে নয়, কোনওদিনই এরকম হট করে আর দরজা খুলবে না।

কুসুম সেই তখন থেকেই মুখ নামিয়ে রয়েছে। আমার দিকে যেন সহজভাবে তাকাতে

পারছে না। আমার কথায় কুসুম ছোট্ট করে বলল, হুঁ। তারপর দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিল।

আমি সিঁড়ি নামতে শুরু করলাম।

ডক্টর দাস অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে কুসুমকে পরীক্ষা করলেন।

আমি শোওয়ার ঘরের দরজায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁতে নখ কাটছিলাম। ঘরটা আমিই ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করেছি। আতঙ্কের দুনিয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাইরেটুকু অন্তত। শুধু ভাঙা আয়নাটা স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। ঘরটা দেখে, কুসুমকে দেখে, বিশ্বাসই হতে চাইছে না কোনও আততায়ী মাত্র ঘণ্টাদেড়েক আগে ঢুকে পড়েছিল এই ঘরে।

সিঁড়িতে কথাবার্তা আর হাসির আওয়াজ শুনে লোকটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে যারা উঠছিল বা নামছিল, তারা নিশ্চয়ই এই ফ্ল্যাটবাড়িরই বাসিন্দা বা তাদের আত্মীয়স্বজন। আমার ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা দেখেও তারা কৌতূহলী হয়নি, ফ্ল্যাটের ভেতরে উঁকি মারেনি। নিজেদের মনে ঠাট্টা-মশকরা করতে-করতে চলে গেছে। যদি কেউ একবার ফ্ল্যাটে ঢুকত তা হলে ওই লোকটা নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। আমি এ-বাড়িতে কিছুদিন হল এসেছি। এখনও ভালো করে সবার সঙ্গে আলাপ-সালাপ হয়নি। সেই জন্যেই কি সিঁড়ির মানুষগুলো আমার ফ্ল্যাটের খোলা দরজাকে উপেক্ষা করেছে? না কি এটাই ওদের অভ্যাস?

ডক্টর দাস কুসুমকে ইঞ্জেকশান দিলেন। তারপর ব্যাগ গুছিয়ে উঠে এলেন। আমাকে ডেকে বললেন, একটু বাইরে আসুন—কথা আছে।

করিডরে বেরিয়ে আসার আগে লক্ষ করলাম, কুসুম কৌতূহলী নজরে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে।

বসবার ঘরের কাছে এসে ডক্টর দাস আমার দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন : ওষুধগুলো আনিয়ে নিন। প্রথম ট্যাবলেটটা রাত দশটা নাগাদ খাইয়ে দেবেন, বাকিগুলো কাল থেকে শুরু হবে। সব লেখা আছে। এখন ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়েছি—রেস্ট দরকার। যা ধকল গেছে!

আমি যন্ত্রের মতো সব কথা শুনে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শেষ কথাটায় একটা ধাক্কা খেলাম। চমকে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

ডক্টর দাস তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, আরে না, না! ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই।—আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেন সান্ত্বনার ঢঙে।—আপনি যা ভাবছেন সেরকম কিছু হয়নি। ভাগ্যিস লোকটা মাঝপথে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল!

কুসুমের কাছে শোনা সব কথাই ডক্টর দাসকে খুলে বলেছি। কিছুই লুকোইনি। আমি ওঁর মুখটা লক্ষ করছিলাম। লক্ষ করতে-করতেই পকেট থেকে ভিজিটের টাকা বের করে ওঁর হাতে দিলাম। শুনতে পেলাম উনি আরও বলছেন : ইউ আর এ লাকি ডগ। নেহাত কপাল ভালো, নইলে আরও অনেক কিছু ঘটে যেতে পারত। যাক্‌গে, এ-নিয়ে

আর থানা-পুলিশ করে কোনও ঝামেলা করতে যাবেন না যেন। সেরকম কিছু হলে তখন না-হয় থানা-পুলিশ করবেন। প্রতিবেশী হিসেবে এটাই আমার সাজেশান।

আমি অবাক হয়ে বিনিতি ডিগ্রিওয়ালা মধ্যবয়েসি ডাক্তারবাবুকে দেখছিলাম। একটা অজ্ঞাতকুলশীল লোক আমার স্ত্রীকে আক্রমণ করল, তাকে অপমান করল, এমনকি মারধোরও করল, সেটা আমাকে মুখ বুজে সইতে হবে! অবশ্য ডাক্তারি মতে আমার স্ত্রীর 'সতীত্ব' ক্ষুণ্ণ হয়নি। হলে পরে থানা-পুলিশ, হইচই, আরও অনেক কিছু করা যেত।

করিডরের উলঙ্গ বালবের আলো ডাক্তার দাসের মুখে পড়েছে। উনি এমনিতে ফরসা, তবে এখন কেন যেন ভীষণ কালো দেখাচ্ছিল। চোখ দুটো কেমন চকচক করছে। ভুরু দুটো কী ঘন, জোড়া! ইস্, ঠোঁটের নীচে ডানদিকে যদি একটা বড় আঁচিল থাকত, আর ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত যদি খানিকটা ভাঙা থাকত! জানি না, ওঁর এই চেহারাটা কুসুমের নজরে পড়েছে কি না। পড়লে হয়তো ও আঁতকে উঠত।

ডক্টর দাস ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর সময়েও বারবার বলতে লাগলেন, ওঃ আপনার স্ত্রী খুব বাঁচান বেঁচে গেছে, মশাই, খুব বাঁচান বেঁচে গেছে। কলকাতা শহর বলে কথা, এখানে একটু সাবধানে না-থাকলে চলে—।

উনি চৌকাঠ পেরোনোমাত্রই আমি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে কি খেয়াল হতে 'ম্যাজিক আই'-এ চোখ রাখলাম। দেখলাম, নীল জামা পরা একটা শরীরের অংশ দরজার ওপিঠে সরে গেল।

পরদিন সকালেই অন্যান্য ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা আমার সঙ্গে আলাপ করতে এল।

মনে হল, গতকাল ওরকম একটা ঘটনা না-ঘটলে ওদের সঙ্গে কবে ভালো করে আলাপ হত কে জানে! হয়তো কোনওদিনই হত না। কী করে ওরা খবর পেল জানি না। আমি ওদের কিছু বলিনি। কিন্তু গতকাল রাতে কি ওরা খবর পায়নি? কাল তো কেউ আসেনি। আজ, এই রোদ-ঝকঝকে সকালে, ওরা এসে হাজির। ওদের দেখলে মনে হয় পৃথিবীর কোথাও কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই—কোনওদিন ছিল না।

আমি খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়লাম। কুসুমের এখন বিশ্রাম দরকার। তা ছাড়া, এমন একটা সময়ে অপরিচিত মানুষগুলোর মুখোমুখি হওয়াটা ওর কাছেও রীতিমতো অস্বস্তিকর। কিন্তু কাউকে সে কথা বলতে পারছিলাম না, আর ওরাও নিজে থেকে বুঝতে পারছিল বলে মনে হল না। যথাসম্ভব সংক্ষেপে গতকালের ঘটনা ওদের বলতে একরকম বাধ্য হয়েছি।

নানাজনে নানা কথা বলছিল।

আচ্ছা, আমাদের পাড়ার পুঁটেদা, ন্যাংলাদা, ওদের দলের কারও কি সামনের দাঁত ভাঙা আছে?

রণবীরবাবু, আপনি খবরের কাগজের অফিসে যান। ওদের সব খুলে বলুন। এইসব রেপ কেসগুলো আজকাল বড্ড বেড়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া হওয়া দরকার।

আমার মনে হয়, ঘটনাটা পুলিশে জানানো উচিত। লোকটা যখন একবার এই বাড়িটা

নোট করে গেছে তখন আবার এখানে ঘুরে আসতে পারে। আপনার ফ্ল্যাটে হয়তো আর কিছু করবে না, তবে আমাদের কারও ফ্ল্যাটে হানা দিতে পারে। আপনারা কি বলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সিকিওরিটি বলে একটা ব্যাপার আছে তো!

আমার স্ত্রীও তো মশাই সারাটা দিন একা বাড়িতে থাকে।

চ্যাটার্জিদা, আপনার ওসব ভয় নেই! বুড়োবুড়িদের ফ্ল্যাটে ওসব লোক ঢুকবে না।

তুমি তো ভালো কথাই বললে, ভায়া! আমাদের বুড়ো-বুড়ির না-হয় ভয় নেই, কিন্তু ছুঁড়ি ঝি-টা রয়েছে না!

ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, কী যেন নাম? লতা, তাই না। হ্যাঁ, ওর চেহারাটা বেশ ডাগর-ডোগর...

আপনার স্ত্রীর কমপ্লিট রেস্ট দরকার। একটা মেন্টাল চাপও তো গেছে। আপনি না-হয় কিছুদিন অফিস ছুটি নিয়ে নিন।

যদি বলেন তো আমি লোক্যাল থানায় ইনফর্ম করতে পারি। থানার ও.সি. আমার চেনা।

আপনার স্ত্রীর ক্ষমতা আছে! ওইরকম একটা অবস্থার মধ্যেও লোকটার চেহারা মনে রেখেছে। দেখবেন, পুলিশ দু-দিনেই লোকটাকে পাকড়াও করে ফেলবে।

শুনেছি এসব লোকদের আবার না কি পুলিশে হাত থাকে। কে জানে, ধরার দু-দিন পরে আবার ছেড়ে দেবে কি না। তখন লোকটার আক্রোশ আরও বাড়বে।

আচ্ছা, আপনি আমাদের সত্যদাকে একটু ধরুন না।

সত্যদা?

আরে আমাদের লোক্যাল এম-এল-এ। সত্যরঞ্জন চাকলাদার। শুনেছি উনি লোক্যাল লোকেদের খুব হেল্প-টেল্প করেন। ওঁর হেল্প পেলে লোকটার সাজা হবেই হবে। গ্যারান্টি।

চলি, আমার আবার আপিস যাওয়ার সময় হয়ে গেল।

ভাবছি, বউকে আর ছেলেকে ক'দিনের জন্যে বাপের বাড়িতে রেখে আসব।

আপনিও সেখানে চলে যান না, মিস্টার গুপ্ত, তা হলে একটা ফ্ল্যাট খালি হয়। আমার শালা অনেকদিন ধরে বলছিল।

কেন, আমার কি শালা নেই নাকি?

চলি, কাল আবার খবর নেব।

খবরের কাগজের ব্যাপারটা ভুলবেন না যেন।

চলি—।

ওরা সব চলে গেল। আমি বসবার সোফায় মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। জানি, কর্তারা অফিস-কাছারিতে বেরিয়ে গেলেই এরপর একে-একে এ-বাড়ির নানা ফ্ল্যাটের মেয়েরা-বউরা আসবে। কিন্তু এখন কী করব? কী করা উচিত? নাঃ, থানায় খবর একটা দেওয়া দরকার। আমি খবর না-দিলেও অন্য কেউ খবরটা দিতে পারে। সকলের সিকিওরিটির ব্যাপার রয়েছে।

সুতরাং কাজলের মাকে সতর্ক থাকতে বলে, কুসুমকে ওষুধ খাইয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরোলাম। ডক্টর দাস আজ রাতে একবার দেখতে আসবেন বলেছেন। কিন্তু আমার

মনে হয় তার বোধহয় আর দরকার হবে না। ঠিক করলাম থানায় যাওয়ার পথে ওঁর বাড়িতে জানিয়ে দেব।

রাস্তায় পা দিয়ে প্রতিটি পথচারীকে আমি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। খুঁজতে লাগলাম নীল জামা, জংলা ভুরু, আঁচিল, আর ভাঙা দাঁত। এই শহরেই কোথাও-না-কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে শয়তানটা।

আমার শরীর আবার জ্বালা করছিল।

রেপ কেস?

ডায়েরির খাতার ওপরে পেনসিল থামিয়ে অফিসারটি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারলাম না।

ও-সির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনিই একজনকে ডেকে আমাকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। ঘরটা বেশ বড়। তিনটে টেবিল, গোটাচারেক চেয়ার আর কয়েকটা বেঞ্চ পাতা রয়েছে। মাথার ওপরে, পরস্পরের কাছ থেকে কিছুটা দূরে দুটো জম্পেশ ফ্যান ক্যাঁচক্যাঁচ করে ঘুরছে।

ফাঁকা ঘরে মিনিটকয়েক অপেক্ষা করার পর একজন উর্দি পরা অফিসার খাতা-পেনসিল হাতে নিয়ে ঢুকেছেন। হয়তো এস-আই টেস-আই হবেন। আমার মুখোমুখি বসে খাতা খুলে প্রথমেই আমার নাম-ঠিকানা সব টুকে নিলেন। তারপর বললেন, কী কমপ্লেন আছে বলুন।

আমি মোটামুটি সব খুলে বলতেই তিনি বললেন, রেপ কেস?

এটা প্রশ্ন না মন্তব্য ঠিক বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

অফিসার পেনসিল দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলেন। শব্দ করে ডায়েরির খাতাটি বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাই তুলে বললেন, লোকটা ধরা পড়লে আপনার স্ত্রীকেই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে। উকিলদের জানেন তো, ওদের মুখে কিছু আটকায় না। কাঠগড়ায় আপনার বউকে দাঁড় করিয়ে উকিলরা অনেক খারাপ-খারাপ প্রশ্ন করবে। যেমন, লোকটা ঠিক কী-কী করেছে। শরীরের ঠিক কোথায়-কোথায় হাত লেগেছে। তারপর, ধরুন, ইয়ে করার সময় আপানর বউ ঠিক কী-কীভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সরকারি ডাক্তাররা আপনার স্ত্রীকে নানা পরীক্ষা করে দেখবে, জোর করে—মানে ইয়ের সময় জবরদস্তির চিহ্ন আছে কি না...।

হঠাৎই টেবিলে দু-হাতের ভর দিয়ে অফিসার সামনে ঝুঁকে এলেন। আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, পারবেন এসব সহ্য করতে?

আমি মিনমিন করে বললাম যে, উনি যা ভাবছেন ঠিক তা নয়। মানে, এটা ঠিক রেপ কেস নয়। বরং অ্যাসাল্ট বা মলেস্টেশান বলা যেতে পারে। আমি সেইরকমই একটা অভিযোগ দায়ের করতে চাই। সোশ্যাল সিকিওরিটির একটা ব্যাপার রয়েছে...।

অফিসার অবাক চোখে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপর হেসে বললেন,

আপনি তো আজব লোক মশাই। রেপ-টেপের ব্যাপার কিছু হয়নি আর ফালতু-ফালতু ডায়েরি লিখিয়ে গায়ে কাদা ছেটাতে চাইছেন! আপনি জানেন....

অফিসার আরও কী-সব বলতে লাগলেন, কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢুকছিল না। আমি একনজরে অফিসার ভদ্রলোককে দেখছিলাম। ওঁর বাঁ-গালের ওপরে একটা আঁচিল রয়েছে। গায়ের রঙ কালো। মোটা জংলা গোঁফ। সামনের কোনও দাঁত ভাঙা নেই।

খুব ইচ্ছে করছিল ওঁর গালের আঁচিলটা একখাবলায় তুলে নিয়ে ঠোঁটের নীচে ডানদিকে বসিয়ে দিই। গোঁফজোড়া উপড়ে নিয়ে সমান দু-ভাগে কেটে বসিয়ে দিই চকচকে দু-চোখের ওপরে সূক্ষ্ম ভুরুর জায়গায়। আর ভারি নোড়ার গুঁতোয় ভেঙে দিই ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত। তারপর শুধু একটা নীল জামা পরিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা।

হঠাৎ দেখি আমার চোখের সামনেই আঁচিলটা গালের ওপর দিয়ে হেঁটে পৌঁছে গেল ঠোঁটের নীচে ডানদিকে। গোঁফজোড়া জায়গা ছেড়ে উঠে এল, দুভাগে ভাগ হয়ে বসে গেল ভুরুর ওপরে। একটা অদৃশ্য নোড়া যেন দাঁতের পাটিতে গুঁতো মারল। একটা নীল জামা...।

আমি বললাম, ডয়েরিটা ক্যান্সেল করে দিন।

এরপর থানা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

এখন কী করা উচিত? কুসুমের নিরাপত্তার জন্য কিছু একটা আমাকে যে করতেই হবে। আর ওই অত্যাচারের শোধ নিতে চেয়েছিলাম, তাই-বা নেব কেমন করে? শরীরের ভেতরে রক্ত যেন ফুটছে।

অজান্তেই আমার পা-জোড়া এগিয়ে যাচ্ছিল সত্যরঞ্জন চাকলাদারের পার্টি-অফিসের দিকে, কিন্তু আমি জোর করে তাদের থামালাম। রাস্তার গনগনে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চোখের সামনে সত্যরঞ্জন চাকলাদারের মুখটা ভেসে উঠছিল : গায়ের রঙ কালো, চকচকে চোখ, জংলা ভুরু, ঠোঁটের নীচে আঁচিল, ভাঙা দাঁত। আমি জানি, সত্যি-সত্যি যদি ভদ্রলোককে ওরকম দেখতে নাও হয়, আমার স্ত্রীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা শুনলেই তাঁর মুখের চেহারার রদবদল হবে। শেষ পর্যন্ত ওই একইরকম হয়ে যাবে। এমনকী প্রতিবেশীদের পরামর্শমতো খবরের কাগজের অফিসে গেলেও সেখানকার সাংবাদিক বা সম্পাদকের চেহারাও হয়তো পালটে যাবে একইভাবে। সুতরাং বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

ফেরার পথে আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, রাস্তার প্রত্যেকটি মানুষকে একইরকম দেখতে; কালো রঙ, চকচকে চোখ, জংলা ভুরু...।

জানি, বাড়ি ফিরে গিয়ে অন্যান্য ফ্ল্যাটের মানুষগুলোকে যদি দেখতে পাই তা হলে তাদেরও হয়তো একইরকম চেহারা দেখব। সত্যিই কি গোটা শহরের প্রত্যেকটি মানুষ একইরকম দেখতে হয়ে গেছে? এবং গতকাল রাতের ঘটনার জন্য কি আমি, আমরা, প্রত্যেকটি মানুষ, সমানভাবে দায়ী? আমরা প্রত্যেকেই কি সমানভাবে কুসুমের আততায়ী?

তাই যদি হয়, তা হলে এখন থেকে শোওয়ার ঘরের ওই ভাঙাচোরা আয়নার মুখোমুখি দাঁড়াতে আমার বেশ ভয় করবে।

রাতের ট্রেনে দেখা হয়েছিল

আপনি 'সুনন্দা' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। তাই আপনাকেই শোনাব এই বিচিত্র কাহিনি। তারপর আপনাকে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ করব। যদি পারেন আমাকে একটু সাহায্য করবেন, কারণ আপনিই পারেন আমাকে বাঁচাতে। শুধু আমি কেন, আপনার কাছ থেকে সামান্য একটু সাহায্য পেলে প্রায় দেড়শোটা পরিবার বেঁচে যাবে। ওদের সকলের সমস্যা মাথায় নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি উদভ্রান্তের মতো। দূরপাল্লার ট্রেনগুলোয় এলোমেলোভাবে উঠে পড়ছি, নেমেও পড়ছি একইভাবে। যে-কোনও স্টেশন থেকে ট্রেন ধরছি, নেমে পড়ছি যে-কোনও স্টেশনে। ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি একজনকে। রাতের ট্রেনেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

ঘটনাটা শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তবে যা বলব তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়।

আমি একটি পত্রিকা অফিসে কাজ করি। সেই হাউসের চারটি ম্যাগাজিন আছে। তিনটি ইংরেজি, একটি বাংলা। বাংলা পত্রিকাটি পাক্ষিক। নাম 'চারুলতা'। নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পত্রিকাটির চরিত্র 'সুনন্দা'র মতোই। আমি এই পত্রিকার সারকুলেশানের দায়িত্বে রয়েছি।

তিন বছর ধরে 'চারুলতা' প্রকাশিত হচ্ছে। নামী লেখকরা নিয়মিত এই পত্রিকায় লেখেন। অনেক খরচ করে যত্ন নিয়ে এই রঙিন পাক্ষিকটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিন বছরে এই পত্রিকার সারকুলেশান পনেরো হাজারেও পৌঁছয়নি।

আমাদের হাউসের মালিক সর্বেশ্বর নাগ অনেক আশা নিয়ে ম্যাগাজিনটি বের করেছিলেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করার আগে চুলচেরা মার্কেট সার্ভে করা হয়েছিল। তার পজিটিভ আউটকাম দেখেই যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

তিন বছর ধরে আমি মুখে রক্ত তুলে 'চারুলতা'-র বিক্রি বাড়াতে চেষ্টা করেছি। ইস্টার্ন রিজিওনের বাঙালি অঞ্চলে ঘনঘন টুর করেছি। কিন্তু 'চারুলতা'-র বিক্রি 'সুনন্দা'-র ধারে-কাছে পৌঁছতে পারেনি। আমি দুটো পত্রিকা হাতে নিয়ে লক্ষবার তুলনামূলক বিচার করেছি। কিন্তু কিছুতেই 'চারুলতা'-র মাইনাস পয়েন্ট বের করতে পারিনি।

গত কয়েকমাসে মিস্টার নাগ আমাকে ডেকে বেশ কয়েকবার প্রচ্ছন্ন ধমক দিয়েছেন। যার অর্থ হল, যদি আগামী ছ-আট মাসে ম্যাগাজিনের বিক্রি বাড়াতে না-পারি, তা হলে উনি ম্যাগাজিন বন্ধ করে দেবেন। আর যদি শুধু ইংরেজি পত্রিকাই বের করতে হয়, তা হলে কোনও অবাঙালি বিজনেস পার্টনার নিয়ে দিল্লি বা মুম্বই থেকে তিনি সেগুলো বের করবেন। অর্থাৎ, কলকাতা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নেবেন। যার বাংলা মানে

হল, প্রায় দেড়শো স্টাফ বেকার হবে। সেইসঙ্গে দেড়শো পরিবার এক চরম অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবে।

এইরকম একটা বিপন্ন অবস্থায় আমি পত্রিকার বিক্রি বাড়ানোর কাজে আসাম আর উত্তরবঙ্গ টুরে গিয়েছিলাম। অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুটো সপ্তাহ মরিয়া হয়ে কাজ করেছি। তারপর নিতান্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে উঠে পড়েছি হাওড়া ফেরার ট্রেনে।

নভেম্বরের শেষ। এ-সময়ে কলকাতায় শীত তেমন জাঁকিয়ে না-বসলেও এদিকটায় ঠান্ডা আছে।

আমার ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে দূরপাল্লার যাত্রী কেউ ছিল না। তাই কারও সঙ্গেই তেমন করে আলাপ জমেনি। কিন্তু সন্ধের পর একটা বড়সড় ব্রিফকেস হাতে এমন একজন যাত্রী কেবিনে ঢুকলেন, যাঁর চেহারা রীতিমতো নজর কেড়ে নেয়।

ভদ্রলোকের বয়েস ষাট-বাষট্টি হবে। ফরসা স্বাস্থ্যবান শরীর। পরনে গাঢ় রঙের সুট, টাই। মাথার সামনেটা টাক পড়লেও পিছন দিকে ঘন কাঁচাপাকা বাবরি চুল। কপালে সমান্তরাল কয়েকটা ভাঁজ। চোখে কালো চওড়া ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচ এতই পুরু যে, কয়েকটা সাদা রিঙের মতো দাগ চোখে পড়ছে।

ভদ্রলোকের পুরুষ্টু গোঁফ আর জুলপি দেখে মনে হয় এককালে মিলিটারিতে ছিলেন। মুখেও সেই ধাঁচের একটা রাশভারি ভাব। আর তীব্র চোখের নজর যেন তীর বেঁধানো।

কামরায় উঠেই ভদ্রলোক একটা চুরুট ধরালেন। তারপর ব্রিফকেস খুলে একটা বই বের করে নিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। বইটার নামটা অদ্ভুত বলেই আমার মনে আছে : 'হেটেরোসাইকিক কেমিস্ট্রি।'

আমি 'সুনন্দা'-র নতুন সংখ্যাটা নিয়ে চোখ বোলাচ্ছিলাম। আজই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ওটা কিনেছি। পত্রিকাটা কী ম্যাজিক জানে আমি বলতে পারব না। তবে লক্ষ করেছি, ম্যাগাজিনটা হাতে নিলে আমার আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ঘণ্টাখানেক পরেই কেবিনের অন্য দুজন যাত্রী নেমে গেল। ফলে কামরায় শুধু আমরা দুজন। আমার সহযাত্রী এইবার বোধহয় আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইলেন।

'হাওড়া পর্যন্ত যাবেন বুঝি?' ওঁর গলার স্বর বেশ ভারি। ঠোঁটের কোণে সামান্য একচিলতে হাসি।

এইভাবেই আলাপ শুরু।

কথায়-কথায় আমার ম্যাগাজিনের কথা বললাম। ব্যাগ থেকে এককপি 'চারুলতা' দেখিয়ে বললাম, 'আমি এই ম্যাগাজিনের সারকুলেশান ডিভিশনের চিফ।'

ভদ্রলোক কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, 'ম্যাগাজিনটা খুব একটা বিক্রি হচ্ছে না তো—।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই ভেতরের খবরটা উনি কী করে জানতে পারলেন? ভদ্রলোক সবজান্তা হাসি হাসলেন চাপা গলায়। তারপর বললেন, 'না, না, অবাক

হওয়ার কিছু নেই। আপনি "চারুলতা"-র লোক হয়ে "সুনন্দা" পড়ছেন, তাই বললাম—' চুরুটের ঘন ধোঁয়ায় নিজেকে ঝাপসা করে দিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া ম্যাগাজিন লাইনে আমারও একটু-আধটু ইন্টারেস্ট আছে।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না। হাউসের সিক্রেট যাকে-তাকে বলা ঠিক নয়। তবে ভদ্রলোকের কথায় একটা ঠান্ডা অস্বস্তি আমার শিরদাঁড়ায় কাঁকড়াবিছের মতো হেঁটে বেড়াতে লাগল।

প্রশ্ন করে জানলাম, ভদ্রলোক পেশায় কনসালট্যান্ট। তবে ঠিক কীসের কনসালট্যান্ট তা উনি স্পষ্ট করে বললেন না। ওঁর কথায়, আচরণে, আর হাসিতে কোথায় যেন একটা রহস্য জড়িয়ে রইল। উনি আবার ওঁর কেমিস্ট্রি বইটায় মন দিলেন। আমিও 'সুনন্দা'-র পাতায় ফিরে গেলাম।

'সুনন্দা'-র পাতা ওলটাতে-ওলটাতে একটা গল্পে আমার চোখ আটকে গেল। আমি ভুল দেখছি না তো! গল্পের নামটা একটু রহস্যময়। কিন্তু তার প্রথম লাইন দুটো আমাকে পাথর করে দিল।

রাতের ট্রেনে দেখা হয়েছিল

সোমদত্ত সেনচৌধুরী

আপনি 'সুনন্দা' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। তাই আপনাকেই শোনাব এই বিচিত্র কাহিনি। তারপর আপনাকে একটা...

গল্পটা পড়তে-পড়তে আমি অন্য কোথাও হারিয়ে যাচ্ছিলাম। হুবহু আমার কথা লিখেছেন লেখক। আমাদের হাউসের গোপন খবর কেউ কি বেনামে গল্প লিখে ফাঁস করে দিচ্ছে? সোমদত্ত সেনচৌধুরী নামটা বেশ অদ্ভুত। চারটে পদবি দিয়ে তৈরি নাম। নিশ্চয়ই কারও ছদ্মনাম। কিন্তু এই ছদ্মনামের আড়ালে কে লুকিয়ে রয়েছে?

গল্পটায় ঘটনা হুবহু একইভাবে এগিয়েছে। অন্তত সহযাত্রী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়া পর্যন্ত। তবে লেখকের পত্রিকার নাম 'চারুলতা' নয়, 'কাজললতা'। এ ছাড়া সবকিছুতেই আশ্চর্য মিল। এমনকী 'হেটেরোসাইক্লিক কেমিস্ট্রি' পর্যন্ত।

আমি নিশি-পাওয়া মানুষের মতো গল্পটা পড়তে শুরু করলাম :

...'সুনন্দা'-র পাতা ওলটাতে-ওলটাতে কী মনে হওয়ায় ব্যাগ থেকে 'কাজললতা'-র নতুন সংখ্যাটা বের করলাম। 'সুনন্দা'-য় এমন কী আছে যা আমার পত্রিকায় নেই? এবারের টুরে পরের মাস থেকে সারকুলেশান কতটা বাড়বে কে জানে। যে করে হোক,

আগামী ছ'মাসের মধ্যে সারকুলেশান আমাকে বাড়াতেই হবে। তা না-হলে মালিকের কাছ থেকে 'হে বন্ধু বিদায়।'

'সারকুলেশান কিছুতেই বাড়াতে পারছেন না, তাই না?' ভদ্রলোকের গম্ভীর গলা মোক্ষম প্রশ্ন ছুড়ে দিল আমার দিকে।

আমি চমকে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

মিলিটারি গোঁফের কোণে দুর্জ্ঞেয় হাসি। হাতের চুরুট মাপে ছোট হয়ে এলেও তার ধোঁয়ার তেজ কমেনি।

ভদ্রলোক আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে যেন বেশ মজা পেলেন। বারকয়েক মাথা নেড়ে বাবরি চুলে হাত চালিয়ে বললেন, 'ওপর-ওপর দেখলে মনে হবে "সুনন্দা"-য় যা-যা আছে সবই আপনার ম্যাগাজিনে আছে। নামী-দামি লেখক, সুন্দর-সুন্দর ছবি, দামি কাগজ, ভালো ছাপা—বলতে গেলে তেমন কোনও তফাত নেই।'

আমি চটপট বারতিনেক ঘাড় নাড়লাম। কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক ঠিক আমার মনের কথাটি বলেছেন। কিন্তু কিছু বলতে গিয়ে টের পেলাম, আমার মুখের ভেতরে জিভটা যেন গিরগিটির খসখসে লেজ। একইসঙ্গে গলা শুকিয়ে কাঠ।

ভদ্রলোক তাঁর হাতের বইটা ব্রিফকেসের ওপরে নামিয়ে রাখলেন। চুরুটে আয়েশ করে ঘনঘন দুটো টান দিলেন। হাত নেড়ে চোখের সামনে থেকে ধোঁয়া সরিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে নিছকই ট্রেনে আলাপ। এ-বিষয়ে বেশি কথা বলা ঠিক হবে কি না জানি না। তবে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব মানসিক চাপের মধ্যে আছেন... তাই বলছি...।'

আমি দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাতের ট্রেন কোনও একটা স্টেশনকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ট্রেনের খটাখট শব্দ হঠাৎ যেন কয়েক ধাপ বেড়ে গেল। বন্ধ কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে শীতের ঠান্ডা বাতাস ঢুকছিল। কিন্তু আমি শীত গ্রাহ্য না-করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওঁর চশমার ডান-কাচে কেবিনের একটা আলোর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওঁর বাঁ-চোখ লেন্সের ভেতর দিয়ে আমাকেই দেখছিল।

ভদ্রলোক সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, "সুনন্দা"-র বিক্রি আড়াই লাখেরও বেশি। শুধুমাত্র ভালো লেখা, ছাপা, রংচঙ বা দামি কাগজ দিয়ে এই সারকুলেশানে পৌঁছনো যায় না। এর অন্য একটা সিক্রেট আছে...।'

'কী সিক্রেট?' আমি চাপা গলায় প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোকের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়লাম।

ভদ্রলোক চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে সামান্য হাসলেন : 'সিক্রেটটা হল হিউম্যান কেমিস্ট্রি। আমি জানি, আপনি এর নাম শোনেননি—শোনার কথাও নয়। কারণ ব্যাপারটা সতেরো শতকের অ্যালকেমির মতোই খুব গোপনে চর্চা করা হয়...।'

হিউম্যান কেমিস্ট্রি! কেমিস্ট্রির এরকম কোনও শাখা আছে বলে কখনও শুনিনি। তা ছাড়া সেই ছোটবেলা থেকেই কেমিস্ট্রিকে ভয় পেয়ে বড় হয়েছি। প্রায় রোজই করুণাময় ঈশ্বরকে প্রাণপণে ডেকেছি, কবে কেমিস্ট্রি আমার নগণ্য জীবন থেকে অদৃশ্য হবে। আর শেষকালে ম্যাগাজিনের রেকর্ড সারকুলেশানের সিক্রেট কিনা 'হিয়ে' কেমিস্ট্রি!

'বুঝতে পারছি, রসায়নশাস্ত্র ব্যাপারটার প্রতি আপনার খুব একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই। অ্যালকেমি সম্পর্কেও বেশিরভাগ মানুষের এইরকমই ধারণা ছিল। অ্যালকেমি শব্দটার বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে অপরসায়ন। কিন্তু যাঁরা জানার তাঁরা ঠিকই জানেন কোন কোন ধাতু থেকে কীভাবে সোনা তৈরি করা যায়। সুতরাং, অ্যালকেমি একেবারে অলীক ব্যাপার নয়।'

প্রসঙ্গ পালটে যাচ্ছে দেখে আমি অধৈর্য হয়ে ভদ্রলোককে সেই ধরিয়ে দিতে চাইলাম : 'কিন্তু সারকুলেশানের সঙ্গে হিউম্যান কেমিস্ট্রির কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে—খুব গভীর সম্পর্ক। অ্যালকেমির মতো হিউম্যান কেমিস্ট্রিও খুব গোপনে চর্চা করা হয়। সারা পৃথিবীতে এই বিষয় নিয়ে এখন গবেষণা করছে বড়জোর শ-দুয়েক বিজ্ঞানী। আমি এই লাইনে গবেষণা করছি প্রায় ৪০ বছর...।'

'আপনি যে বললেন, আপনি...ইয়ে...মানে, কনসালট্যান্ট?'

ভদ্রলোক ভরাট গলায় নিচু পরদায় হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ম্যাগাজিনের সারকুলেশান কনসালট্যান্ট—যদিও আসলে ব্যাপারটা পুরোপুরি হিউম্যান কেমিস্ট্রি।'

আমি আর থাকতে না-পেরে একটু খোঁচা দিয়েই বললাম, 'আপনার ওই হিউম্যান কেমিস্ট্রি দিয়ে সারকুলেশান বাড়ানো যায় না কি?'

ভদ্রলোক বিন্দুমাত্রও আহত না-হয়ে জবাব দিলেন, 'একমাত্র হিউম্যান কেমিস্ট্রি দিয়েই কোনও ম্যাগাজিনের সারকুলেশান ফিনোমিনাল জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব—ঠিক যেমনটা "সুনন্দা" করেছে। দাঁড়ান, ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি...।

'আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাকশন বা রিঅ্যাকশনের জন্যে আমাদের শরীরের ভেতরে নানারকম জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যায়। যেমন ধরুন, আপনি হঠাৎ রেগে গেলেন, কিংবা ভয় পেলেন, অথবা উত্তেজিত হলেন—এইরকম প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনার শরীরের ভেতরে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে। এই বিক্রিয়াগুলো এতই জটিল যে, এর অনেকটাই এখনও বিজ্ঞানীদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে থেকে গেছে। আমাদের শরীরে কতরকম অ্যামিনো অ্যাসিড আর প্রোটিন মলিকিউল রয়েছে। এরা আবার নানারকম কেমিক্যাল চেইন তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে সে এক মিরাকিউলাস ব্যাপার। সেইজন্যেই এর বেশিরভাগটাই রহস্য থেকে গেছে।' একটু থেমে নতুন একটা চুরুট ধরালেন ভদ্রলোক। তারপর চুরুটে বারকয়েক টান দিয়ে জড়ানো গলায় বললেন, 'তবে আমি এই মিস্ট্রির কিছুটা সলভ করেছি। কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে যে আমাদের শরীরের ভেতর কী করতে পারে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।' হেসে কথা শেষ করলেন তিনি। ধোঁয়া ছাড়লেন আয়েস করে।

ভদ্রলোকের কেমিস্ট্রির কচকচি আর চুরুটের ধোঁয়ার কটু গন্ধে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক কয়েকবার কেশে উঠলেন। তারপর মাথা নেড়ে ঠোঁটের কোণে হেসে আবার বলতে শুরু করলেন, 'এবারে আসি ট্যাক্‌টাইল ফিডব্যাকের কথায়...।'

'ট্যাক্‌টাইল ফিডব্যাক?' নিজের অজান্তেই উচ্চারণ করে ফেললাম শব্দ দুটো।

'হ্যাঁ, ট্যাক্‌টাইল ফিডব্যাক। মানে, আমাদের স্পর্শ অনুভূতির যে-খবর মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় তাকেই বলে ট্যাক্‌টাইল ফিডব্যাক। এই খবর পৌঁছনোমাত্রই আমাদের শরীরের ভেতরে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়...।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বলে উঠলাম, 'হিউম্যান কেমিস্ট্রি!'

ভদ্রলোক বেশ জোরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন। আচ্ছা, বলুন তো, কোনও কিছু টাচ করলে কী করে আপনি সেটা টের পান?'

'কেন, চোখে দেখে।' সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলাম আমি।

'উঁহুঁ, হল না। চোখ বুজে টাচ করলে বুঝি টের পান না?'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'হ্যাঁ, পাই।'

'শুধু তাই নয়, চোখ বুজে কোনও জিনিস ছুঁয়ে আপনি অনেক সময় এটাও বলে দিতে পারেন, জিনিসটা কী। যেমন, লোহা ছুঁলে যেরকম অনুভূতি হবে কাঠ ছুঁলে সেরকম হবে না। তেমনই কাচ, কাপড়, কিংবা কোনও মেয়ের নগ্ন শরীর—এসবের স্পর্শ অনুভূতিও একরকম নয়। এক-একরকম স্পর্শ অনুভূতির জন্যে আমাদের শরীরের ভেতরে এক-একরকম বিক্রিয়া হয়। একটা বিক্রিয়ার সঙ্গে আর একটা বিক্রিয়ার কোনও মিল নেই। দাঁড়ান, আপনাকে ব্যাপারটা একটু দেখাই...' বলে ভদ্রলোক চুরুটে জোরালো টান দিয়ে বাঁ-হাতে নিজের ব্রিফকেসটা খুলে ফেললেন। একটা মোটাসোটা ডায়েরি বের করলেন ভেতর থেকে। অতি ব্যবহারে পাতাগুলো সেলাই কেটে খানিকটা করে বেরিয়ে এসেছে। ভদ্রলোক ডায়েরিটা খুলে সাবধানে তার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

আমি অদ্ভুত মানুষটিকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত পাগলের পাল্লায় পড়লাম না কি। হিউম্যান কেমিস্ট্রি, ট্যাক্‌টাইল ফিডব্যাক...আমার কপালের পাশটা দপদপ করছিল।

'এই দেখুন—' বলে ভদ্রলোক খোলা ডায়েরিটা আমার সামনে এগিয়ে দিলেন।

ডায়েরির দুটো পৃষ্ঠা জুড়েই নানারকম রাসায়নিক সংকেত আর সমীকরণ। তবে একটা ব্যাপার ভারি অদ্ভুত মনে হল। কেমিস্ট্রিতে আমার যেটুকু জ্ঞান, তাতে দেখেছি সবরকম রাসায়নিক সমীকরণেই শুধুমাত্র যোগচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভদ্রলোকের ডায়েরির খোলা পাতায় যে-সব সমীকরণ লেখা রয়েছে সে-গুলোতে উনি অকাতরে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন—ঠিক সরল অঙ্কের মতো। এ-আবার কী ধরনের রাসায়নিক সমীকরণ!

ভদ্রলোক শব্দ করে ডায়েরিটা বন্ধ করে রেখে দিলেন ব্রিফকেসের ভেতরে। চুরুটে টান দিয়ে কেবিনের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসব কেমিক্যাল ইক্যুয়েশন আপনি কিছুই বুঝবেন না। কারণ প্রথাগত বিজ্ঞান এখনও এই বিচিত্র বিজ্ঞানের খবর পায়নি। হিউম্যান কেমিস্ট্রির এই বিক্রিয়াগুলো আমার গত ১৮ বছরের গবেষণার ফল।

'যাই হোক, যা বলছিলাম—' ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসে আমার দিকে সরাসরি তাকালেন : 'একটা বিশেষ ধরনের ট্যাক্‌টাইল ফিডব্যাকের জন্যে শরীরের ভেতরে একটা বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। এবার যদি এমন করা যায়, আপনি ছোঁবেন একটা জিনিস অথচ আপনার শরীরের ভেতরে তার জন্যে নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াটি হবে না—হবে অন্য কোনও বিক্রিয়া। যার ফলে আপনার ব্রেন আপনাকে অন্যরকম অনুভূতির খবর দেবে। তা হলে কী হবে বলুন তো?'

'স্পর্শ অনুভূতির ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যাবে।'

'ঠিক তাই। এবার ধরুন, আপনি একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছেন—বা ম্যাগাজিনটা স্রেফ ছুঁয়ে আছেন। অথচ যে-স্পর্শ অনুভূতি আপনার মস্তিষ্কে পৌঁছচ্ছে সেটা কাগজ ছোঁওয়ার নয়—আপনার যেন মনে হচ্ছে, আপনি আপনার প্রিয়তম নারীর নগ্ন শরীর ছুঁয়ে আছেন। তখন কী হবে?'

সারকুলেশান বাড়ানোর সঙ্গে হিউম্যান কেমিস্ট্রির সম্পর্কটা এবারে যেন আমি আঁচ করতে পারছি। তাই ভেতরে-ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম।

ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'কিন্তু আমার চোখ তো দেখবে আমি একটা ম্যাগাজিন ছুঁয়ে আছি! তা হলে—।'

আমাকে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। চোখ যে-ইনফরমেশান ব্রেনে পাঠাবে তার সঙ্গে ট্যাক্‌টাইল ফিডব্যাকের ইনফরমেশান মিলবে না। তখন এই দুটো পরস্পরবিরোধী খবরের মধ্যে যেটা আপনার প্রিয় সেটাই আপনি মেনে নেবেন। এই কারণেই "সুনন্দা" পত্রিকাটা আপনি কখনও কাছ-ছাড়া করতে চান না। ওটা সবসময় আপনার হাতের কাছে রাখতে ইচ্ছে করে।'

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বিমূঢ় চোখে আমার কোলের ওপর রাখা 'সুনন্দা' পত্রিকাটার দিকে তাকালাম। এটাই তা হলে ম্যাগাজিনটার গোপন ম্যাজিক!

'"সুনন্দা"-র ব্যাপারটা আমি ভালো করেই জানি,' ভদ্রলোক তখনও বলে যাচ্ছেন, 'আমি ওদের কনসালট্যান্ট। অবশ্য এটা ওরা সিক্রেট রেখেছে। "সুনন্দা"-র ট্যাক্‌টাইল ফিডব্যাকের রাসায়নিক বিক্রিয়া পালটে দেওয়ার ব্যাপারটা আমার ওই হিউম্যান কেমিস্ট্রির কারিকুরি। জানি, আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যা সত্যি তাই আপনাকে বললাম...বিশ্বাস করা-না-করাটা আপনার ব্যাপার।'

'একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগছে...' একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, 'ট্যাক্‌টাইল ফিডব্যাকের ইনফরমেশানটা আপনি পালটাচ্ছেন কেমন করে?'

ভদ্রলোক আমার দিকে সরাসরি চোখ রেখে মুচকি হাসলেন। চুরুটে গভীর টান

দিলেন। চুরুটের ডগার আগুনটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু সময় নিয়ে তিনি বললেন, 'ট্যাক্টাইল ফিডব্যাক আমি চেঞ্জ করেছি পাইরোনিনিকিঅ্যামিনোথিলিন দিয়ে—।'

'পাইরোনিনিকি...।'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, পাইরোনিনিকি অ্যামিনোথিলিন। প্রথাগত রসায়নশাস্ত্র কখনও এই কেমিক্যালটার নাম শোনেনি। এটা হিউম্যান কেমিস্ট্রির ব্যাপার...আমার ল্যাবরেটরিতে অনেক ঝঞ্ঝাট করে তৈরি। "সুনন্দা" যে কাগজে ছাপা হয় তার মধ্যে এই কেমিক্যাল নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে দেওয়া আছে। এ-ব্যাপারে পেপার মিলের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে। আর যে-কালিটা ওরা ছাপার জন্যে ব্যবহার করে তার মধ্যেও মেশানো আছে ওই পাইরোনিনিকিঅ্যামিনোথিলিন। এটাই হল "সুনন্দা"-র গোপন ম্যাজিক। তাই আপনাকে বলছিলাম, শুধুমাত্র ভালো লেখা, ছাপা, রংচঙ বা দামি কাগজ দিয়ে আড়াই লাখ প্লাস সারকুলেশানে পৌঁছনো যায় না—এর অন্য একটা সিক্রেট আছে। এবার তো সেই সিক্রেট আপনি জেনে গেলেন।'

কথা শেষ করে ভদ্রলোক চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। কৌতুকের নজরে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

শীতের মধ্যেও আমার কপালে বোধহয় ঘাম জমছিল। ভদ্রলোকের এই অবিশ্বাস্য কাহিনি কি বিশ্বাস করা যায়? কিন্তু 'কাজললতা'-র সারকুলেশানের যা অবস্থা তাতে মরিয়া হয়ে কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। আগামী ছ-আট মাসের মধ্যে সারকুলেশান বাড়ানোর কোনও ব্যবস্থা না-করতে পারলে মালিক কলকাতার পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাবেন দিল্লি অথবা মুম্বইতে। সুতরাং ডুবে যাওয়া মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো আমি ভদ্রলোককে অনুনয়ের সুরে বললাম, 'আমাদের ম্যাগাজিনটার একটা হিল্লে করে দিন না। আর কয়েক মাসের মধ্যে যদি ওটার সারকুলেশান না বাড়াতে পারি...।'

ভদ্রলোককে আমার দুরবস্থার কথা খুলে বললাম।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, 'আপনার পজিশনটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তবে আমারও একটা অসুবিধে আছে। "সুনন্দা"-র সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের এগ্রিমেন্ট হয়েছে। সেই কন্ট্রাক্ট পিরিয়ড শেষ হতে এখনও একটা বছর বাকি। আমি একটা ম্যাগাজিনের হয়ে কখনও পাঁচ বছরের বেশি কাজ করি না। কারণ, একটা ম্যাগাজিন চিরকাল সারকুলেশানের টপে থাকতে পারে না—অন্তত থাকা উচিত নয়—সেটাই ন্যাচারাল। সেই অর্থে আমি কখনও নেচারের বিরুদ্ধে যেতে চাই না। সুতরাং আপনার ম্যাগাজিনের সারকুলেশান কনসালট্যান্ট হতে আমার কোনও অসুবিধে নেই—শুধু ওই কন্ট্রাক্টের ব্যাপারটা ছাড়া। একটা বছর আপনাকে ওয়েট করতেই হবে।'

'এক বছর!'

আমার হতাশা দেখে ভদ্রলোক উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'একটা বছর মানে ৩৬৫ দিন। ও দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। তা ছাড়া আমার ফিজের ব্যাপারটা নিয়েও

আপনার মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। আপনি যেভাবে হোক একটা বছর ম্যানেজ করে নিন। তারপর আমি এসে গেলেই দেখবেন ম্যাজিক। তখন আপনার ম্যাগাজিন সোয়াহিলি ভাষাতে ছাপা হলেও ওই পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিনের কৃপায় রমরম করে বিক্রি হবে—।'

খেয়াল করিনি কখন ট্রেনের গতি কমে এসেছিল। আর ভদ্রলোকও কাচের জানলা দিয়ে হঠাৎ একবার উঁকি মেরে আপনমনেই বললেন, 'ও, এসে গেছি।' তারপর চট করে ব্রিফকেস গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছোট্ট একটা হাই তুলে বললেন, 'চলি। যা বললাম, ওই একটা বছর কোনওরকমে ম্যানেজ করে নিন।'

কেবিনের দরজা ঠেলে তিনি করিডরে পা রাখতেই আমি পিছু ডেকে বললাম, 'আপনার অ্যাড্রেসটা?'

ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন আমার দিকে। মুচকি হেসে বললেন, 'অ্যাড্রেসের দরকার নেই। এক বছর পর আমিই আপনার অফিসে ফোন করে কনট্যাক্ট করে নেব। "কাজললতা" তো, আমার মনে থাকবে।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে আমি একা বসে রইলাম।

কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে স্টেশনের নামটা পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কুয়াশা আর টিমটিমে মলিন আলো আমার চেষ্টায় বাদ সাধল।

ট্রেন আবার ছুটতে শুরু করল। আমি 'সুনন্দা' পত্রিকাটা হাতে তুলে নিলাম। তারপর চোখ বুজে 'সুনন্দা'-র পাতায় হাত বোলাতে লাগলাম। মনে হল, একটা অদ্ভুত আমেজ যেন টের পাচ্ছি। পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিন তা হলে মিথ্যে নয়!

একটা বছর সত্যিই দেখতে-দেখতে কেটে গেল। কিন্তু কোনও টেলিফোন এল না আমার অফিসে। তারপর আরও দশটা দিন কেটে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক আমাকে ফোন করেননি।

মালিককে অনেক বলে-কয়ে হাতে-পায়ে ধরে আমি পত্রিকাটা এখনও চালু রেখেছি। ওঁকে বলেছি ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের কথা, পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিনের কথা। তাতে উনি খুব হেসে ব্যাপারটাকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাতে এতটুকুও টলেনি। তাই আমি এখনও মরিয়া হয়ে একটা টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করছি। আমি জানি ফোন আসবেই। কারণ সেই ফোনটার ওপরে প্রায় দেড়শো পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আর 'সুনন্দা'-র পাঠক হিসেবে আপনাকে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ করব। যদি কখনও সেই ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পান, দয়া করে আমাকে টেলিফোন করার কথাটা ওঁকে একবার মনে করিয়ে দেবেন। বলবেন, আমরা সবাই ওঁর মুখ চেয়ে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছি।

আমিও অবশ্য একেবারে হাত গুটিয়ে বসে নেই। দূরপাল্লার ট্রেনগুলোতে—বিশেষ করে রাতের ট্রেনে—খেয়ালখুশিমতো উঠে পড়ছি। ফার্স্ট ক্লাস কামরায় খুঁজে বেড়াচ্ছি

সেই ভদ্রলোককে।

আমি জানি, একদিন-না-একদিন ওঁকে আমি খুঁজে পাবই। যে করে হোক খুঁজে আমাকে পেতেই হবে।

গল্পটা শেষ করে আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। হাত-পা কাঁপতে লাগল। কপালের কাছটায় একটা অদ্ভুত ব্যথা শুরু হয়ে গেল।

এমন সময় চমকে উঠে খেয়াল করলাম, ট্রেনের গতি কমতে শুরু করেছে। বোধহয় সামনে কোনও স্টেশন আসছে।

কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক ব্রিফকেস গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাচের জানলা দিয়ে বাইরে একবার উঁকি মেরে বললেন, 'চলি, আমার স্টেশন এসে গেছে—।'

আমি তখন মরিয়া হয়ে ওঁকে বললাম আমার ম্যাগাজিনের কথা।

তাড়াহুড়ো করে বলতে গিয়ে অনেক কথা জড়িয়ে গেল। কিন্তু ভদ্রলোক আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে মসৃণ হেসে হাত নেড়ে বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই। সব বুঝতে পেরেছি। পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিনের ব্যাপার তো! আসলে আমার সঙ্গে "সুনন্দা"-র কন্ট্রাক্ট শেষ হতে এখনও এক বছর বাকি। এই একটা বছর কোনওরকমে ম্যানেজ করে নিন, তারপর...।'

'আপনার অ্যাড্রেস বা ফোন নাম্বার যদি দেন—।'

ভদ্রলোক কেবিনের দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। মুচকি হেসে বললেন, 'ওসবের দরকার নেই। এক বছর পর আমিই আপনার অফিসে ফোন করে কনট্যাক্ট করে নেব। "চারুলতা" তো, আমার মনে থাকবে।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে শুধু চুরুটের গন্ধ ভেসে রইল।

তারপর এক বছর কেটে গেছে, কিন্তু আমার অফিসে কোনও ফোন আসেনি। বছর পেরিয়ে আরও দশদিন কেটে গেছে, কিন্তু ওই কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেননি।

তবে আমি কিন্তু এখনও হাল ছাড়িনি। মরিয়া হয়ে একটা টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করছি। আর দূরপাল্লার ট্রেনগুলোতে—বিশেষ করে রাতের ট্রেনে—খেয়ালখুশিমতো উঠে পড়ে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই ভদ্রলোককে।

আমি জানি, একদিন-না-একদিন ওঁকে আমি খুঁজে পাবই। যে করে হোক খুঁজে আমাকে পেতেই হবে।

আর 'সুনন্দা'-র পাঠক হিসেবে আপনাকেও একান্ত অনুরোধ, যদিও কখনও সেই ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পান, দয়া করে আমাকে টেলিফোন করার কথাটা ওঁকে একবার মনে করিয়ে দেবেন। বলবেন, দেড়শোটা পরিবার ওঁর মুখ চেয়ে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছে।

জঙ্গলে, চাঁদের আলোয়

মানুষ-নেকড়ে, অথবা নেকড়ে-মানুষ—ওরা যখন-তখন চেহারা পালটে ফেলতে পারে। এটাই ওদের ছদ্মবেশ। তবে ওদের চোখের তারায় থেকে যায় হিংস্র দ্যুতি আর ওত-পেতে-থাকা অপেক্ষার ছাপ। সবাই সে-দ্যুতি চিনতে পারে না। যারা পারে তারা পারে। রাতের আকাশে চাঁদ ওদের আরও ক্ষুধার্ত, আরও উতলা করে তোলে। তখন ওরা ভদ্র-সভ্য ছদ্মবেশের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়...পাগলের মতো নাচে...এই কাহিনির মতো।

শেষ কবে যে মানুষের স্বাদ পেয়েছি তা প্রায় ভুলেই গেছি। তা ছাড়া গ্রামের একেবারে শেষে মাঠঘাট পেরিয়ে কোনও মানুষ কখনও এই পুরোনো বাড়িটায় আসে!

প্রায় মাসখানেক আগে, ঝাপসাভাবে মনে পড়ছে, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে এসেছিল গুঁড়ো সাবান বিক্রি করতে। তখন সন্ধে হয়-হয়। শিবনাথ বুদ্ধি দিল ওদের চা-জলখাবার দিয়ে আটকে রাখতে। তারপর সন্ধে একটু বাড়তেই আমরা চারজন ওদের দিয়ে জলখাবার সেরে নিলাম। শিবনাথ পাগলের মতো খাচ্ছিল। ওর আবার খিদে একটু বেশি—আর অপেক্ষা করার ধৈর্যও বড় কম।

বাড়িটায় আমরা চারজন আস্তানা গেড়েছি। আমি, শিবনাথ, রমা আর বিনোদ। তার আগে, টিলার ওপাশে, আমি আর শিবনাথ জোড় বেঁধে বেশ ছিলাম। একদিন রাতে, পুকুরে জল খেতে গিয়ে রমা আর বিনোদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়। ওরা দুজন খুশিমতন চেহারা পালটাচ্ছিল আর এ ওর ঘাড় কামড়ে ধরছিল, ফষ্টিনষ্টি করছিল।

আমরা ওদের চিনতে পেরেছিলাম, ওরাও আমাদের চিনতে পেরেছিল। তারপর থেকে আস্তানা খুঁজতে-খুঁজতে শেষে এই খাঁ-খাঁ করা পুরোনো বাড়িটায়। খিদে পেলে খাবার খুঁজতে চলে যাই টিলার ওপাশে, জঙ্গলে—অথবা, নদীর কিনারায় ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকরে।

এমনিতে মানুষ সেজে থাকতে আমাদের খারাপ লাগে না। লোকজনের সঙ্গে একটু-আধটু মিশে, ভাত-ডাল-পাঁউরুটি-বিস্কুট খেয়ে দিন কেটে যায়। কিন্তু মাঝে-মাঝেই ভেতরের লুকোনো জন্তুটা অস্থির হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন পাগলের মতো লাগে। রক্তের নেশাটা ভুলে থাকার জন্যে শিবনাথ তখন আমার ঘাড় কামড়ে আমাকে পেছন থেকে খাঁকড়ে ধরে। ওই খিদে-তেষ্টার মধ্যেও বেশ টের পাই আমি আসলে রমণী।

এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে শিবনাথ আজ আবার ওর পুরোনো পথ বেছে নিয়েছে। আমাকে ঘরের কোণে কোণঠাসা করে পেছন থেকে খাঁকড়ে ধরেছে

প্রাণপণে। আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিনোদ তেষ্টার চোখে আমাদের দেখছে। রমা আশেপাশে নেই—বাইরে কোথায় খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে।

এমনসময় দরজায় কেউ নড়া নাড়ল, সেইসঙ্গে স্পষ্ট চিৎকার : 'মাসিমা, মাসিমা!'

রাত প্রায় আটটা বাজে। কে ডাকতে এল এই অসময়ে?

শিবনাথ তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়ে ষাট-পেরোনো মোটাসোটা টাক মাথা এক প্রৌঢ়ের চেহারা নিল। বিনোদ সেজে গেল তার পঞ্চাশ-বাহান্নর গিন্নি। মুখে একগাল হাসি, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ, পরনে লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি।

আমি হাঁফাতে-হাঁফাতে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। চট করে হয়ে গেলাম বছর কুড়ির সুন্দরী তরুণী, সতেজ ফুলের মতো ফুটফুটে। শিবনাথ আমার এই চেহারাটা বেশি পছন্দ করে। কিন্তু উত্তেজনার সময়, মনের স্বাভাবিক আবেগগুলো যখন স্বাধীন হয়ে পড়ে, তখন আর ছদ্মবেশটা ঠিকঠাক ধরে রাখা যায় না।

ঠিক সেইসময় রমা পেছনের খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল। ওর গায়ে কেমন একটা আঁশটে গন্ধ।

আমাদের দেখেই ও বুঝতে পারল কী করতে হবে।

বাইরে থেকে আবার ডাক এল : 'মাসিমা, দরজা খুলুন—।'

রমা পালটে গেল। ও হয়ে গেল আমার ছোট ভাই। বয়েস বারো বছর, গোলগাল ফরসা চেহারা—অল্পেতেই অভিমান করে ঠোঁট ফোলায়।

আমরা চারজনে এখন সুখী পরিবার।

বিনোদ এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলল।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দুজন যুবক। একজনের হাতে দুটো ভারি ব্যাগ। আর-একজন বোধহয় এই এলাকারই ছেলে। মুখটা চেনা-চেনা।

বিনোদকে দেখে ছেলেটি বেশ আশা নিয়ে বলল, 'মাসিমা, একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট ছিল। মানে—' সঙ্গের ব্যাগওয়ালা যুবককে দেখিয়ে সে একটু ইতস্তত করে বলল, 'এর নাম জিতেন দাস। চালাবাজারের মাঠে আজ রাত থেকে যাত্রা আছে। এ ইলেকট্রিকের লাইন করতে এসেছিল। ফেরার সময় ইস্টিশানে গিয়ে দেখে কেস জন্ডিস—লাস্ট ট্রেন মিস। তা রাতটা কোথায় এস্টে করাব...আমাদের তো জায়গা-ফায়গা নেই। তার ওপর বৃষ্টি হলেই কেস ক্যাচাল। তো লালটু বলল, আপনাদের বাড়িতে হেভি জায়গা আছে—মানে, রাতে এস্টে করা যায়। তাই একে নিয়ে এলাম—শুধু আজকের রাতটা একটু শেলটার দিন। কাল ভোরেই এ চলে যাবে...।'

বিনোদের উত্তর দিতে একটু দেরি হল। কারণ, সব শুনে, আর ওদের শরীরের লোভনীয় গন্ধে ওর কথা বোধহয় জড়িয়ে যেতে চাইছিল।

শিবনাথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দরজার কাছে। গলাখাঁকারি দিয়ে বিনোদকে সামান্য পাশে ঠেলে দিয়ে বলল, 'নো প্রবলেম—তুমি শুধু আজ রাতটা কেন, দু-চারদিনও থেকে যেতে পারো আমাদের সঙ্গে।'

বিনোদ সাত-তাড়াতাড়ি সায় দিল 'স্বামী'-র কথায় : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। তুমি অনায়াসে থাকতে পারো। "তুমি" বললাম বলে কিছু মনে করলে না তো!'

অভিনয়ের ব্যাপারে বিনোদ একেবারে জিনিয়াস। ওর শেষ কথাটার আগাপাস্তলায় মাতৃস্নেহ একেবারে উপলে উঠছিল।

সুতরাং ওর ভারি-ভারি ব্যাগসমেত জিতেন দাস ঢুকে পড়ল আমাদের বাড়িতে। ওর সঙ্গী ছেলেটি 'থ্যাঙ্ক য়্যু মাসিমা' বলে এক কাঁধ বেঁকিয়ে হাঁটা দিল যাত্রার আসরের দিকে।

বিনোদ আমাকে ডেকে বলল, 'রিনি, জিতেনকে ওর ঘরটা দেখিয়ে দে—' তারপর জিতেনকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি বাবা হাত-মুখ ধুয়ে নাও। ইচ্ছে হলে স্নানও করতে পারো। আর রাতে আমাদের সঙ্গে দুটি খেয়ে নিয়ো।'

জিতেন বিব্রতভাবে বলল, 'না, না, মাসিমা, আমি রাতে কিছু খাব না—খেয়ে এসেছি—।'

'সে পরে দেখা যাবে'খন।'

আমি জিতেনের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও কি আমার ফেরোমোনের গন্ধ পাচ্ছে? আমি কিন্তু অন্যরকম একটা গন্ধ পাচ্ছি।

আমি জিতেনকে দেখছিলাম।

ছিপছিপে ফরসা চেহারা। তবে পাতলা হাওয়াই শার্টের নীচে শক্তিশালী পেশি টের পাওয়া যায়। গাল সামান্য ভাঙা। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। চোখ টানা-টানা। সারাটা মুখে কেমন এক মমতা মাখানো।

আমি অদ্ভুত এক আকর্ষণ টের পাচ্ছিলাম। অথচ আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, শিবনাথ আর রমার ঠোঁটের কোণে লালা গড়াচ্ছে।

আমি তাড়াতাড়ি জিতেনকে নিয়ে ভেতরে চলে যেতে চাইলাম। ওরা কি আজ রাতেই ওকে শেষ করে দেবে?

'আমার সঙ্গে আসুন—' জিতেনকে নরম গলায় ডেকে নিলাম।

ও লাজুক মুখে আমাকে অনুসরণ করল। একবার শুধু বলল, 'আপনারা খুব ভালো। নইলে অচেনা-অজানা লোককে কে আর থাকতে দেয়...।'

ওর কথায় আমার নবীন সমাজদারের কথা মনে পড়ে গেল।

নবীন সমাজদার স্কুল-মাস্টার ছিল। গত বছর বর্ষার সময় এক দুর্যোগের রাতে আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে-ও ঠিক এই কথাই বলেছিল, 'আপনারা খুব ভালো লোক—' আর সেই রাতেই আমরা ওকে খতম করেছিলাম।

সাধারণত কোনও শিকারকে খতম করার আগে তাকে ঘিরে আমরা পাগলের মতো নাচি। তখন ভয়ে-আতঙ্কে তার চিৎকার করার মতো অবস্থাও থাকে না। কিন্তু নবীন মাস্টার হঠাৎই এক চিৎকার দিয়ে উঠেছিল। তখন শিবনাথ আর রমা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারপর সব শেষ।

তার কিছুদিন পরে কী করে যেন নবীন মাস্টারের বউ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। মেয়েটার সে-কী বুকফাটা কান্না। সে-কান্নার মানে আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি।

বউটাকে তো কোনওরকমে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরই এল পুলিশ আর ইনসিওরেন্স কোম্পানির লোক। আমাদের নানাভাবে জেরা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি। ভেডবডির কোনওরকম চিহ্ন না-পাওয়াতে ওরা বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল। সন্দেহের হাত থেকে আমরা একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছিলাম। কে জানে, পুলিশ এখনও ব্যাপারটা নিয়ে লেগে রয়েছে কি না!

আজও ঠিক এই কথাটাই বলল জিতেন, 'আপনারা খুব ভালো।'

জিতেনকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে বসবার ঘরে ফিরে এলাম। সেখানে তখন আমার 'মা', 'বাপি' আর 'ভাই' জিতেনকে নিয়ে আলোচনায় মশগুল।

রমা ওর গোলগাল বাচ্চা-বাচ্চা মুখ নিয়ে একেবারে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। বারবার শুধু বলছে, 'আমি আর ওয়েট করতে পারছি না...।'

ও যে আর অপেক্ষা করতে পারছে না সেটা ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ও কিছুতেই ওর ছদ্মবেশ ধরে রাখতে পারছে না। থেকে-থেকেই ওর চোয়ালটা লম্বা হয়ে সামনে এগিয়ে আসছে, হাত-পায়ের লোম বড়-বড় হয়ে যাচ্ছে, কথাগুলো জড়িয়ে গিয়ে চাপা-জান্তব গর্জন বেরিয়ে আসছে, আর ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে।

শিবনাথের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। ছদ্মবেশটাকে কোনওরকমে সামলে রেখে ও বলল, 'রিনি, চেয়ার-টেবিলগুলো সরিয়ে ঘরটা ফাঁকা করে দাও। তারপর ও এলেই আলোগুলো নিভিয়ে দেবে...।'

তা হলে জিতেন এ-ঘরে আসামাত্রই শুরু হবে আমাদের কাজ। কিছুতেই কি আর দু-চারটে দিন আমরা অপেক্ষা করতে পারি না? জিতেনকে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। ওর চেহারায় এমন নিষ্পাপ একটা ব্যাপার আছে যে, আমার সেই বালিকা বয়েসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সুবীরদার কথা মনে পড়ছে। ওকে দেখলেই আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠত। সুবীরদা আমেরিকায় পড়াশোনা করতে চলে গেছে। কত বছর আগের কথা, তবুও মনে হয় এই তো সেদিন! বিদেশ যাওয়ার আগে একদিন আমি সুবীরদার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সেদিন লোডশেডিং ছিল, বাড়িতে আর কাউকে চোখে পড়েনি। সুবীরদা কখনও আমাকে আশকারা দেয়নি, কিন্তু আমার কী যে হয়েছিল! সেইদিন সুবীরদা আমাকে নিয়ে যা-খুশি করতে পারত। আমিও মনে-মনে সেটাই চেয়েছিলাম। কিন্তু সুবীরদা আমাকে বকুনি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, জীবন এত সহজ-সরল নয়।

আমি সেদিন সে-কথার মানে বুঝিনি। পরে, নিজের জীবনটা যখন হাতের বাইরে চলে গেল, অনেক জটিল হয়ে গেল, তখন বোধহয় খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম।

কিন্তু আজ, জিতেনকে দেখার পর থেকে, আমার নিজের কেমন অন্যরকম লাগছে।

আমার ছদ্মবেশটা ঠিকঠাক রেখে সিরিয়াস গলায় ওদের বললাম, 'আজ রাতেই কিছু করাটা ঠিক হবে না। নবীন সমাজদারের ব্যাপারটা কি তোমরা এত সহজে ভুলে গেলে! পুলিশ হয়তো কেসটা নিয়ে এখনও লেগে আছে। কে জানে, জিতেনকে ওরা টোপ হিসেবে এখানে পাঠিয়েছে কি না!'

'তা হলে তোমার কী মত?' বিনোদ জানতে চাইল।

'আমার ইচ্ছে দু-চারদিন অপেক্ষা করা—।'

শিবনাথ ওর ছদ্মবেশের ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'দু-চারদিন কেন, একটা দিন ওয়েট করলেই তো হয়!'

সমর্থনের আশায় ও বাকি দুজনের দিকে তাকাল।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'না! তাড়াহুড়ো করলে চলবে না...।'

এমনসময় পায়ের শব্দ পেলাম।

চমকে ঘুরে তাকিয়ে দেখি জিতেন দাস আসছে। এরই মধ্যে ও স্নান-টান সেরে পরিপাটি। মুখটা এখন আরও বেশি ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ লাগছে।

সুখী পরিবার একজন অতিথিকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানায় সেভাবেই আমরা জিতেনকে খাওয়ার টেবিলে সাদরে আমন্ত্রণ জানালাম।

'মা' গরম ভাত, মুগের ডাল, মোচার ঘণ্ট আর মুরগির মাংস সাজিয়ে রাখল খাওয়ার টেবিলে। তারপর আমাদের পরিবেশন করতে লাগল। মুরগির ঠ্যাং রমার খুব প্রিয়। মানে, মুরগি হোক আর যা-ই হোক, ঠ্যাং হলেই হল। ও বারবার বায়না করছিল।

'বাপি' জিতেনকে বলল, 'লজ্জা করে খেয়ো না। ঘরের ছেলের মতো চেয়ে-চেয়ে খাও।'

আমি বললাম, 'বাপি, আমাদের বাড়ির ওয়্যারিংগুলো তো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। জিতেনবাবুকে যখন হাতে পেয়েছি তখন ওগুলো পালটে ঠিকঠাক করে নিলেই তো হয়।'

'মা', 'বাপি', আর 'ভাই' সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাল। ইলেকট্রিকের ওয়্যারিং বদলানোর নাম করে আমি কি জিতেনকে বেশ কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে চাইছি?

শিবনাথ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'তা ঠিকঠাক করে নিলেই হয়। কিন্তু ওর কি সময় হবে?...ব্যস্ত মানুষ, কাজের মানুষ...কাল ভোরেই চলে যাবে বলছে...।'

আমি উজ্জ্বল চোখে জিতেনের দিকে তাকালাম।

লাজুক ছেলেটা আমার দিকে আড়চোখে দেখল, তারপর বলল, 'না, না—ব্যস্ত আর কীসে—এটাই তো আমার কাজ। তা হলে কাল সকালে বাড়িতে একটা এস. টি. ডি. করে দেব। তারপর গোটা বাড়ির ওয়্যারিংগুলো একবার ভালো করে টেস্ট করে নেব। যদি কেউ সঙ্গে থেকে একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দেয়...' আমার দিকে আবার তাকাল জিতেন। তারপর : 'তারপর একটা এস্টিমেট দিয়ে কাজ শুরু করে দেব।'

জিতেনের তাকানোর ব্যাপারটা ওরা তিনজনেই খেয়াল করেছিল। 'মা' তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কোনও চিন্তা নেই। রিনিই তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে। ও এসব একটু আধটু বোঝে—ফিউজ হয়ে গেলে ও-ই ফিউজ তার পালটে ঠিক করে দেয়—।'

জিতেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমিও অপ্রস্তুত হাসলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে জিতেন নিজের ঘরে শুতে চলে গেল। আমি ওকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'ভোর সাড়ে ছটায় চায়ের কাপ নিয়ে গিয়ে আমি আপনার ঘুম ভাঙাব। সাড়ে ছটায় ঘুম থেকে ওঠেন তো?'

ও অদ্ভুতভাবে হাসল, বলল, 'এমনিতে উঠি না—তবে আপনি ডাকলেই উঠে পড়ব।'

যখন আবার খাওয়ার ঘরে ফিরে এলাম তখন 'মা' টেবিল পরিষ্কার করে গুছিয়ে ফেলেছে, 'বাপি' খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে, আর 'ভাই' মুখ গোঁজ করে বসে আছে।

আমাকে দেখেই 'ভাই'—মানে, রমা—একেবারে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল : 'ভেবেছিস ওকে একা খাবি? সেটা কিছুতেই হতে দিচ্ছি না।'

'আমার ওকে খাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই।'

'তা হলে তোমার মতলবটা কী? ওকে এরকম আগলে-আগলে রাখছ কেন?' প্রশ্নটা করেছে শিবনাথ। ওর খিদে রমার চেয়ে কিছু কম নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'জিতেনকে তোমরা যা করার কোরো। তার আগে আমি শুধু একবার ওকে চেখে দেখতে চাই...।'

'তার মানে?' 'মা' বিনোদ অবাক হয়ে জানতে চাইল।

আমি হেসে বললাম, 'ওর গায়ে আমি অন্যরকম একটা গন্ধ পেয়েছি। আমার পুরোনো সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে খুব ইয়ে করতে ইচ্ছে করছে।'

রমা একইরকম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'মানুষের সঙ্গে আমাদের আবার ইয়ে কী! এমন ইচ্ছে তো আমাদের কখনও হয় না! আসলে তুই ওকে একা খাওয়ার প্ল্যান করেছিস—।'

কথা বলার সময় রমার চোয়াল লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, হাত-পায়ের নখ বেরিয়ে আসছিল, শরীর লোমশ হয়ে উঠছিল।

আমি শান্তভাবে বললাম, 'আমার ওসব কোনও প্ল্যান নেই। জিতেন আমাকে পুরোনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আমি ওকে একবার চেখে দেখতে চাই...।'

আমার গলায় এমন কিছু একটা ছিল যে, ওরা তিনজন চুপ করে গেল।

একটু পরে 'মা' রমাকে বলল, 'তুই আর-একটু চিকেন কারি খাবি? এখনও অনেকটা আছে—।'

রমা একই ভঙ্গিতে বলল, 'চিকেন কারি না—আমি জিতেন কারি খাব।'

এ-কথা শুনে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম বাইরে।

মাঝরাত থেকেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছিল।

এমনিতেই রাতে আমাদের ভালো করে ঘুম আসে না, তার ওপর বৃষ্টি আর জিতেন আমাদের জাগিয়ে রাখল।

একসময় জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনই গাছপালা আর বৃষ্টির আড়াল ভেদ করে শিবনাথ আর রমাকে দেখতে পেলাম। ওরা বোধহয় শিকার ধরতে বেরোচ্ছে।

অন্ধকারে আমাদের দেখতে অসুবিধে হয় না। তাই ওরাও আমাকে দেখতে পেল। চাপা গর্জন করে শিবনাথ একবার আমাকে ডাকল। আমি সাড়া দিলাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিতেনের কথা ভাবতে লাগলাম। ওর জন্যে কেন যে এমন অদ্ভুত টান টের পাচ্ছি কে জানে! আমি জানি এটা ভালোবাসা নয়। কারণ, আমাদের মধ্যে ভালোবাসা, মমতা, ঈর্ষা—এইসব মানবিক বোধ নেই। এককালে যে ছিল সেটাই কোন যুগে ভুলে গেছি।

চোখের সামনে বৃষ্টি নিয়ে নিজেকে ঘৃণা করতে চাইলাম। যদি আমি জিতেনের মতো সুস্থ-স্বাভাবিক থাকতাম তা হলে কত ভালো হত! কিন্তু বহুবছর আগে রাতের ট্রেনে আমি পালটে গিয়েছিলাম মানুষ থেকে অমানুষে।

কলকাতা থেকে পুরুলিয়ায় মাসির বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিলাম। রাত বারোটার পরই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল—বাঙ্কে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মাঝরাতে হঠাৎই একটা অদ্ভুত যন্ত্রণায় ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই সামনে একরাশ অন্ধকার।

ট্রেন মাতালের মতো ছুটছে। চাকায় শব্দ উঠছে ঝমাঝম।

তখনই খেয়াল করলাম, অন্ধকারের মধ্যে দুটো আলোর বিন্দু—ক্ষুধার্ত, হিংস্র, পাশবিক।

চিৎকার করতে গিয়ে আমি চিৎকার করতে পারিনি। কোনওরকমে সামনে হাত বাড়িয়েছিলাম। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, আমি ছুঁয়ে ফেলেছিলাম লোমশ এক শরীর।

পরক্ষণেই সব ঝাপসা হয়ে এসেছিল। আলোর বিন্দু দুটো সরে গিয়েছিল চোখের সামনে থেকে।

একটু পরেই আমার চেতনা ফিরে এসেছিল। কিন্তু এ কোন নতুন চেতনা—যা মানুষের চেতনার থেকে শতযোজন দূরের!

মাসির বাড়ি আমার আর যাওয়া হয়নি। রাতের অন্ধকারে কোন একটা স্টেশনে যেন আমি নেমে পড়েছিলাম। তারপর হারিয়ে গেছি অন্য জগতে। চিরকালের জন্যে।

ওই পশুটাকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ঘেন্না করি। তেমনি ঘেন্না করি নিজেকেও। শিবনাথ, রমা, বিনোদকেও। কিন্তু আমার শরীরটা ওদের মতো বলে ওদের পছন্দের কাজ আমাকে করতে হয়। আমার মনটা যে পুরোপুরি এখনও ওদের মতো হয়ে ওঠেনি সেটা বেশ বুঝতে পারি।

একটা চাপা গর্জন কানে এল। চমকে উঠে দেখি শিবনাথ আর রমা ফিরে এসেছে। অন্ধকারে ওদের চোখ জ্বলছে।

আর তখনই খেয়াল করলাম, আমার সারা গায়ে বড়-বড় কুৎসিত লোম, আর চোয়ালটাও নেকড়ের মতো লম্বা হয়ে গেছে।

আমি এ-ঘর থেকেই জিতেনের গন্ধ পাচ্ছিলাম—অন্যরকম গন্ধ। সেই গন্ধে পাগল হয়ে বাকি রাতটুকু ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করে কাটিয়ে দিলাম।

ভোর হতেই টের পেলাম খিদেয় আমার পেট জ্বলছে। তাই ছদ্মবেশ ধরে চলে গেলাম বাড়ির বাইরে।

বৃষ্টি এখন আর নেই। তবে এখানে-ওখানে জল জমে আছে। গাছের পাতায়, ঘাসে, জলের ফোঁটা।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে টিলার ওপারে চলে গেলাম। কিছুক্ষণের চেষ্টায় একটা বনবেড়ালকে দেখতে পেলাম। ওটাকে তাড়া করে শেষ পর্যন্ত একটা পাথরের খাঁজে কোণঠাসা করে ফেললাম। বনবেড়ালটা মরিয়া হয়ে থাবা বাগিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। আমি থাবা দিয়ে সপাটে এক থাপ্পড় কষাতেই ওটা ঘাড় মটকে ছিটকে পড়ল মাটিতে।

ভোরের প্রথম আলোয় খিদে মিটিয়ে নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরে এলাম, জিতেন তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছে।

আমাকে দেখেই ও জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, মর্নিংওয়াকে গিয়েছিলেন বুঝি?'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কাল আমাকে নিয়ে যাবেন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

জিতেন গলা বাড়িয়ে থুতু ফেলল ঘাসের ওপর। তারপর বলল, 'সাড়ে ছ'টায় আমাকে ডাকবেন বলেছিলেন—দেখুন, তার আগেই আমি উঠে পড়েছি।'

খিদের চোটে ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। চমকে হাতঘড়ি দেখলাম : সবে সাড়ে ছ'টা বাজে।

জিতেন আড়চোখে আমার বুকের দিকে দেখছিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জা পেয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

আমি বললাম, 'আপনার চা-বিস্কুট নিয়ে আসছি—।'

'হ্যাঁ, চা-টা খেয়েই ফোন করতে বেরোব। তারপর এসে ওয়্যারিংগুলো চেক করতে শুরু করব।' একটু থেমে আমাকে দেখে নিয়ে : 'আপনি আমার সঙ্গে থেকে হেল্প করবেন কিন্তু—।'

আমি ওর গন্ধ পাচ্ছিলাম। শরীরটা কেমন অবশ লাগছিল। ছদ্মবেশ ধরে থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

ওর কথার উত্তরে ছোট্ট করে বললাম, 'হ্যাঁ।'

তারপর ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতরে।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখি 'মা' উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে। জিগ্যেস করে

জানলাম 'বাপি' আর 'ভাই' এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

সারাটা দিন আমার জিতেনের সঙ্গে কাটল।

ও প্রত্যেকটা ঘরের ওয়্যারিং টেস্ট করে দেখছিল, আর আমি পাশে-পাশে থেকে ওকে সাহায্য করছিলাম।

ভাঁড়ার ঘরের ওয়্যারিং টেস্ট করতে-করতে জিতেন বলল, 'ম্যাডাম, আপনাদের ওয়্যারিং-এর আর কিছু নেই। তারের রবারগুলো একেবারে নরম হয়ে গেছে। সব চেঞ্জ করে দিলে ভালো হয়—।'

আমি বললাম, 'আমার নাম ম্যাডাম নয়—রিনি। তা ছাড়া আমি আপনার চেয়ে বেশ ছোট।'

'দশ ঘণ্টার আলাপে নাম ধরে ডাকব?' হাসল জিতেন : 'তাতে আর কেউ কিছু মনে করতে পারে...।'

'আমার বাপি-মা খুব ভালো। ওরা কিচ্ছু মনে করবে না।'

জিতেন একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে ওয়্যারিং দেখছিল। হঠাৎই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের বাড়িটা বেশ পুরোনো—বোধহয় ব্রিটিশ আমলের। কিন্তু তোমরা বেশ মডার্ন—মানে, ডাইনিং-টেবিল, টিভি এইসব আর কী।' একটু চুপ করে থেকে তারপর : 'তোমরা এ-বাড়িতে ক'বছর আছ?'

আমি ভয় পেলাম। কী করে বলব, একটা পড়ে-থাকা-বাড়ি আমরা জবরদস্তি করে দখল করেছি! আমাদের কথাবার্তা, চালচলন যে এই বাড়ির চেহারার সঙ্গে খাপ খায় না সেটা ও এই অল্প সময়েই টের পেয়েছে। ভাগ্যিস রমা, বিনোদ, শিবনাথরা এখন আশেপাশে নেই! থাকলে হয়তো বলত, 'দেরি করে কোনও লাভ নেই। আজ রাতেই...।'

আমি কোনওরকমে একটা গল্প বানিয়ে ওকে বললাম। আমার 'বাপি'র এব জ্যাঠামশাই বছরচারেক আগে মারা যান। তিনি বিয়ে-থা করেননি। তাই এই বাড়ি, বাগান, আর ছ'বিঘে ধান জমি 'বাপিকে' দিয়ে গেছেন। 'বাপি' রিটায়ার করার পর আমরা কলকাতা ছেড়ে এখানে চলে এসেছি।

জিতেন হঠাৎই টুলটার ওপরে বসে পড়ল, বলল, 'রিনি, একটানা কাজ করতে ভালো লাগছে না। এসো, দু-মিনিট গল্প করি।'

জিতেন ওর নানা কথা বলছিল। আমি স্বপ্ন দেখার মতো ওকে দেখছিলাম, ওর কথা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে শুনছিলাম।

কলকাতায় গড়িয়াতে ওর বাড়ি। বাড়ি মানে ভাড়া করা একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। সেখানে ওর বুড়ি মা আছে, আর আছে ছোট দু-বোন—ঝুমপা আর টুমপা। ওর বড়দা কেশব ভালো চাকরি করত। কিন্তু বছরদশেক আগে ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে। বাবা রিটায়ার করার পর হার্টের অসুখে মারা যান। মাত্র একবছরের মধ্যে

দুজনেই চলে গেছে। তারপর থেকে জিতেন একা সংসারের হাল ধরেছে। ছোট্ট একটা ইলেকট্রিকের দোকান আছে ওর। সেটাকে আঁকড়ে ধরেই অভাবের সঙ্গে ওর লড়াই। ওর খুব সাধ ভালো ঘরে দু-বোনের বিয়ে দেবে। তারপর ও নিজের বিয়ের কথা ভাববে—যদি অবশ্য তখনও ওর বিয়ের বয়েস থাকে।

জিতেনকে দেখে আমার বুকের ভেতরে অদ্ভুত এক কষ্ট হচ্ছিল। ওর মধ্যে এত আকাঙ্ক্ষা, এত স্বপ্ন...অথচ...।

ভাবলাম, ওকে বলি, 'তুমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাও—' কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। শিবনাথরা সহজে ওকে ছাড়বে না। ওকে তাড়া করবে। দরকার মতো ছদ্মবেশ পালটে-পালটে ওকে অনুসরণ করবে। তারপর প্রথম সুযোগেই ওকে খতম করবে।

আমার ভীষণ মনখারাপ লাগছিল—সুধীরদা আমেরিকা চলে যাওয়ার সময় যেরকম মনখারাপ লেগেছিল।

কথা বলতে-বলতে জিতেন কতবার যে বলল, 'রিনি, তোমরা খুব ভালো। কত সহজে অচেনা লোককে আপন করে নাও।'

জিতেন আমাকে নানা কথা জিগ্যেস করছিল। 'বাপি' কোথায় চাকরি করত, 'ভাই' কোন স্কুলে পড়ে, আমি কলকাতার কোন স্কুলে পড়তাম, কোন কলেজে পড়তাম, লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম কেন, কলকাতার কোথায় আমরা থাকতাম, আমাদের আত্মীয়স্বজন কোথায়-কোথায় থাকে—এরকম আরও কত প্রশ্ন।

আমি ওর প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিচ্ছিলাম। ঠিকমতো গল্প বানাতে না-পারলে পাশ কাটানো জবাব দিচ্ছিলাম।

আমরা যখন 'বাপির' শোওয়ার ঘরের লাইন টেস্ট করছি তখন শিবনাথ কোথা থেকে এসে ঘরে ঢুকল। ওর হাতে সিগারেট। গলাখাঁকারি দিয়ে ও বলল, 'আজ বাজার থেকে বড়-বড় পাবদা মাছ নিয়ে এসেছি। বলেছি পাবদা মাছের ঝাল রান্না করতে। জিতেন, তুমি পাবদা মাছ খাও তো?'

জিতেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে 'হ্যাঁ' বলল।

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল রমা। 'বাপি'কে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, 'বাপি', পাবদা মাছের ঝালের নাম শুনে আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে।'

'বাপি' রমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'খাবি, খাবি—সময় হোক, খাবি—'

কথাটা বলার সময় 'বাপি' জিতেনের দিকে তাকিয়ে ছিল, যাতে আমি অন্তত তার কথার ঠিকঠাক মানে বুঝি।

রমা বলল, 'আমি আর ওয়েট করতে পারছি না—গন্ধে আমি পাগল হয়ে যাব।'

রমা একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ছদ্মবেশ ধরে থাকতে রমার এখন কষ্ট হচ্ছে। তাই জিতেনের সামনে থেকে ও পালাল।

এরপর শিবনাথ জিতেনের সঙ্গে ওয়্যারিং নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। জিতেন কাগজ-পেন বের করে 'বাপি'কে কী-সব হিসেব বোঝাতে লাগল।

একটু পরে 'বাপি' চলে যেতেই জিতেন আবার ওর কাজ শুরু করল, আর আমিও ওকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলাম।

কাজ করতে-করতে যখন বেলা একটা বাজল তখন আমি জিতেনকে স্নান করতে যাওয়ার তাড়া দিলাম।

ও আমার দিকে কেমন একটা চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'খেয়েদেয়ে আবার শুরু করব, কেমন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

আমি ক্লান্ত পায়ে বসবার ঘরে আসতেই ওরা তিনজন আমাকে ছেঁকে ধরল।

রমা হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর সাধ মিটেছে? আমরা আর ওয়েট করতে পারছি না।'

শিবনাথ বলল, 'শুধু-শুধু দেরি করেই-বা লাভ কী! আজ রাতেই তো সেরে ফেললে হয়...' ও সমর্থনের আশায় বিনোদের দিকে তাকাল।

বিনোদের গায়ে পলকের জন্যে বড়-বড় লোম দেখা গেল, তারপরই আবার ও গিন্নিবান্নি চেহারার 'মা' হয়ে গেল। ও মেয়েলি গলায় আমাকে বলল, 'রিনি, তোমার যা করার আজ সন্ধের মধ্যে সেরে নাও। জিতেন বেশিদিন আমাদের এখানে থাকলে সবাই সন্দেহ করবে...'

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওদের খিদের সঙ্গে আমি পেরে উঠব না। জিতেন যে কেন মরতে আমাদের বাড়িতে এল!

খাওয়া-দাওয়ার পর কাজ শুরু করতে-করতে প্রায় সাড়ে তিনটে বেজে গেল। আকাশে তখন আবার মেঘ জমেছে, ঝিরঝির করে বৃষ্টিও পড়ছে।

জিতেনের কাছে আসার আগে ওরা তিনজন আমাকে আবার তাড়া দিয়েছে। তার মধ্যে রমা তো বলতে গেলে আমাকে একরকম শাসিয়েছে। বলেছে, আমার যদি অন্য কোনও মতলব থাকে তা হলে বিশেষ সুবিধে হবে না।

জিতেনকে যে-ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেই ঘরটায় কাজ করছিলাম আমরা।

আশ্চর্য! একটা দিন এখনও পুরো হয়নি, এরই মধ্যে জিতেনের গন্ধে ঘরটা টইটম্বুর।

জিতেন একটা চেয়ারের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে লাইন টেস্টার দিয়ে লাইনটা টেস্ট করছিল। হঠাৎই টাল সামলাতে না-পেরে ওর দেহটা নড়ে উঠল। ও পড়ে যেতে পারে ভেবে আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার হাত-মুখ-বুক সব ওর শরীরে লেপটে গেল। জিতেন খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আমি গালে টের পাচ্ছিলাম, ওর শরীর আয়তনে বাড়ছে।

ধরা ধরা গলায় জিতেন বলল, 'কেউ এসে পড়বে...।'

'না, কেউ আসবে না।'

জিতেন তখন সাহস করে আমার বাঁধন ছাড়িয়ে নেমে পড়ল চেয়ার থেকে। লক্ষ করলাম, ওর শরীর কাঁপছে।

ও কোনওরকমে দরজার কাছে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েই ফিরে এল আমার কাছে। আমাকে এক ঝটকায় জাপটে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। আমাদের শরীরের তাপ বিনিময় হতে লাগল। আমার ছদ্মবেশ ধরে থাকার ক্ষমতা বোধহয় শিথিল হয়ে আসছিল। কারণই হঠাৎই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট এক টুকরো চাপা গর্জন।

জিতেন চমকে উঠে আমাকে ছেড়ে দিল, অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

আমি ছদ্মবেশ সামলে নিয়ে জড়ানো গলায় বললাম, 'আমি আর পারছি না...'

জিতেনের অবাক ভাবটা পুরোপুরি মিলিয়ে গেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'এখানে আমার ভয় করছে, রিনি। যদি কেউ হট করে এসে পড়ে!'

ওকে বলতে পারলাম না যে, কেউ আসবে না। কিংবা এলেও কোনও ক্ষতি নেই। তা হলে ও নির্ঘাত সন্দেহ করবে।

তাই বললাম, 'সন্ধে হলে আমরা বাইরে কোথাও চলে যাব।'

জিতেন সায় দিল।

সন্ধের অন্ধকার নেমে আসতেই আমি জিতেনকে নিয়ে বেরোলাম। বেরোনোর সময় শিবনাথ আমাকে আলাদা ডেকে নিল, বলল, 'বেশি দেরি কোরো না কিন্তু—।'

রমা বলল, 'উলটোপালটা কোনও মতলব ভেঁজে সুবিধে হবে না।'

আমি বললাম, 'কোনও ভয় নেই। তোমরা ওকে আস্তই পাবে—।'

তারপর দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

জিতেন কেমন একটু থম মেরে ছিল। বোধহয় আগামী উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ ওর বুকের ভেতরে পাক খাচ্ছিল। ও বারবার মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখছিল।

বৃষ্টি এখন আর নেই। কিন্তু চারপাশে বৃষ্টির আদরের ছোঁওয়া লেগে রয়েছে। গাছের পাতায়, ঘাসে, মাটিতে, আকাশে, বাতাসে—কোথায় নয়!

মেঘ সরে গেছে একপাশে। চাঁদ আবার দেখা দিয়েছে—চতুর্দশীর কিশোরী চাঁদ। গত দু-দিন ও গা-ঢাকা দিয়েছিল।

চাঁদ দেখলে আমাদের কেমন পাগল-পাগল লাগে। আমি জানি, বাড়িতে শিবনাথরা এখন চাঁদ দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু আমার ভেতরে এখন সেই অস্থির ব্যাপারটা টের পেলাম না। আমি জিতেনের হাত ধরে ছিলাম। সেই ছোঁওয়া আমাকে পালটে দিচ্ছিল। টের পেলাম, ওর গায়ে কেমন একটা জ্বর-জ্বর ভাব।

ভিজে মাটিতে পা ফেলে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। অন্ধকারে আমার দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল না। জিতেনকে বললাম, 'আমার হাত ধরে এসো—কোনও ভয় নেই।'

দুটো ধান খেত পেরিয়ে কয়েকটা বড় গাছের জটলার নীচে আমরা দুজনে পাশাপাশি

বললাম।

হঠাৎ একঝলক বাতাস গাছের পাতায়-পাতায় শব্দ তুলল। রাতপাখির ডাক শুনতে পেলাম। আর কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপরে আমরা ভালোবাসাবাসি শুরু করলাম।

জিতেন দিশেহারা হাউইয়ের মতো আমাকে এলোমেলো আদর করতে লাগল। মরণাপন্ন দানব যেভাবে প্রাণভোমরা আঁকড়ে ধরতে চায়, ও পাগলের মতো আকুল হয়ে সেই প্রাণভোমরা খুঁজতে লাগল আমার শরীরে।

জিতেন হাঁফাচ্ছিল, দাপাদাপি করছিল, কিন্তু ক্লান্ত হয়নি এতটুকু। ছদ্মবেশ ধরে রাখতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে-মাঝেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল চাপা গর্জনের টুকরো। কিন্তু জিতেন সেগুলোকে তৃপ্তির শব্দ বলে ভাবছিল।

পশুপ্রবৃত্তি আমাকে পেয়ে বসল। কোনওরকমে শরীরটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে উলটোদিকে ঘুরে গেলাম। তাতে জিতেনের যেন সুবিধেই হল। ও পেছন থেকে আমাকে আদর করতে লাগল। আর আমি যেন শূন্যে ভেসে যেতে লাগলাম।

চূড়ান্ত মুহূর্তে জিতেন এক ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠল। তখন ওকে হঠাৎই শিবনাথ বলে মনে হল। দু-চারটে পাখি ডেকে উঠল গাছের আড়াল থেকে। আর আমরা আনন্দে কুটিকুটি হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ আমরা অন্ধকারে চোখ মেলে শুয়ে রইলাম। তারপর জিতেন আমাকে পরম যত্নে চুমু খেতে লাগল। বারবার বলতে লাগল, 'রিনি, আই লাভ য়ু। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না...।'

আমার কান্না পেল। কারণ, শিবনাথ-রমাদের কথা মনে পড়ছিল। কিন্তু চোখে আমার জল এল না। একটা নাম-না-জানা কষ্ট ভেতরে-ভেতরে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর আমরা উঠলাম। আমি মানুষ না অমানুষ সেটাই আমার কাছে গুলিয়ে যাচ্ছিল। জিতেন আমার এই জঘন্য জীবনে একটা নতুন মানে জুড়ে দিয়েছে।

অন্ধকারে গাছপালার আড়াল দিয়ে ফিরতে-ফিরতে নানা কথা মনে হচ্ছিল। জিতেনের গলায় দাঁত বসিয়ে আমি কি ওকে আমাদের একজন করে নিতে পারি না? তা হলে অন্তত ও প্রাণে বেঁচে থাকবে। কিন্তু তখন যে ও সারাটা জীবন আমাকে ঘেন্না করবে, যেমন রাতের ট্রেনের ওই শয়তানটাকে আমি ঘেন্না করি। ওর ঘৃণা সহ্য করে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তার চেয়ে এই ভালো—আমরা দুজন-দুজনকে ভালোবাসি—এটাই শেষ সত্যি হয়ে থাক জিতেনের কাছে।

যখন আমরা বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে পড়লাম, তখন জিতেনকে বললাম, 'তুমি আগে চলে যাও। দুজনে একসঙ্গে গেলে মা-বাপি সন্দেহ করবে।'

জিতেন কপট ভয়ের সুরে বলল, 'ওরে বাবা। এসব জানতে পারলে তোমার বাবা আমাকে খেয়ে ফেলবে।'

জিতেন বুঝতে পারল না, ও কতবড় সত্যি কথাটা বলল।

ওকে বললাম, 'তুমি বলবে, রিনি গাছপালার আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেল। ওকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে না-পেয়ে আমি চলে এসেছি। তা হলেই হবে—।'

ও আমার ঠোঁটে গভীর চুমু খেল। তারপর বলল, 'বেশি দেরি কোরো না, তাড়াতাড়ি চলে এসো...।'

আমি হেসে ঘাড় নাড়লাম।

জিতেন অন্ধকার থেকে এগিয়ে গেল আলোর দিকে। সেখানে ওর জন্যে নতুন এক অন্ধকার অপেক্ষা করছে।

এইবার আমার কান্না পেল। আকাশের চাঁদের দিকে তাকালাম। ছদ্মবেশের নিয়ন্ত্রণের কথা ভুলে গিয়ে চারপায়ে দাঁড়ালাম। আমার বুকফাটা হাহাকার জন্তুর গর্জন হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। একে কি কান্না বলে? আমার একমাত্র ভালোবাসার মানুষটার জন্যে কান্না?

ওই বাড়িতে আমি আর ফিরতে পারব না। আমি জানি, সব আলো নিভিয়ে দিয়ে শুরু হয়ে গেছে ওদের নাচ। ওরা পাগলের মতো জিতেনকে ঘিরে নাচছে। আর জিতেন সাদা, ফ্যাকাসে মুখে ওই ভয়ঙ্কর তিনটে প্রাণীর দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে। ওর মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরিয়ে আসতে পারছে না। তবে ওর নিশ্চয়ই বৃদ্ধা মায়ের কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে ছোট-ছোট দুটো বোনের কথা—যাদের ও ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল।

আচ্ছা, জিতেনের আমার কথাও একটু-একটু মনে পড়ছে তো?

রক্তের দাগ ছিল

নিজের টেবিলে বসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে 'শার্লক হোম্‌স অমনিবাস' পড়ছিল দশরথ সামন্ত। সারাটা জীবন ধরে সে ছিল তদন্ত-পাগল কনস্টেবল। বছরপাঁচেক হল রিটায়ার করেছে। রিটায়ার করার সময়েও সে প্রায়-কনস্টেবলই ছিল। কারণ, প্রোমোশন সে নেয়নি—নিলে সরাসরি তদন্তের জায়গা থেকে তাকে হয়তো সরে যেতে হত।

চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর হঠাৎই একটা ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দশরথের চোখে পড়ে। 'প্রাইভেট আই ডট কম' নামের ডিটেকটিভ এজেন্সি একজন বয়স্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইছে। তদন্তের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়।

একমুহূর্তও দেরি না-করে দশরথ সেখানে অ্যাপ্লাই করেছিল এবং ইন্টারভিউর ডাক পেয়েছিল।

ইন্টারভিউ নিয়েছিল এজেন্সির মালিক ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। বছর তিরিশ-বত্রিশের টগবগে যুবক। লম্বা ফরসা চেহারা। মুখে কোথায় যেন একটা বেপরোয়া ভাব লুকিয়ে রয়েছে।

ইন্টারভিউর সময় দশরথ কাষ্ঠ হেসে ইন্দ্রজিৎকে বলেছিল, 'সময়মতো প্রোমোশন নিলে আমি স্যার পুলিশ কমিশনার হয়ে রিটায়ার করতে পারতাম—কিন্তু করিনি। কারণ, ওই যে বললাম, ডায়রেক্ট তদন্তের প্রতি দুর্দান্ত টান। ঠিক যেন সন্তানের প্রতি মায়ের টান! তদন্ত—মানে, ইনভেস্টিগেশান—ছাড়া আমি একটা মোমেন্টও থাকতে পারি না। তদন্ত আমার ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ।'

ইন্দ্রজিৎ বেঁটেখাটো বৃদ্ধ মানুষটাকে দেখছিল। কাঁচাপাকা চুল, তোবড়ানো গাল, কালো চওড়া ফ্রেমের চশমা, কপালের বাঁ-দিকে একটা ছোট আঁচিল। বয়েসের ভারে চোখের রং খানিকটা ঘোলাটে হয়ে এলেও তা থেকে চনমনে ভাব উধাও হয়ে যায়নি। তা ছাড়া মাইনে খুব কম শুনেও মানুষটির উৎসাহে বিন্দুমাত্রও ভাটা পড়েনি।

'আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিটেকটিভের পোস্টে নিলে আপনি আর-একটা ব্যাপারে মোস্ট বেনিফিটেড হবেন, স্যার। প্রচুর রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনি আমি গুলে খেয়েছি। আর গত পঞ্চাশ বছর ধরে শার্লক হোমস আমার গুরু, আমার দেবতা। আমার এই এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি আপনার তদন্তের কাজে হেভি হেল্প করবে, স্যার। যেমন ধরুন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, পাঁচকড়ি দে থেকে শুরু করে আজকের তপত্যোতি বর্মন, হরিহর ধর পর্যন্ত সবার লেখাই আমার নখদর্পণে। যখনই দরকার তখনই আমার কাছ থেকে রেডি রেফারেন্স পেয়ে যাবেন। পাঁচকড়ি দে-র "নীলবসনা সুন্দরী" কি আপনি পড়েছেন, স্যার? সেখানে...।'

দশরথের পাঁচালি শুনতে-শুনতে ইন্দ্রজিতের মাথা ঘুরতে শুরু করেছিল। ও কোনওরকমে বৃদ্ধ মানুষটিকে থামিয়ে বিদায় দিয়েছে। এবং পরে ঠান্ডা মাথায় অনেক বিচার-বিবেচনা করে তাকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিয়েছে।

প্রাইভেট আই ডট কম-এর অফিস ম্যাডান স্ট্রিট—দুটি মাঝারি মাপের ঘর নিয়ে আধুনিকভাবে সাজানো।

বাইরের ঘরটা রিসেপশান গোছের। একপাশে বড় টেবিলে পার্সোনাল কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে জিনি রায়। ও একইসঙ্গে রিসেপশানিস্ট, টাইপিস্ট এবং ইন্দ্রজিতের সেক্রেটারি। বয়েস বাইশ-চব্বিশ হবে। ফরসা রোগা চেহারা। মুখের তুলনায় চোখ দুটো বেশ বড় মাপের। ঠোঁটে গাঢ় চকোলেট রঙের লিপস্টিক। চোখের পাতার ওপরে হালকা রঙের আস্তর। আর পারফিউমের সুগন্ধ ওকে চাদরের মতো জড়িয়ে রয়েছে।

ভগবান জিনিকে রূপ দিয়েছেন—তবে বুদ্ধির বিনিময়ে। কিন্তু তাতে জিনির কোনওরকম দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। ও সবসময় নিজের সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত। অফিস ছুটির পর ওকে দিয়ে একটি মিনিটও ওভারটাইম করানো যায় না। হাবভাব দেখে মনে হয়, বিশাল বড়লোকের মেয়ে—চাকরি করছে নেহাতই সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু আসলে তা নয়।

জিনির মুখোমুখি চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে আছে দশরথ। 'শার্লক হোম্‌স অমনিবাস' পড়তে-পড়তে ওর বারবার হাই উঠছিল। বিনা কাজে এভাবে বসে থাকা যায়! সক্রিয় তদন্তের কোনও সুযোগ নেই। শুধু বিশ্রাম। মাইনেটাই কি সব!

দশরথ বই বন্ধ করে একটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ল্যামিনেট করে বাঁধানো একটা ফটো দ্বিতীয় ড্রয়ার থেকে বের করল। ফটোটা টেবিলে সুন্দরভাবে দাঁড় করাল।

দশরথের দেবতা শার্লক হোম্‌সের ছবি।

দশরথ ধূপকাঠি-দেশলাই বের করল ড্রয়ার থেকে। তারপর ধূপ জ্বেলে শার্লক হোম্‌সকে আরতি করল বারকয়েক। কষ্ট করে একটা হাই চেপে বলল আপনমনেই, 'হে শার্লক হোম্‌স, যে করে হোক একটা কেস এনে কোম্পানিটার বউনি করিয়ে দাও, বাবা!'

জিনি একটা ছোট আয়না নিয়ে নিজের মেকাপ ঠিক করায় ব্যস্ত ছিল। একবার আড়চোখে দশরথকে দেখল। তারপর ছোট্ট একটা 'হুঃ' শব্দ করে নিজের কাজে মন দিল।

দশরথের আরতি শেষ হতে-না-হতেই ভেতরের ঘরের কাচের দরজা খুলে গেল। বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। ডানহাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। কপালে ভাঁজ।

জিনির দিকে একপলক তাকিয়ে দশরথের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল ইন্দ্রজিৎ, বলল, 'দশরথদা, আজকের দিনটা গেলে চোদ্দোদিন হবে। চোদ্দোদিন হল অফিস খুলেছি, একটা কেসের খবর নেই। শুধু শো-কেস হয়ে বসে আছি! বাবা প্রথমেই বলেছিল,

আমার পয়সা নষ্ট কর ক্ষতি নেই। তবে তোর ওই ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে নষ্ট করিস না। এখন বোঝো ঠ্যালা—।'

দশরথ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'চিন্তা করবেন না, স্যার। আজ গুরুকে মন-প্রাণ দিয়ে হেভি ডেকেছি। আজ একটা-না-একটা কেস আসবেই।' ঘরের ডিজিটাল ক্লকের দিকে একবার তাকিয়ে : 'এখনও তো বারোটা বাজেনি—।'

'না, বারোটা বেজে গেছে—আমার কোম্পানির।' বিরক্তভাবে সিগারেটে টান দিল ইন্দ্রজিৎ : 'কী করে তোমাদের মাইনে দেব কে জানে!'

জিনি এতক্ষণ সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ওদের কথাবার্তায় বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করেনি। কিন্তু ইন্দ্রজিতের শেষ কথাটা কানে যেতেই চট করে ফিরে তাকাল ওর দিকে। করুণ অথচ আদুরে গলায় বলল, 'মাইনে হবে না! কী বলছেন, স্যার!'

ইন্দ্রজিৎ তখন স্বপ্ন-দেখার চোখে ঘরের একটা কাচের জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল। আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, 'আমাদের কোম্পানি দাঁড়াবেই। দরকার শুধু একটা কেস। জাস্ট একটা কেস।'

দশরথ শার্লক হোম্‌সের ফটোর সামনে হাতজোড় করে বলল, 'প্লিজ, জাস্ট ওয়ান কেস—।'

ইন্দ্রজিৎ সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে বলল, 'তোমার গুরুর বাড়ির ঠিকানাটা কী ছিল মনে আছে, দশরথদা?'

'মনে নেই আবার!' দাঁত দেখিয়ে একগাল হাসল দশরথ : '২২১বি, বেকার স্ট্রিট।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'ঠিক বলেছ। আমরা একেবারে বেকার হয়ে গেলাম। বেকার—স্ট্রিট বেগার।'

দশরথ জ্বলন্ত ধূপকাঠিটা পাশেই একটা জানলার তাকে ধূপদানিতে বসিয়ে দিয়েছিল। ইন্দ্রজিতের শেষ কথাটা শুনেই হাত বাড়িয়ে ধূপদানিটা নিল। আর-একদফা ঘুরিয়ে দিল শার্লক হোম্‌সের ফটোর সামনে। তারপর চোখে-মুখে তীব্র ভক্তি প্রকাশ করে কাঁচুমাচু ভাবে বলল, 'প্রভু, একটা কেস—জাস্ট একটা। তা হলেই...।'

ভেতরের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

ইন্দ্রজিৎ প্রায় ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

'হ্যালো—।'

'হ্যালো, প্রাইভেট আই ডট কম?' ভারি গলায় কেউ জানতে চাইল।

'ইয়েস—।'

'আমার নাম মহেন্দ্র সেন। সল্ট লেকে থাকি। কাগজে আপনাদের অ্যাড দেখেছি। তাই একটা জরুরি ব্যাপারে ফোন করছি। আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপারে একটু আলোচনা ছিল। সেটা আপনাদের অফিসে গিয়ে বলতে চাই। বুঝতেই পারছেন, সিক্রেসিটা খুব ইমপরট্যান্ট।'

'অবশ্যই, অবশ্যই! আপনি এখনই আমাদের অফিসে চলে আসুন। ঠিকানাটা জানেন

তো? পাঁচ নম্বর ম্যাডান স্ট্রিট। দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে। আমরা আপনার জন্যে ওয়েট করছি।'

'আপনি কে কথা বলছেন জানতে পারি কি?'

'আমি এই কোম্পানির চিফ ডিটেকটিভ—ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী।'

মহেন্দ্র সেন 'ও. কে.' বলে লাইন কেটে দিলেন।

ইন্দ্রজিতের বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ হচ্ছিল। হাতের নিভে যাওয়া সিগারেটটা ও টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল। দু-হাত মুঠো করে ঝাঁকিয়ে উল্লাসের ভঙ্গি করল—ব্যাট্‌সম্যানকে বোল্ড আউট করার পর বোলাররা যেমন করে। তারপর প্রায় নাচতে-নাচতে চলে এল বাইরের ঘরে। উত্তেজিতভাবে বলল, 'জিনি, দশরথদা—চটপট সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে নাও। এক্ষুনি আমাদের প্রথম ক্লায়েন্ট আসছেন! কথা শুনে মনে হল লাখপতি কি কোটিপতি হবে।' আনন্দে হাতে হাত ঘষল ইন্দ্রজিৎ : 'আমাদের কোম্পানির প্রথম কেস।'

দশরথ একবার চোখ তুলে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকাল। একবার চোখ বুজল। বোধহয় কাউকে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর শার্লক হোম্‌সের ফটোটাকে প্রায় গড় হয়ে প্রণাম করার চেষ্টা করল।

জিনি নিজের টেবিলটা চটপটে হাতে গুছিয়ে নিল। কম্পিউটারের কিবোর্ডে খটাখট করে কয়েকটা বোতাম টিপল। তারপর নিজের মেকাপ মেরামত করতে শুরু করল।

দশরথ শার্লক হোম্‌সের ফটোটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফেলল। টেবিলটা টিপটপ করে সাজিয়ে নিল। তারপর নিজের পোশাকটা ঠিকঠাক করে নিয়ে গুছিয়ে বসল।

ইন্দ্রজিৎ ঢুকে গেল ভেতরের ঘরে। নিজের গদিওয়ালা চেয়ারে বসে নতুন একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট-এর বিষয়ে লেখা একটা মোটা ইংরেজি বই নিয়ে পড়তে শুরু করল।

প্রাইভেট আই ডট কম-এর তিনজনেই প্রথম ক্লায়েন্টের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সল্ট লেকে চার নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে চোখ-ধাঁধানো বাড়ি বলতে একটাই—'সেন কটেজ'। স্যান্ড স্টোন আর গ্রানাইট দিয়ে আধুনিক ধাঁচে তৈরি তিনতলা বাড়ি। দরজা-জানলায় মেহগনি কাঠ আর টিন্টেড গ্লাস।

ইন্দ্রজিতের রানি-রং মারুতি ভ্যান বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ঠিক বিকেল চারটেয়। গাড়ি থেকে নামল ইন্দ্রজিৎ, জিনি, আর দশরথ।

মারুতি গাড়ির জানলার কাচে নিজের ছায়া দেখছিল জিনি, মাথার চুল ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল। হঠাৎই বাড়িটার দিকে চোখ পড়তে ও একেবারে হতবাক হয়ে গেল। ওর ঠোঁট চিরে অবাধ্যভাবে বেরিয়ে এল : 'ফ্যানটাস্টিক!'

দশরথ হেসে বলল, 'এই অট্টালিকা যদি কটেজ হয়, স্যার, তা হলে হিমালয়কে

আপনি উইয়ের ঢিবি বলতে পারেন।'

ইন্দ্রজিৎ সামান্য মাথা নাড়ল। চোখ থেকে 'রে ব্যান' সানগ্লাসটা খুলে পকেটে রাখল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'দশরথদা, যা-যা বলেছি মনে আছে তো! তুমি চোখ-কান খোলা রাখবে, কোনও কিছু যেন নজর এড়িয়ে না যায়।' ইন্দ্রজিৎ ঘুরে তাকাল ঝিনির দিকে : 'ঝিনি, আমি যখন সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব, তখন তুমি শর্টহ্যান্ডে নোট নিয়ে যাবে। কোনও কথা যেন বাদ না যায়।'

ঝিনি তখনও মুগ্ধ চোখে বাড়িটা দেখছিল। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ও বলল, 'এটা বাড়ি নয়—স্বপ্ন। এরকম একটা স্বপ্নের বাড়িতে এরকম অঘটন ঘটেছে এটা ভাবা যায় না।'

ঝিনি একটু বেশিরকম স্বপ্ন দেখে—বৈভবের স্বপ্ন। এ-ধরনের স্বপ্ন দেখা বোধহয় ওর শখ।

দশরথ চটপটে গলায় বলল, 'চলুন, স্যার, আমরা তদন্তে নেমে পড়ি। শুধু-শুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই—।'

পাথর বসানো পথ ধরে বাড়ির সদর দরজার দিকে এগোতে-এগোতে ইন্দ্রজিতের কয়েক ঘণ্টা আগের কথা মনে পড়ছিল। যখন মহেন্দ্র সেন ওর ম্যাডান স্ট্রিটের অফিসে এসে হাজির হয়েছিলেন।

মহেন্দ্রকে দেখেই ইন্দ্রজিতের মনে হল, উনি লাখপতি নন—কোটিপতি।

মহেন্দ্রর চেহারা মোটাসোটা, পরনে ধবধবে পাঞ্জাবি আর সরু পাজামা। গা থেকে ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে। ডানহাতের চার আঙুলে মোটা-মোটা চারটে সোনার আংটি। তাতে যথাক্রমে হীরা, চুনি ও পান্না বসানো—চার নম্বর পাথরটা ইন্দ্রজিৎ চিনতে পারল না।

মহেন্দ্রর গলায় সোনার ভগ চেন। বাঁহাতের বাহুতে সোনার তাবিজ। তাতেও বড় মাপের তিনটে পাথর।

মহেন্দ্রর বয়স খুব বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ হবে। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা—সোনারও হতে পারে। মাথায় শতকরা সত্তরভাগই টাক। থলথলে মুখে ঘাম। দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে সামান্য হাঁফাচ্ছেন।

ইন্দ্রজিতের অফিসে ঢুকেই মহেন্দ্র জরিপ-নজরে সবকিছু মেপে নিচ্ছিলেন। বোধহয় বুঝতে চাইছিলেন প্রাইভেট আই ডট কম ওঁর সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি না।

ইন্দ্রজিতের মুখোমুখি চেয়ারে বসে আরামের একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ করলেন মহেন্দ্র। তারপর পকেট থেকে পাঁচশো পঞ্চান্নর প্যাকেট বের করলেন—নিজে একটা নিলেন, ইন্দ্রজিৎকেও একটা দিলেন। সুরেলা শব্দ তোলা বিদেশি লাইটার দিয়ে দুজনের সিগারেট ধরালেন।

ইন্দ্রজিৎ ইন্টারকমে ঝিনিকে ডেকে নিল। ঝিনি শর্টহ্যান্ডের খাতা আর পেনসিল নিয়ে তৈরি হয়ে বসল। দশরথ তখন দরজার কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে। তদন্তের

কৌতূহল ওকে সিটে বসে থাকতে দেয়নি।

মহেন্দ্র যেন একটু সময় নিয়ে বলতে শুরু করলেন।

ইন্দ্রজিৎবাবু, আমার বাবা জিতেন্দ্রনাথ সেন বেশ বড়লোক। মানে, লাস্ট ফিনানশিয়াল ইয়ারে আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছি বারো কোটি টাকা। আমাদের কোম্পানির নাম হয়তো আপনি শুনে থাকবেন—"সেন কেমিক্যাল প্রোডাক্টস"।'

ইন্দ্রজিৎ মাথা নাড়ল—নামটা ও শুনেছে। শুধু ও কেন, পশ্চিমবঙ্গের সবাই হয়তো শুনে থাকবে। 'সেন কেমিক্যাল প্রোডাক্টস' দারুণ নামজাদা কোম্পানি।

'আপনাদের প্রবলেমটা কী হয়েছে একটু বলবেন?'

'হ্যাঁ—বলছি। ব্যাকগ্রাউন্ডটা না-বললে প্রবলেমটার গুরুত্ব বোঝা যাবে না।' একটু থেমে মহেন্দ্র সেন আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের ফ্যাক্টরি দুটো—গড়িয়ায়, আর সোনারপুরে। বেশ বড় মাপের ফ্যাক্টরিই বলা যায়। বাবা-ই সবকিছু দেখেন—মানে, দেখতেন। তা ছাড়া লোকজন তো আছেই। আমরা খুব একটা সময় দিতে পারি না।'

'আমরা মানে!'

ছোট করে দুবার কাশলেন মহেন্দ্র। তারপর বললেন, 'আমরা মানে আমি, আমার ছোটভাই সুরেন্দ্র, আর ছোটবোন নবনীতা। আমরা আমাদের কাজকর্ম, শখ-আহ্লাদ নিয়ে থাকি। সে যাকগে, যা বলছিলাম—।'

মহেন্দ্রকে বাধা দিল ইন্দ্রজিৎ : 'একটু আগে আপনি বললেন আপনার বাবা সবকিছু দেখেন—মানে, দেখতেন। "দেখতেন" বলছেন কেন? এখন কি আর উনি দেখেন না?'

'না—কারণ, পাঁচদিন আগে উনি কিডন্যাপ্‌ড হয়েছেন।'

'কিডন্যাপ্‌ড হয়েছেন!'

'হ্যাঁ। গত সোমবার ভোররাতে একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার ঘর দোতলায়। আর বাবা একতলার বড় একটা ঘরে থাকতেন। আমি সিঁড়ির কাছে আসামাত্রই দেখতে পাই কয়েকটা কালো ছায়া কিছু একটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে উঠতেই তাদের মধ্যে একজন আমার দিকে রিভলবার তুলে শাসায়। বলে, "চেঁচালে বা পুলিশে খবর দিলে আপনার বাবাকে খতম করে দেব। পরে আপনাকে ফোন করব। যান, ঘরে চলে যান। গিয়ে চুপটি করে শুয়ে থাকুন। সকালে কেউ জিগ্যেস করলে বলবেন জিতেনবাবু কোম্পানির কাজে ট্যুরে গেছেন। যা-যা বললাম মনে থাকে যেন!"

'আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছিলাম। সেই অবস্থাতেই কোনওরকমে ঘরে ফিরে গেছি।'

'বাড়ির সবাই খবরটা জেনেছে?' ইন্দ্রজিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করল। শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল।

'হ্যাঁ—সকালে সুরেন আর নবনীতা জেনেছে। আর পরানদাও জেনেছে।'

'পরানদা কে?'

'বাবার আমলের কাজের লোক। বয়েসে বাবার চেয়েও অনেক বড়। আমাদের কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।'

'কিডন্যাপারদের কোনও ফোন এসেছিল? টাকা-পয়সা কিছু চেয়েছে?'

'হ্যাঁ, সোমবার সকালে ওরা ফোন করেছিল। পুলিশে কিছু জানাতে বারণ করেছে। তবে টাকা-পয়সা এখনও কিছু চায়নি—বলেছে, পরে জানাবে। তারপর থেকে আর কোনও ফোন আসেনি।'

ইন্দ্রজিৎ কপালে ভাঁজ ফেলে চিন্তা করছিল। মহেন্দ্র সেন আশা-ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎই খেয়াল হওয়াতে হাতের নিভে-যাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনি আজ বিকেলে আমাদের বাড়িতে একবার আসুন। স্পটটা একবার দেখে নিন। তা ছাড়া আমার কতকগুলো পারসোনাল কথাও বলার আছে। আমাকে লেখা বাবার একটা চিঠিও আপনাকে দেখাব। আর তার ওপর রয়েছে অনিমেষ সরকারের সমস্যা। বাবার ছোটবেলার বন্ধু—উনি গত পরশু আমাদের সল্ট লেকের বাড়িতে এসে উঠেছেন। বাবা নেই, অথচ...সে এক বিরাট সমস্যা—।'

'তার মানে! আবার কীসের সমস্যা?'

'ব্যাপারগুলো এখানে ঠিক ডিসকাস করা যাবে না। আপনি প্লিজ আমাদের বাড়িতে আসুন—তখন সব খুলে বলব।'

'আমি একা নয়—আমরা তিনজনে আজ বিকেল চারটের সময় আপনাদের বাড়িতে যাব।'

তাই এসেছে ইন্দ্রজিৎ—সঙ্গে জিনি আর দশরথ।

কলিংবেল বাজাতেই দরজা খুলল একজন বয়স্ক কাজের লোক। বোধহয় পরান—ভাবল ইন্দ্রজিৎ।

জমকালো ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং স্পেসে ওদের আপ্যায়ন করে বসাল পরান।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এসে হাজির হলেন মহেন্দ্র। হেসে বললেন, 'আপনারা এসেছেন—ভীষণ খুশি হয়েছি।'

ইন্দ্রজিৎ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ঘরটা দেখছিল। এরকম ঘর হিন্দি ছবিতেই দেখা যায়। আসবাবপত্রও ঘরের সঙ্গে মানানসই। দূরে, ঘরের শেষ প্রান্ত থেকে, সুন্দর বাঁক নেওয়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার দিকে।

'আপনারা বসুন—আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।' মহেন্দ্র সৌজন্য করে বললেন।

'না, মিস্টার সেন। আগে বরং একটু কাজ সেরে নিই।' ইন্দ্রজিৎ গা-ডুবে-যাওয়া সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল : 'চলুন, আপনার বাবার ঘরটা আগে দেখি—।'

জিনিকে চোখের ইশারা করে পা বাড়াল ইন্দ্রজিৎ। জিনি ওর শর্টহ্যান্ড খাতা আর পেনসিল নিয়ে ইন্দ্রজিতের ছায়া হয়ে গেল।

মহেন্দ্র ইন্দ্রজিৎদের পথ দেখিয়ে দক্ষিণদিকে নিয়ে গেলেন। সেখানেই জিতেন্দ্রনাথের শোওয়ার ঘর। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে চাপা গলায় একান্তে কিছু কথাবার্তা বলছিল। ইন্দ্রজিৎদের দেখে চট করে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলল।

মহেন্দ্র সেন আলাপ করিয়ে দিলেন।

'আমার ছোট ভাই, সুরেন—আর বোন, নবনীতা। ইনি ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। বাবার কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারে আমি ওঁর হেল্প চেয়েছি। তোদের তো আগেই বলেছিলাম...।'

নবনীতা হঠাৎই খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে ওর উদ্ধত শরীরে নানারকম ভাঙচুর হতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বেশ কষ্ট করে ও বলল, 'বড়দা, তোমার এই গুডি-গুডি ইমেজটা এবার ছাড়ো তো। ভেতরে-ভেতরে তো আমাদেরই মতো তেষ্টায় মরে যাচ্ছ। অথচ মুখে একটা বেড়াল-তপস্বীগোছের ভাব ফুটিয়ে রেখেছ। নাঃ, সিনেমা-লাইনটাই তোমার আসল লাইন ছিল। কেন যে ফর নাথিং একটার-পর-একটা নতুন-নতুন বিজনেস ট্রাই করে যাচ্ছ কে জানে!'

'নীতা! ইন্দ্রজিৎবাবু আমাদের গেস্ট। ওঁর সামনে তুমি কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ! বাবা এখন কীরকম কষ্টের মধ্যে কী অবস্থায় আছে কিছুই জানি না। যে করে হোক বাবাকে ফিরিয়ে আনা আমাদের প্রথম কর্তব্য—।'

'কর্তব্য!' আবার একদফা কাচের-চুড়ি-ভাঙা হাসি। সে-হাসির মধ্যে শঙ্খচূড়ের বিষ ছিল। তারপর হাসি থামতেই : 'জানি, বড়দা, আসল কথাটা বলতে তোমার ভদ্রতায় আটকাচ্ছে। ও.কে., আমি বলে দিচ্ছি—' ইন্দ্রজিতের দিকে ঘুরল নবনীতা : 'ওয়েল মিস্টার শার্লক হোম্‌স, আসল ঘটনা হল বাবাকে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা দরকার। নইলে টাকার তেষ্টায় আমরা মরে যাব—তিনজনেই—বড়দা, ছোড়দা, এবং আমি। বাবা ছাড়া আমাদের টাকার জোগান দেবে কে! কী ছোড়দা, কিছু ভুল বলছি?' সুরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে নবনীতা জানতে চাইল। তারপর আবার ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ করে : 'পুলিশের ওপরে আমাদের কনফিডেন্স নেই—তাই প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এবার দেখুন চেষ্টা করে, বাবাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন কি না! তবে যা করার চটপট করুন—নইলে আমাদের যা ড্রাই অবস্থা! মরুভূমির চেয়েও খারাপ...।'

ইন্দ্রজিৎ বেশ খুঁটিয়ে নবনীতাকে দেখছিল। জিনিও। তবে ও বোধহয় নবনীতার সাজগোজ লক্ষ করছিল।

নবনীতার ফরসা সুন্দর চেহারা। টানা-টানা চোখ, শ্যাম্পু করা চুল। চোখের কোলে অমবিত্তর দ্রুত জীবনযাপনের ছাপ। পরনে দামি চুড়িদার। গলায় সোনার চেন, কানে সাদা পাথর বসানো দুল—বোধহয় হিরেই হবে। এইসব জাতের বড়লোকেরা কখনও নকল গয়না পরে না। শুধু নকল জীবনের পিছনে ছোটে।

'ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে আমি পরে ডিটেইলে কথা বলব। আগে জিতেনবাবুর ঘরটা একবার দেখে নিই।'

ইন্দ্রজিতের কথার উত্তরে সুন্দর করে হাসল নবনীতা। বলল, 'আপনার সঙ্গে ডি-টে-ই-লে কথা বলতে আমার বেশ ভালো লাগবে। য়ু লুক স্মার্ট। আপনাকে ডিটেকটিভ হিসেবে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। টা-টা...।' হাত তুলে আঙুল নাড়ল নবনীতা : 'আমি দোতলায় আছি—দরকার হলেই ডাকবেন। আই উড লাভ টু কাম।'

মহেন্দ্র মুখ-চোখ লাল করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবনীতা চলে যাওয়ার পর চাপা গলায় শুধু বললেন, 'অসভ্য! মডেলিং-এর লাইনে আর কত ভদ্রতা শিখবে! অথচ ওকে নিয়ে মায়ের অনেক আশা ছিল...।'

'আপনাদের মা-কে দেখছি না—।' ইন্দ্রজিৎ বলল।

'আমাদের মা নেই। প্রায় পনেরো বছর আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।'

সুরেন্দ্র এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখন একটু ফাঁক পেয়ে বললেন, 'আমাকে কি এখন থাকতে হবে, ইন্দ্রজিৎবাবু?

ইন্দ্রজিৎ অবাক-হয়ে সুরেন্দ্রর দিকে তাকাল। কারণ, গলার স্বর বেশ মেয়েলি। হয়তো সেইজন্যই কম কথা বলেন।

'না, আপনি এখন যেতে পারেন—আমি পরে ডেকে নেব।'

সুরেন্দ্র চলে যেতেই মহেন্দ্রকে সঙ্গে করে ঘরের ভেতরে পা রাখল ইন্দ্রজিৎ।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা বিশাল মাপের একটা অয়েল পেইন্টিং। টকটকে সিঁদুর পরা এক মাঝবয়েসি মহিলা। ছবিটা মালা-চন্দনে সাজানো।

'আমার মা—।' মহেন্দ্র বললেন।

ইন্দ্রজিৎ এবার ঘরটার দিকে মনোযোগ দিল।

বিলাসবহুলভাবে সাজানো প্রকাণ্ড ঘর। ভোমরার শব্দ করে এয়ারকুলার চলছে। দেওয়ালে বিদেশি কোয়ার্ৎজ ঘড়ি। পশ্চিমের রোদ একটা কাচের জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে মার্বেল পাথরের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘরের বাঁদিক ঘেঁষে কারুকাজ করা মেহগনি কাঠের খাট—তাতে ধবধবে সাদা বিছানা।

সেদিকে আনমনাভাবে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আচমকা মহেন্দ্রর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ : 'আপনার ছোটবোন যা বলে গেল, সে-কথা কি ঠিক? জিতেনবাবু না থাকায় আপনারা টাকার অভাবে কাহিল হয়ে পড়েছেন?

মহেন্দ্র ইতস্তত করতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ এয়ারকুলার অফ করে দিল। একটা জানলার পাল্লা সামান্য খুলে দিল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল। মহেন্দ্রকে অফার করল, কিন্তু তিনি আলতো করে বললেন, 'এখন না—পরে।'

'বলুন, নবনীতা কি ঠিক বলেছেন? আমার কাছে লুকোনোর চেষ্টা করবেন না।' ঘরে এয়ারকুলারের ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও মহেন্দ্র পকেট থেকে রুমাল বের করে কাল্পনিক

ঘাম মুছলেন। তারপর খানিকটা সময় নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ—ঠিকই বলেছে। বেশ কয়েক বছর আগে বাবা একটা এগ্রিমেন্ট করেছিলেন। তাতে আমরা—মানে, আমি, সুরেন্দ্র আর নবনীতা—মাসে-মাসে একটা ফিক্সড টাকা পাব। তার বাইরে টাকার দরকার পড়লে সেটা বাবার কাছে চাইতে হবে। সেই এগ্রিমেন্টে আমরা সই করেছিলাম—না-করে উপায় ছিল না।'

মহেন্দ্র চুপ করে গেলেন। দুটো হাত সামনে জড়ো করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইন্দ্রজিৎ ঘরটা খুঁটিয়ে দেখা শেষ করল। একটা জানলার কাছে গিয়ে বাইরের রাস্তাটা একবার দেখল। তারপর ঘুরে তাকাল মহেন্দ্রর দিকে : 'আপনার বাবার ওপরে কারও রাগ ছিল?'

'মনে তো হয় না। তবে বিজনেসের ব্যাপারে কোনও জেলাসির ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে।'

'হুঁ। আসলে আমি কিডন্যাপিং-এর মোটিভটা বুঝতে চাইছি। কিডন্যাপাররা এখনও টাকা চায়নি বলে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।' আচ্ছা, কিডন্যাপিং-এর সময় কি ধস্তাধস্তি হয়েছিল?'

'দোতলা থেকে আমি সেরকম কিছু টের পাইনি। তবে আপনাকে বলতে ভুলে গেছি—বাবার বিছানার চাদরে বেশ খানিকটা রক্তের দাগ ছিল।'

'রক্তের দাগ!' ইন্দ্রজিতের শরীরটা চাবুকের মতো টান-টান হয়ে গেল : 'কোথায় সে চাদরটা? দেখি—।'

'দাঁড়ান, নিয়ে আসছি—।' বলে মহেন্দ্র চলে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ সিগারেট খেতে-খেতে ভাবছিল। কোটিপতি জিতেন্দ্রনাথের তিন ছেলেমেয়ে। তিনজনেই বোধহয় বড়লোকি চালে আয়েস করতে শিখেছেন। কেউই বিয়ে-থা করেননি। অথচ সবাই খরচ করতে ভালোবাসেন। বাবা কিডন্যাপড হয়েছেন বলে কারওরই তেমন দুশ্চিন্তা নেই। একমাত্র দুশ্চিন্তা খরচের টাকা পাওয়া-না-পাওয়া নিয়ে। নবনীতার কথাগুলো হয়তো রূঢ়, কিন্তু মনে হয় না ও একবর্ণও মিথ্যে বলেছে।

সিগারেটের শেষ-হয়ে-আসা টুকরোটা ইন্দ্রজিৎ জানলা দিয়ে ছুড়ে দিল বাইরে।

এমনসময় মহেন্দ্র চাদর নিয়ে ফিরে এলেন—সঙ্গে দশরথ ও পরান।

দশরথ ইন্দ্রজিতের কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'স্যার, আমি একটু বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখছিলাম—মানে, ইনভেস্টিগেট করছিলাম আর কি!' আড়চোখে সন্দেহ এবং আশঙ্কার নজরে মহেন্দ্রকে কয়েকবার দেখল দশরথ . 'আপনি একা একটু পরানের সঙ্গে কথা বলুন। ওর কাছে প্রচুর মেটিরিয়াল আছে। ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল তাঁর "অপরাধ-বিজ্ঞান" বইতে বলেছিলেন, ইনভেস্টিগেশানে বাড়ির কাজের লোকদের রোল খুব ভাইটাল। আমি আপনার হয়ে পরানকে একটু-আধটু কোশ্চেন করছিলাম...।'

ইন্দ্রজিৎ হেসে জিগ্যেস করল, '"অপরাধ-বিজ্ঞান" তুমি পড়েছ, দশরথদা?'

'হ্যাঁ, মানে, ছোটবেলায় অল্প-অল্প পড়েছিলাম।'

ইন্দ্রজিৎ মহেন্দ্রকে বলল, 'মিস্টার সেন, চাদরটা দিন—।'

চাদরটা নিয়ে বিছানায় রাখল ইন্দ্রজিৎ। উলটেপালটে রক্তের দাগ লাগা জায়গাটা বের করল।

বেশ বড় একটা রক্তের ছোপ। তার খুব কাছে ছোট মাপের আরও দুটো ছোপ।

ইন্দ্রজিৎ চাদরটা ভাঁজ করে দশরথের হাতে দিল : 'এটা সাবধানে রাখো, দশরথদা। এটা ল্যাবে পাঠাতে হবে।'

যেন লাখ টাকা দামের একটা শৌখিন কাচের গ্লাস অতি সাবধানে নাড়াচাড়া করছে, এইরকম ভঙ্গিতে চাদরটা গ্রহণ করল দশরথ। ওর কাছে এটা লাখ টাকার সূত্র।

চাদরটার দিকে মুগ্ধ অথচ সাবধানি চোখে তাকিয়ে ও জানতে চাইল, 'আমি কি এখন যেতে পারি, স্যার?'

'হ্যাঁ, যাও—জিনির কাছে বোসো গিয়ে।'

দড়ির ওপর পা ফেলে সন্তর্পণে হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিতে দশরথ চলে গেল।

ইন্দ্রজিৎ মহেন্দ্রকে বলল, 'আপনি জিতেনবাবুর লেখা একটা চিঠি আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন। আর অনিমেষ সরকার নামে একজনের কথা বলছিলেন...অনিমেষবাবু এখন কোথায়? বাড়িতে আছেন?'

'না, উনি একটু বেরিয়েছেন। এলে আপনাকে খবর দেব।'

'ঠিক আছে। ও-ব্যাপারে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব। তার আগে পরানের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।'

অদ্ভুত চোখে পরানের দিকে একপলক তাকিয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে মহেন্দ্র চলে গেলেন।

জিতেন্দ্রনাথের ঘরের ডানদিকে একটা টেবিল আর তিনটে চেয়ার পাতা ছিল। ইন্দ্রজিৎ সেখানে গিয়ে বসল—পরানকেও বসতে বলল।

লম্বা, রোগা, তোবড়ানো গাল, গালে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। দেখেই বোঝা যায়, পরানের ওপর দিয়ে বহু ঝড়-জল বয়ে গেছে। ওর বড়-বড় চোখ দুটোয় কেমন এক সতর্ক ছাপ ছিল।

ওর কাছে বাড়ির লোকজন সম্পর্কে জানতে চাইল ইন্দ্রজিৎ।

পরান খানিকক্ষণ ইতস্তত করে তারপর মুখ খুলল। জিতেন্দ্রনাথের তিন ছেলেমেয়ে সম্পর্কে ওর মতন করে বলল।

ছোড়দি সিনেমা-লাইনে কীসব করে। মাঝে-মাঝে টি-ভি-র বিজ্ঞাপনে ছোড়দিকে দেখায়। দিন-রাত্তির শুধু সাজগোজ করছে আর দুনিয়ার ছেলেবন্ধুর সঙ্গে রাত-বিরেতে বাড়ি ফিরছে। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায়। অনেক অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। প্রত্যেকবারই বড়বাবু টাকা দিয়ে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট সামলেছে। ছোড়দির ছোট-বড় জ্ঞান নেই। যখন যা মুখে আসে বলে দেয়। বড়বাবুকে দিন-রাত টাকার জন্য বিরক্ত করত। এখন বড়বাবু নেই—তাই জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। তা ছাড়া বড়বাবুর বন্ধু অনিমেষবাবু দারুণ

কড়া ধাতের মানুষ। এখন ওনার দাপটে তিন ভাই-বোন সবসময় কাঁচুমাচু হয়ে থাকে।

ছোড়দা গানবাজনা নিয়ে থাকে। প্রায়ই বাড়িতে গানবাজনার আসর বসিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। বড়বাবু অনেকদিন বারণ করেছে, কিন্তু ছোড়দা তাতে কান দেয়নি। বরং নানান জলসার জন্য বড়বাবুর কাছে টাকা চাইত। শুনছিলাম, কী একটা ব্যবস্থা করে নাকি তিরিশজনের দল নিয়ে ফরেনে গানবাজনা করতে যাবে। তার জন্য গত শনিবার বড়বাবুর কাছে টাকা চাইছিল। আর ছোড়দা ছোড়দির চেয়ে বড় হলেও ছোড়দিকে বেশ ভয় পায়।

বড়দা মানুষ এমনিতে খুব ভদ্র। তবে ব্যবসা করার একটা রোগ আছে। সেই কোন বয়েস থেকেই জেদ ধরেছে বাবার ব্যবসা নয়—সে নিজের হাতে গড়া ব্যবসাকে বড় করে তুলবে। বড়বাবু বহুবার বারণ করেছে, কিন্তু বড়দা নিজের জেদ থেকে সরেনি। অথচ প্রতিবারই নতুন-নতুন ব্যবসা ফাঁদার জন্য বড়বাবুর কাছ থেকে টাকা চাইতেন। বড়বাবু প্রথমটা রাগারাগি করতেন বটে, কিন্তু শেষমেষ টাকা দিয়ে দিতেন। এই তো, গত শনিবারই বড়বাবুর সঙ্গে বড়দার কথা কাটাকাটি হয়ে গেল—ওই টাকা নিয়েই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরান বলল, 'শনিবার দিনটা বড়বাবুর খুব খারাপ গিয়েছে। টাকার জন্যে একের-পর-এক বিড়ম্বনা। আমি ওই জানলা দিয়ে স-ব দেখেছি। প্রথমে এল ছোড়দি, তারপর ছোড়দা—আর, সবশেষে বড়দা। তিনজনের সঙ্গেই বড়বাবুর রাগারাগি হল। কিন্তু ওই রাগারাগিই সার। ছেলেমেয়ের জন্যে অন্ধ স্নেহ—কী আর করবেন! টাকা-পয়সা সব দিয়ে-থুয়ে শেষ পর্যন্ত মায়ের ওই ফটোর সামনে গিয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন—' ইশারা করে মিসেস সেনের অয়েল পেইন্টিংটার দিকে দেখাল পরান : 'মা চলে গিয়ে বড়বাবু আরও কাবু হয়ে পড়েছেন। মা ছিলেন সত্যিকারের গৃহলক্ষ্মী। ...সবই আমাদের কপাল! মা-মরা ছেলেমেয়েগুলোর একটাও মানুষ হল না। অথচ বড়বাবুর কত আশা ছিল!'

শেষ কথা দুটো বলেই জিভ কাটল পরান। অনুনয় করে বলল, 'আমাকে মাপ করবেন, স্যার। বাড়ির কাজের লোক হয়ে অনেক আস্পর্ধার কথা বলে ফেলেছি। এসব কথা যেন বড়দা-ছোড়দারা জানতে না পারেন। আসলে দোষ তো আমারও নয়। বড়বাবুদের সঙ্গে জীবনের অনেকগুলো বছর জড়িয়ে গেছে। বড়দাদের সব আমিই কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। বড়বাবুর আমার সঙ্গে কক্ষনও চাকরের মতো ব্যবহার করতেন না। বরং একা-একা দুঃখ করতেন। বলতেন, পরান, তোর মা-কে আমি কথা দিয়েছিলাম ছেলেমেয়েদের আমি মানুষ করে তুলব। তুই তো জানিস, ওদের জন্যে আমি কী পরিশ্রম করেছি—কত কষ্ট সয়েছি! কিন্তু তার ফল কী হল? শূন্য! আমার বুকটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে রে, পরান, শূন্য হয়ে গেছে...।'

কথাগুলো বলতে-বলতে পরানের চোখে জল এসে গিয়েছিল। পরনের গেঞ্জি দিয়ে চোখ মুছতে লাগল ও।

ইন্দ্রজিতের কাছে পারিবারিক ছবিটা ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল। ছেলেমেয়েদের লোভের উৎপাতে অতিষ্ঠ এক স্নেহময় ধনী পিতা। সত্যি, জিতেন্দ্রনাথের জন্য বেশ কষ্ট হয়।

'শেষদিকটায় বড়বাবু প্রায়ই বলতেন, ওদেরকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। উচিত শিক্ষা। যাতে ওরা স্নেহ-ভালোবাসা ভাঙিয়ে আমার কাছ থেকে আর সুযোগ নিতে না-পারে। লোভ ওদের শেষ করে দিয়েছে। ওদের কাছে সম্পর্কের আর কোনও দাম নেই।'

কথা শেষ করে হতাশায় মাথা নাড়ল পরান।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ইন্দ্রজিৎ। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, পরান—তুমি এখন যাও। এসব কথা আর কাউকে বলার দরকার নেই। যদি সে-রকম বুঝি, তা হলে তোমার সঙ্গে পরে আবার কথা বলব।'

পরান উঠে দাঁড়াল। ইন্দ্রজিৎকে নমস্কার করে ধীরে-ধীরে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

কবজি উলটে ঘড়ি দেখল ইন্দ্রজিৎ। প্রায় ছ'টা বাজে। ঘরের কোয়ার্ৎজ ওয়াল-ক্লকটা পাঁচ মিনিট ফাস্ট। নাকি ইন্দ্রজিতেরটা পাঁচ মিনিট স্লো।

এমন সময় মহেন্দ্র সেন ঘরে এসে ঢুকলেন। স্মিত হেসে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আসুন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করেছি। দরকার হলে চায়ের পর আবার কাজ শুরু করবেন...।'

'চলুন—' বলে মহেন্দ্রকে অনুসরণ করে ড্রইং-ডাইনিং স্পেসে এসে হাজির হল ইন্দ্রজিৎ আর জিনি।

এসে দেখল দশরথ চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া শুরু করেছে।

চা খেতে-খেতে ইন্দ্রজিৎ জিতেন্দ্রনাথের একটা ফটো দেখতে চেয়েছিল। মহেন্দ্র উত্তরে বলেছেন, 'চা শেষ করে আমার ঘরে চলুন—ফটোও দেখাব, আর চিঠিটাও দেখাব।'

সুতরাং জিনি আর দশরথকে সোফায় বসিয়ে রেখে ইন্দ্রজিৎ মহেন্দ্রর সঙ্গে দোতলায় গেলেন। জিনি তখন মুগ্ধ চোখে ঘরের নানান আসবাবপত্র দেখছে। আর দশরথ এমনভাবে ড্রইং-ডাইনিং স্পেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন স্রেফ ঘ্রাণশক্তি দিয়েই সে যাবতীয় রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলবে।

দোতলায় নিজের ঘরে ইন্দ্রজিৎকে বসিয়ে মহেন্দ্র একটা ডেস্কের কাছে গেলেন। একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করে ইন্দ্রজিতের হাতে এনে দিলেন।

'আমাদের লেখা বাবার শেষ চিঠি। হাতের লেখাটা বাবার—আমরা চেক করে দেখেছি।'

ইন্দ্রজিৎ চিঠিটা খুলে দেখল।

কাগজের দু-পিঠে কালো কালি দিয়ে লেখা। বেশ বড় চিঠি।

'চিঠিটা পড়ে আমাদের মনে হয়েছে, বাবা যেন জানতেন উনি আর বেশিদিন নেই। এটাকে কি আপনি সিক্সথ্ সেন্স বলবেন?'

'আপনার কি ধারণা জিতেনবাবু আর বেঁচে নেই?'

'সে-রকমই তো মনে হচ্ছে। কিডন্যাপাররা যখন আর কোনও সাড়া-শব্দ করছে না...।'

ইন্দ্রজিৎ হাসল : 'যে-হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে কখনও কেউ খতম করে! হয়তো অন্য কোনও কারণে কিডন্যাপাররা চুপচাপ রয়েছে। তারপর...সময় এলে... আপনাদের ফোন করবে।'

ইন্দ্রজিৎ এবার চিঠিটা পড়তে শুরু করল। এয়ারকুলারের ঠান্ডা বাতাসে ওর বেশ শীত-শীত করছিল। মহেন্দ্রকে ওটা কমিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

চিঠিতে তিন ছেলেমেয়েকেই সম্বোধন করেছেন জিতেন্দ্রনাথ। তারপর লিখেছেন :

'...পনেরো বছর আগে তোমাদের মা সীমন্তিনী যখন চলে যায় তখন আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমাদের মানুষের মতো মানুষ করব। কিন্তু ব্যবসার চাপ, অন্ধ স্নেহ, আর তোমাদের লোভ আমার প্রতিজ্ঞা ছত্রখান করে দিয়েছে। এখন একা, গোপনে, তোমাদের মায়ের ছবির কাছে চোখের জল ফেলা ছাড়া আমার আর কোনও গতি নেই। ভুল আমারই—আমিই তোমাদের ঠিকমতো শাসন করতে পারিনি। আর শাসন করার পক্ষে এখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পিতা হিসেবে আমি ব্যর্থ হয়েছি। তোমাদের মানসিক অত্যাচারে আমি ক্লান্ত। আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। তাই যে-একমাত্র পথ খোলা আছে সেই পথেই আমি যাব। না, না—ভুলেও ভেব না আমি সুইসাইড করার কথা ভাবছি। আমার সেই একটিমাত্র পথ হল একটা নিষ্ঠুর গোপন কথা তোমাদের সামনে তুলে ধরা। এ-কথা জানাতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এখন আর ফেরার কোনও পথ নেই। তোমরাই এই কাজে আমাকে বাধ্য করেছ।

আমার যত ধন-সম্পত্তি, গাড়ি-বাড়ি, ফ্যাক্টরি—কোনও কিছুরই মালিকানা আমার একার নয়। আমি শতকরা মাত্র কুড়িভাগের মালিক—বাকি আশিভাগের মালিক আমার ছোটবেলার বন্ধু অনিমেষ সরকার। ওরা আরামবাগের বনেদি বড়লোক। আমার সঙ্গে ওর নিয়মিত টেলিফোনে যোগাযোগ আছে। অনিমেষ যে-কোনও মুহূর্তে এসে ষোলআনা ওর অংশ বুঝে নিলে আমার—এবং তোমাদের—অবস্থা হবে পথের ভিখিরির মতো। কিন্তু অনিমেষ আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। ছোটবেলায় আমরা ছিলাম হরিহর-আত্মা। তাই কখনও ও এইসব সম্পত্তিতে ওর অংশ আছে বলে ভাবেনি। ধর্ম-কর্ম পুজো-আচ্চা নিয়েই এখন ও জীবন কাটায়। আর আমি সুখে আছি জানলেই ও সুখী।

সম্প্রতি অনিমেষকে আমি আমার মানসিক দুরবস্থার কথা জানিয়েছি। ও তাতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। লোভকে ও ঘৃণা করে। লোভীদের আরও বেশি। আমি ওকে চিঠি দিয়ে বলেছি, এখানে এসে ওর সমস্ত

সম্পত্তি বুকে নিয়ে ও যেন আমাকে মুক্তি দেয়। ও উত্তরে আসবে বলে জানিয়েছে। যে-কোনও দিন ও এসে হাজির হতে পারে। ওকে অমান্য বা অসম্মান করার সাহস আমার নেই—আশা করি তোমরাও তা করবে না। অবশ্য ও খুব কড়া ধাতের সাত্ত্বিক মানুষ। অভব্যতা দেখলে ও সঙ্গে-সঙ্গে শাস্তি দিতে পারে। তা ছাড়া এই বাড়ি-গাড়ি, ব্যবসা—সবকিছুরই তো ও আশিভাগের মালিক। ভাবছি, আমার কুড়ি ভাগও ওকে লিখে দিয়ে আমি মুক্তি নেব। তোমরা হয়তো মামলা করতে চাইবে...করে দেখো, অনিমেষ তার কেমন জবাব দেয়। ও কখনও অন্যায়ের কাছে কাবু হতে শেখেনি। ওকে সব দিয়ে দিলে আমি হয়তো পথের ভিখিরি হব, কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই। তার বদলে অন্তত সুখ-শান্তি তো ফিরে পাব! তাই এখন আমি অনিমেষের আসার অপেক্ষায় দিন গুনছি।

যদি আমার হঠাৎ করে কিছু হয়, তাই তোমাদের সব কথা জানিয়ে রাখলাম। ইতি—

হতভাগ্য
জিতেন্দ্রনাথ সেন

চিঠিটা বারদুয়েক খুঁটিয়ে পড়ল ইন্দ্রজিৎ। তারপর বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন—উনি যেন জানতেন ওঁর খারাপ কিছু একটা হবে।'

'হ্যাঁ—সেটাই তো আপনাকে বলছিলাম। চিঠিটা বাবার বেডরুমে একটা টেবিলের ওপরে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া ছিল।'

'আপনার বাবার একটা ফটো দেখাতে পারেন?'

'একমিনিট। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।' মহেন্দ্র ফটোর জোগাড় করতে চলে গেলেন। ইন্দ্রজিৎ দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে কানে এল মিহি গলায় কেউ গান গাইছে। সুরেন্দ্র গলা সাধছেন।

শুনে হাসি পেয়ে গেল ইন্দ্রজিতের। গানের জন্য এ-গলা তৈরি হয়নি। এ-গলা তৈরি হয়েছে শুধু দেহকে মাথার সঙ্গে জুড়ে রাখার জন্য। তবে একটা ব্যাপার ইন্দ্রজিতের ভালো লাগল। সুরেন্দ্র একজন নামী গায়িকার গাওয়া গানই প্র্যাকটিস করছেন। অর্থাৎ, সুরেন্দ্র গায়ক নয়, গায়িকা হওয়ারই চেষ্টা করছেন।

মহেন্দ্র একটা অ্যালবাম নিয়ে ফিরে এলেন। তার একটা পৃষ্ঠা খুলে ইন্দ্রজিৎকে দেখালেন। বছরতিনেক আগে চারদিনের ফুরসত পেয়ে জিতেন্দ্রনাথ তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে সিঙ্গাপুর বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফটোটা সেখানেই তোলা। আলো-ঝলমলে একটা রাস্তায় জিতেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে। পিছনে দূরে একটা বাড়ির মাথায় গ্লো-সাইনে তৈরি একটা ড্রাগনের ছবি দেখা যাচ্ছে।

জিতেন্দ্রনাথকে খুঁটিয়ে দেখল ইন্দ্রজিৎ।

লম্বা রোগা চেহারা। মাথায় বিস্তৃত টাক— শুধু দু-কানের পাশে চুলের ঝালর। চোখে চশমা নেই। নিশ্চয়ই কনট্যাক্ট লেন্স পরেছেন। প্যান্ট-শার্ট পরা জিতেন্দ্রনাথকে বেশ সুপুরুষই দেখাচ্ছে। ইন্দ্রজিতের মনে হল, সীমন্তিনী মারা যাওয়ার পর উনি অনায়াসেই বিয়ে করতে পারতেন।

ইন্দ্রজিৎ বলল, 'এই ফটোটা আর এই চিঠিটা—' হাতের চিঠিটা দেখাল ইন্দ্রজিৎ, 'আমি একটু রাখছি। কপি করে কাল বা পরশু আপনাকে ফেরত দেব।'

মহেন্দ্র রাজি হয়ে ঘাড় নাড়লেন। ফটোটা অ্যালবাম থেকে খুলে ইন্দ্রজিতের হাতে দিলেন।

'আমি এবার আপনার ভাই-বোনের সঙ্গে একটু কথা বলব...তারপর নীচে যাচ্ছি।'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে মহেন্দ্র নির্লিপ্ত মুখে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ পায়ে-পায়ে সুরেন্দ্রর ঘরে গিয়ে হাজির হল।

সুরেন্দ্রর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। এ-ঘরে এসি নেই।

বড় মাপের ঘর। ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ আর নানা মঙ্গেশকারের বাঁধানো ফটো ঝুলছে। এখানে-ওখানে হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। গোটা ঘরটায় কেমন অগোছালো ভাব। শিল্পীর ঘর বোধহয় এরকমই হয়।

ঘরের ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা শৌখিন শো-কেস। তাতে বহু রাজ্যের ক্যাসেট। আর একপাশে শিভাস রিগালের বোতল এবং চারটি নকশা-কাটা কাচের গেলাস। শো-কেসের ওপরে বসানো রয়েছে চার হাজার পি. এম. পি. ও.-র একটি সনি সাউন্ড সিস্টেম। তার স্পিকার দু-দিকের দেওয়ালে বসানো।

সুরেন্দ্র হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছিলেন। ইন্দ্রজিৎকে দেখেই গানবাজনা থামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সৌজন্যের হাসি হেসে বললেন, 'আসুন—।'

মেঝেতে দামি কার্পেট পাতা ছিল। সেখানে ইন্দ্রজিতকে বসতে অনুরোধ করে সুরেন্দ্র নিজেও বসলেন।

'আমাকে কিছু জিগ্যেস করবেন?'

'হ্যাঁ'। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল ইন্দ্রজিৎ, 'আপনার বাবার কিডন্যাপিং সম্পর্কে আপনার কি আইডিয়া?'

একটু ইতস্তত করে সুরেন্দ্র চাপা গলায় বললেন, 'ওপেনলি বলব?'

'অফ কোর্স!'

'আমার মনে হয় এটা দাদার কাজ!'

ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠল। সুরেন্দ্রকে এমনিতে দেখে ওর ভিতু মনে হয়েছে। সুরেন্দ্র যে ওঁর দাদার নামে এরকম অভিযোগ করতে পারেন সেটা ও কল্পনাও করেনি। মনে-মনে নিজের কানটা মুলে দিল ইন্দ্রজিৎ। একজন তুখোড় ডিটেকটিভকে সবরকম সম্ভাবনার

কথা হিসেবে রাখতে হয়।

'আপনার এরকম মনে হল কেন?'

'দাদা নিত্যনতুন বিজনেস দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে। সেজন্যে ওর মাঝে-মাঝেই অনেক টাকার দরকার হয়। এই তো শুনলাম এখন না কি গ্লাসউলের ফ্যাক্টরি খুলবে বলে ভাবছে। আসলে দাদার ব্যবসায় কোনও মাথা নেই...।'

ইন্দ্রজিৎ বাধা দিয়ে বলল, 'যাঁর ব্যবসায় মাথা নেই তাঁর কিডন্যাপিং-এ মাথা থাকবে?'

'খুব থাকবে!' প্রায় মুখ ভেংচে বললেন সুরেন্দ্র, 'হাতে টাকা পাওয়ার জন্যে দাদা মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর ব্যবসার বুদ্ধি না-থাকলে কি কারও মাথায় বদমাইশি বুদ্ধি থাকতে পারে না!'

'তাই যদি হয়, তা হলে মহেন্দ্রবাবু আমার কাছে গেলেন কেন? এতে তো ওঁরই অসুবিধে হবে—।'

'সাধ করে কি আর গেছে! আসলে আশপাশের লোকজন পাঁচরকম কথা বলছে, তাই।'

ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবল। তারপর আচমকা বলল, 'আপনি তো লাস্ট শনিবার জিতেনবাবুর সঙ্গে খুব তর্কাতর্কি করেছেন। গানবাজনার দল নিয়ে আপনি কোন বিদেশে যাচ্ছেন?'

সুরেন্দ্রর মুখ থেকে পলকে সব রক্ত সরে গেল।

'কে বলেছে আপনাকে? নিশ্চয়ই পরানদা!'

সুরেন্দ্রর গলা মেয়েলি হলে কী হবে, ওঁর বুদ্ধির কোনও ঘাটতি নেই। ভাবল ইন্দ্রজিৎ।

'যে-ই বলুক—ব্যাপারটা তো সত্যি।'

মাথা নিচু করলেন সুরেন্দ্র। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে তাকালেন ইন্দ্রজিতের দিকে : 'বাবার কালচার বলে কিছু ছিল না। গানবাজনার লেভেলটা বাবা ঠিক বুঝত না।...মা কিন্তু এরকম ছিল না।'

'আপনার অনেক স্বপ্ন আছে, সুরেন্দ্রবাবু।' রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে বলল ইন্দ্রজিৎ, 'স্বপ্ন সবারই থাকে—স্বপ্ন থাকাটা দোষের নয়। তবে কথাটা কী জানেন, জিতেনবাবুরও হয়তো কিছু স্বপ্ন ছিল...।'

'সেটা আমরা তিন ভাই-বোনে চুরমার করে দিয়েছি!' খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন সুরেন্দ্র।

'ওঁর অনেক দুঃখ-কষ্ট ছিল।'

'দুঃখ-কষ্ট আমার নেই! আপনি জানেন, আমার এই মেয়েলি গলার জন্যে কত অপমান আমাকে ছোটবেলা থেকে সহ্য করতে হয়েছে—এখনও হয়! আমার ছোটবোন পর্যন্ত আমাকে এ-নিয়ে ব্যঙ্গ করে, খোঁটা দেয়!'

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়াল : 'নিশ্চয়ই এই দুঃখ-কষ্টের প্রতিবাদে আপনি জিতেনবাবুকে কিডন্যাপ করেননি?'

সুরেন্দ্রর ফরসা মুখে রক্তের ঝলক ঝাপটা মারল। কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনায়

ওঁর গলা চিরে গেল : 'বাঃ, চমৎকার! এই না-হলে ডিটেকটিভ! আপনি বরং আমাকে অ্যারেস্ট করুন। অনিমেষকাকা বাড়িতে থাকলে আপনার এই ইনসাল্টের যোগ্য জবাব দিত। আপনার আর নবনীতার মধ্যে কোনও ডিফারেন্স নেই দেখছি!'

সুরেন্দ্রর অভিমান ইন্দ্রজিৎকে ছুঁয়ে গেল। ও বলল, 'সরি, আমি ঠিক সিরিয়াসলি কথাটা বলিনি। এমনি ঠাট্টা করে বলছিলাম...।'

সুরেন্দ্র একটু স্বাভাবিক হলেন। দাঁত দিয়ে বারদুয়েক ঠোঁট কামড়ালেন। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।

'আচ্ছা, আপনার বাবার বন্ধু অনিমেষ সরকার কি খুব কড়া ধাতের লোক?'

'হ্যাঁ...বাবার তুলনায় তো বটেই!'

'জিতেনবাবুর চিঠির কথা তো আপনি সব জানেন!'

'হ্যাঁ—দাদা সবাইকে ওটা পড়ে শুনিয়েছিলেন।'

'চিঠির কথা সব সত্যি?'

ইতস্তত করে সুরেন্দ্র বললেন, 'প্রথমটা তো বিশ্বাস হতে চায়নি। পরে, অনিমেষকাকা আসার পর বুঝলাম, শুধু সত্যি নয়—হাড়ে-হাড়ে সত্যি। টাকা-পয়সা, কোম্পানি—সবকিছুরই কন্ট্রোল অনিমেষকাকার হাতে।'

মনে-মনে হেসে ফেলল ইন্দ্রজিৎ। সবকিছুর কন্ট্রোল হাতে থাকায় অনিমেষবাবুর 'অনিমেষকাকা' হয়ে উঠতে আর দেরি হয়নি। এ-দুনিয়ায় লক্ষ্মী বড় শক্তিশালী!

'আচ্ছা, সুরেন্দ্রবাবু—থ্যাঙ্ক য়ু ফর কোঅপারেশান। পরে দরকার হলে আবার কথা বলব। আপনার ছোটবোনের ঘরটা কোনদিকে?'

অদ্ভুত চোখে ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তের একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখালেন সুরেন্দ্র। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'একটু কেয়ারফুল থাকবেন। খরচের টাকায় টান পড়ায় নীতা খুব চটে আছে। কাল ও অনিমেষকাকার কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিল—অনিমেষকাকা স্রেফ "না" করে দিয়েছেন। নীতা অনিমেষকাকার ওপরে একেবারে ফায়ার হয়ে আছে। বাবা ফিরে না-এলে আমাদের এই দম আটকানো অবস্থা কাটবে না।'

সুরেন্দ্র ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিলেন।

ইন্দ্রজিৎ মার্বেল পাথরের বারান্দায় পা ফেলে নবনীতার ঘরের দিকে এগোল।

ঘরে ঢুকতেই এয়ারকুলারের ঠান্ডা ছোঁয়া ইন্দ্রজিৎকে জড়িয়ে ধরল। আর একইসঙ্গে হালকা পারফিউমের গন্ধ ওকে আদর করল।

ঘরে কোথাও আলতো মিউজিক বাজছিল—কিন্তু শব্দটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে সেটা ঠাহর করা যাচ্ছিল না।

দরজার পাল্লা ঠেলে ঢোকার সময় নক করেছিল ইন্দ্রজিৎ। আর তখনই বিছানায় শুয়ে থাকা নবনীতা ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে ছিল ইন্দ্রজিতের দিকে। সুন্দর করে হেসে

অভ্যর্থনা জানিয়েছিল : 'কাম অন ইন, শার্লক। বড়দা বলছিল আপনার নাম না কি ইন্দ্রজিৎ? তা ইন্দ্রের সঙ্গে কতটা মিল আপনার?'

কথা বলতে-বলতে বিছানায় উঠে বসল নবনীতা। অবাধ্য চুলগুলোকে মাথার এক মনোরম ঝাঁকুনিতে পিঠের দিকে ফেরত পাঠাল। তারপর তেরছা চোখে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রজিতের দিকে—যেন একটু আগের প্রশ্নটার জন্য অপেক্ষা করছে।

'ধর্ম-টর্ম কিংবা দেবতা নিয়ে আমার তেমন একটা চর্চা নেই, ম্যাডাম। আমার কারবার অধর্ম আর শয়তান নিয়ে। বাট আই ডু লাভ ইট।'

'ও—' করে অদ্ভুত এক শব্দ করল নবনীতা। বসে-বসেই শরীরটাকে লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে পা দুটো বিছানার বাইরে ঝুলিয়ে দিল। ভুরু কপালে তুলে প্রশংসার ঢঙে বলল, 'স্মার্ট! স্মার্ট! আই ডু লাভ ইট। বিউটি আর ব্রেইন একই শরীরে...উঃ, ভাবা যায় না!'

দেওয়ালে নবনীতার অনেকগুলো ফটোগ্রাফ পোস্টারের মতো করে লাগানো ছিল। তাতে নবনীতাকে নানান পোশাকে দেখা যাচ্ছে। পোশাকগুলোর বেশিরভাগই বিদেশের সি-বিচে মানানসই।

অবশ্য নবনীতার এখনকার পোশাকটাও অনেকটা সেই ধরনের। পোশাকটা ম্যাক্সিগোছের, তবে গোড়ালি পর্যন্ত নয়। হালকা নীল আর সাদা জমিতে সুতোর কাজ করা। কাপড়টা এমনই স্বচ্ছ যে, বোঝা যাচ্ছে নবনীতা অন্তর্বাস পরেছে।

'বলুন, মিস্টার ডিটেকটিভ, আমার কাছ থেকে ডিটেইলে কী জানতে চান?' ঠোঁট উলটে বলল নবনীতা। একটু থেমে তারপর : 'ওই চেয়ারটায় বসতে পারেন—' ইশারায় হাতভিনেক দূরের একটা চেয়ার দেখাল : '...অথবা এইখানটায় বসতে পারেন।' বিছানায় ঠিক ওর পাশটায় আলতো চাপড় মারল নবনীতা। তারপর খিলখিল করে জলতরঙ্গ শুনিয়ে দিল।

ইন্দ্রজিৎ বখে-যাওয়া মেয়েটাকে একপলক দেখল। তারপর চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

'আপনি মডেলিং করেন?'

বিছানায় বসে পা দোলাচ্ছিল নবনীতা। পা দোলানো থেমে গেল : 'কেন, আপনার আপত্তি আছে?'

হাসল ইন্দ্রজিৎ : 'কেউ নিজের ইচ্ছায় উচ্ছন্নে গেলে আমার আপত্তি করার কী আছে!'

'উচ্ছন্নে! কী বলতে চান আপনি! জানেন ফ্যাশান টি-ভি চ্যানেলে আমাকে দেখিয়েছে!'

'বুঝেছি—আপনি নিজেকে ভীষণ দেখাতে চান। কিন্তু কেউ যদি দেখতে না-চায়?'

রাগে থমথম করছিল নবনীতার মুখ। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ছুড়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ওকে ইশারায় থামতে বলল ইন্দ্রজিৎ। তারপর : 'ধীরে, ম্যাডাম, ধীরে। আমি আপনার বড়দা বা ছোড়দা নই। আর, বড়লোক হলেই কি অসভ্য হতে হবে?'

নবনীতার ভেতরটা কিছু একটা করার জন্য নিশপিশ করছিল। ওর চোখে আগুন

জ্বলছিল। আক্রোশ-ভরা চোখে ইন্দ্রজিৎকে দেখছিল ও।

'আপনার বাবাকে কিডন্যাপ করার পেছনে কার হাত আছে বলে মনে হয়?' শান্ত গলায় জিগ্যেস করল ইন্দ্রজিৎ।

নবনীতা রাগে গুম হয়ে ছিল। কাটা-কাটা জবাব দিল : 'জানি না।'

'আপনার ছোড়দা বলছিলেন যে, মহেন্দ্রবাবুর হাত থাকলেও থাকতে পারে—।'

'হঃ! ছোড়দা পুরুষ না কি! শুধু অন্যদের হিংসে করে। নিজের ইমপোটেন্সি ঢাকতে অন্যের নামে কাদা ছেটায়।'

'অনিমেষবাবু কেমন লোক?'

'খুব ভালো—' ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল নবনীতা, 'শুধু বাবার ঠিক উলটো। ওই লোকটা যে সত্যি-সত্যি সবকিছুর মালিক সেটা ওর কথাবার্তায় বোঝা যায়। এক নম্বরের কঞ্জুস! সবসময় পুজো-আর্চা নিয়ে থাকার ভান করে, গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে—বলে, ওটা নাকি খুব পবিত্র রং। আসলে পুরোটাই ঢং।'

ইন্দ্রজিৎ মনে-মনে সবকিছু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

অনিমেষ সরকারের ওপরে তিন ভাই-বোনের রাগ থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ, ওর যতদূর মনে হচ্ছে, কড়া ধাতের কঞ্জুস মানুষ কখনও স্নেহকাতর পিতার বিকল্প হতে পারে না। সুতরাং জিতেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনাটা দারুণ জরুরি। কিন্তু তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন? বিছানার চাদরের ওই রক্তের দাগ বলতে চাইছে কিডন্যাপাররা নিষ্ঠুর, হিংস্র। কিন্তু ওই রক্ত কি সত্যিই জিতেন্দ্রনাথের? নাকি অন্য কারও? ল্যাব রিপোর্ট পাওয়ার আগে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

'অনিমেষ সরকার কি এ-বাড়িতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছেন?' ইন্দ্রজিৎ জানতে চাইল।

'মানিয়ে নেওয়ার আর কী আছে!' হাত উলটে জবাব দিল নবনীতা, 'উনিই প্রায় সবকিছুর মালিক। দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন-ঘুরছেন, এনজয় করছেন—আর আমাদের চেষ্টার ছটফটানি দেখছেন। বিনাপয়সার সার্কাস।'

ইন্দ্রজিৎ বিদায় নিতে যাচ্ছিল—হঠাৎই একতলার ড্রইং-ডাইনিং স্পেস থেকে প্রবল ধমকানির চিৎকার ওর কানে এসে ঢুকল।

ভরাট গলায় কেউ চিৎকার করে বলছে, 'ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী আমাদের বাড়িতে এসেছেন চারটের সময়—আর এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। অথচ তোমরা কেউ আমাকে খবরটা দেওয়ার দরকার মনে করোনি! মহেন্দ্র, জিতেনের কাছে আগেই শুনেছিলাম তুমি একটু স্টুপিড টাইপের। এখন দেখছি ও ঠিকই বলেছে। কমনসেন্স বলেও তোমার কিছু নেই। তোমার কাছে সেন্সের মানে একটাই : ননসেন্স।'

ইন্দ্রজিৎ বারান্দায় চলে এল। সেখান থেকেই পাখির চোখে দৃশ্যটা দেখতে পেল।

তিনি আর দশরথের সোফার কাছাকাছি একটা জটলা মতন। সেখানে মহেন্দ্র, পরান এবং আরও একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ করল, নবনীতা দরজা ফাঁক করে নীচের তলার ঘটনা দেখতে চেষ্টা করছে।

ইন্দ্রজিৎ তরতর করে সিঁড়ি নামতে লাগল। নামতে-নামতেই কথাবার্তাগুলো ওর কানে আসছিল।

মহেন্দ্র মিনমিন করে বলছিলেন, 'না...মানে...আপনি বাড়িতে নেই। কী করে খবর দেব ঠিক বুঝতে...।'

'না-বোঝার কী আছে! তোমাদের কাছে তো আমার মোবাইল নাম্বার রয়েছে!'

আর কোনও উত্তর নেই। মহেন্দ্র মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইন্দ্রজিৎ ওঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর খুব খারাপ লাগছিল। হয়তো মহেন্দ্রদের এরকম রুক্ষ শাসনের লাগামেই রাখা দরকার, কিন্তু তাই বলে পরানের সামনে, বাইরের গেস্টদের সামনে!

অনিমেষ সরকারকে ভালো করে দেখল ইন্দ্রজিৎ।

মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চোখে হাই-পাওয়ার চশমা, নাকটা অস্বাভাবিক মোটা, গালে হালকা চাপদাড়ি।

পরনে, নবনীতা যেমনটি বলেছিল, গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। হাতে সাধারণ একটা লাঠি। হয়তো চলার সময় ভর দেওয়ার দরকার হয়। লাঠিটা দেখে নতুন বলে মনে হল।

ইন্দ্রজিৎ পরিচয় দিয়ে একগাল হাসতেই অনিমেষ সরকারের মুখের রুক্ষতা কেটে গেল। কপালে ফুটে ওটা বিরক্তির ভাঁজও গেল মিলিয়ে।

'আসুন, মিস্টার চৌধুরী, আমার ঘরে আসুন। আপনাদের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হয়নি তো?'

ইন্দ্রজিৎ বিনীতভাবে জানাল যে, না, হয়নি। তারপর বলল, 'আপনি ঘরে যান—ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি ওঁদের সঙ্গে দু-মিনিট কথা বলেই যাচ্ছি—' ইশারা করে দশরথ আর জিনিকে দেখাল ইন্দ্রজিৎ।

'ওইটা আমার ঘর—মানে, আপাতত ওখানেই আশ্রয় নিয়েছি।' জিতেন্দ্রনাথের ঘরের লাগোয়া একটা ঘর দেখালেন অনিমেষ। তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে সামান্য খুঁড়িয়ে হেঁটে এগোলেন সেই ঘরের দিকে।

পরান ইতস্তত পায়ে ওঁকে অনুসরণ করল।

মহেন্দ্র অপ্রস্তুতভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে 'আমি আসছি' বলে চলে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ জিনির পাশে সোফায় গিয়ে বসল।

'জিনি, ভেবেছিলাম দোতলায় গিয়ে ইন্টারোগেট করার সময়েও তোমাকে সঙ্গে থাকতে বলব, তুমি নোট নেবে—কিন্তু তাতে সিচুয়েশানটা এত এমব্যারাসিং হয়ে যেত যে...' কথা শেষ করল না ইন্দ্রজিৎ।

জিনি মুখ ভার করে বলল, 'বসে-বসে শুধু বোর হচ্ছি। দশরথদা যত রাজ্যের ডিটেকটিভ গল্প শুনিয়ে আমাকে আরও বোর করে দিচ্ছে।'

দশরথ আমতা-আমতা করে হেসে বলল, 'ইনভেস্টিগেশানের মূল মন্ত্রটা ওঁকে বোঝাতে চাইছিলাম।'

'সেটা কী?' ইন্দ্রজিৎ জানতে চাইল।

দশরথ গম্ভীরভাবে বলল, 'ইনভেস্টিগেট, ইনভেস্টিগেট, ইনভেস্টিগেট। শুধু তদন্ত করে যাও, তা হলেই ফল মিলবে।'

ইন্দ্রজিৎ হেসে ফেলল। তারপর তিনিকে বলল, 'কয়েকটা ইমপরট্যান্ট পয়েন্ট খুব তাড়াতাড়ি লিখে নাও। পরে হয়তো মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে।'

তিনি নোট-প্যাড আর পেনসিল নিয়ে তৈরি হল।

ইন্দ্রজিৎ সংক্ষেপে গড়গড় করে কিছু তথ্য আর কিছু মন্তব্য বলে গেল। তিনি পেশাদারি ঢঙে সেগুলো শর্টহ্যান্ডে লিখে নিল।

দশরথ কান খাড়া করে ইন্দ্রজিতের কথাগুলো শুনতে লাগল, আর মাঝে-মাঝে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে লাগল।

ডিক্টেশান দেওয়া শেষ হতেই ইন্দ্রজিৎ অনিমেষ সরকারের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মার্বেল পাথরের মেঝেতে আলোর কুচির নকশা ছড়িয়ে ছিল। তার উৎস খুঁজতে মুখ তুলে ওপরে তাকাল ইন্দ্রজিৎ।

কাট গ্লাসের ঝাড়লণ্ঠন থেকে আলোর টুকরো নানান দিকে ঠিকরে পড়ছে।

অনিমেষ সরকারের ঘরটা মাপে ছোট, তবে ছিমছামভাবে সাজানো। ঘরের এককোণে একটা ছোট টেবিলের ওপরে পাশাপাশি শিব ও কালীর ফটো—তাতে চন্দনের টিপ লাগানো।

খাটের ওপরে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন অনিমেষ। ইন্দ্রজিৎকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন : 'আসুন, আসুন। ওই চেয়ারটায় বসুন।'

আগে ততটা খেয়াল করেনি, কিন্তু এখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ করল, অনিমেষ সরকারের গলার স্বরটা কেমন যেন ফ্যাঁসফেসে।

ওঁর দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় বসল ইন্দ্রজিৎ।

'বলুন, জিতেনের খোঁজখবরের কোনও হদিশ পাওয়া গেল?'

কপালে ভাঁজ ফেলে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'এখনও পর্যন্ত পাইনি। তবে কতকগুলো ব্যাপারে খুব খটকা লাগছে। কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ চাইতে এত দেরি করছে কেন। তারপর, কিডন্যাপিংটা যেভাবে হয়েছে—মানে, বাড়িতে এসে যেভাবে ওরা জিতেন্দ্রনাথকে তুলে নিয়ে গেছে, তাতে কাজটা যে খুবই রিস্কি ছিল...। আই মিন, কিডন্যাপাররা হেভি রিস্ক নিয়েছিল। জেনারালি এতটা রিস্ক ওরা নেয় না। কিন্তু নিলই যখন, তা হলে টাকা চাইতে দেরি করছে কেন? যারা এত ডেসপারেট...'

ঠিকই বলেছেন। জাস্টিফায়েড পয়েন্ট। তবে ওরা হয়তো চাইছে, কটা দিন যাক—

ব্যাপারটা থিতিয়ে পড়ুক, তারপর...।'

'কী জানি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ : 'ওসব যাকগে, এবারে আপনার কথা বলুন। এ-বাড়িতে কেমন লাগছে?'

'ভালো কী করে লাগবে বলুন!' কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা একটা টি-টেবিলে নামিয়ে রাখলেন অনিমেষ : 'যার সঙ্গে এতদিন পর দেখা করতে এলাম সে-ই নেই। তার ওপর এরকম বাজে খবর...আমার মনটাই কেমন ডিপ্রেস্‌ড হয়ে গেছে।'

'মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নবনীতা ওদের কেমন বুঝছেন?'

'হুঃ!' প্রবল বিরক্তির একটা শব্দ করলেন অনিমেষ, 'একেবারে উচ্ছন্নে গেছে! যে-কোনও কারণেই হোক, জিতেন ওদের বড্ড লাই দিয়ে মানুষ করেছে। আমাকে ও পরপর বেশ কয়েকটা চিঠিতে ওর দুঃখের কথা লিখেছিল। লাস্ট চিঠিটা পেয়েছিলাম দিনপনেরো আগে। এই দেখুন—' খাট ছেড়ে উঠে পড়লেন অনিমেষ। দেওয়ালের সুদৃশ্য হুকে ঝোলানো ওঁর কয়েকটা জামাকাপড়ের কাছে গেলেন। সেগুলোর পকেট হাতড়ে-হাতড়ে একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করলেন। সেটা খুলে একবার দেখে নিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ইন্দ্রজিতের কাছে এলেন : 'এটা পড়ে দেখুন, তা হলেই মোটামুটি সব বুঝতে পারবেন...।'

ইন্দ্রজিৎ চিঠিটা নিয়ে পড়ল।

হাতের লেখা যে জিতেন্দ্রনাথের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রাণের বন্ধুকে নিজের প্রাণের কথা লিখেছেন জিতেন্দ্রনাথ। বন্ধুকে এ-বাড়িতে আসার জন্য বারবার করে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, '...তোর বিষয়-সম্পত্তি তুই এবারে বুঝে নে। আমাকে মুক্তি দে। আমি বিবাগী হয়ে কোথাও চলে যাই। সংসারে আমার আর লোভ নেই।'

ইন্দ্রজিৎ চিঠিটা ফেরত দিয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনি এ-চিঠির জবাব দেননি?'

'না। ফোনে কথা বলেছিলাম।' পা টেনে-টেনে খাটে গিয়ে বসলেন অনিমেষ, 'ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, তুই শক্ত হাতে ছেলেমেয়ের রাশ টেনে ধর। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদের শাসন করার সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি।'

'আপনার পায়ে কী হয়েছিল?'

'পায়ে!' ইন্দ্রজিতের আচমকা এই প্রশ্নে অনিমেষ কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বছরদশেক আগে হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিলাম। ফিমার বোনের শ্যাফ্‌ট ভেঙে গিয়েছিল। ডাক্তাররা স্টিলের প্লেট বসিয়ে ওটা মেরামত করেছে বটে, তবে পায়ে একটু দোষ থেকে গেছে।' কথা শেষ করে মলিন হাসলেন অনিমেষ। চোখ থেকে চশমাটা খুলে পাঞ্জাবির খুঁট দিয়ে কাচ দুটো মুছলেন। তারপর আলোর দিকে চশমাটা তুলে ধরে কাচদুটো পরখ করে চশমাটা আবার চোখে দিলেন।

'আপনি এ-বাড়িতে এসেই যখন শুনলেন জিতেনবাবু কিডন্যাপড় হয়েছেন, তখন পুলিশে ইনফর্ম করার কথা বলেননি?'

'না, বরং অন্যরকম সাজেশানই দিয়েছিলাম। মহেন্দ্রকে বলেছিলাম, পুলিশে খবর দিলে ব্যাপারটা পাঁচকান হবে। এতে সবারই লজ্জা। তা ছাড়া কিডন্যাপাররা শাসিয়েছে। পুলিশে ইনফর্ম করলে হয়তো জিতেনের বড় রকমের ক্ষতি হয়ে যাবে। হয়তো জিতেনের সঙ্গে কোনওদিনই আমার আর দেখা হবে না...।'

গলার স্বর ভেঙে গিয়ে বুজে এল। অনিমেষ সরকার মুখ নিচু করলেন। পকেট থেকে নীল-কালো চেক-চেক একটা রুমাল বের করে চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ মুছলেন। তারপর কিছুটা সময় নিয়ে মুখ তুললেন। শক্ত গলায় বললেন, 'সেইজন্যেই আমি পুলিশে খবর দিতে বারণ করেছি। জিতেনের বাড়িতে আমি এই প্রথম এলাম, অথচ ওর সঙ্গে দেখা হবে না—এটা ভাবা যায় না।'

'জিতেনবাবু ফিরে আসার জন্যে আপনি কতদিন ওয়েট করবেন?'

'দেখি...আরও সপ্তাদুয়েক তো বটেই! আশা করছি এরমধ্যে কিডন্যাপাররা যোগাযোগ করবে। ওরা যা-ই টাকা দাবি করুক দিয়ে দেব। টাকার অঙ্কে জিতেনের দাম মাপা যায় না। ও আমার কোন ছোটবেলার বন্ধু! জানেন, একবার...।'

জিতেন্দ্রনাথকে নিয়ে স্মৃতিচারণ শুরু করলেন অনিমেষ। স্কুলের গল্প, কলেজের গল্প, একসঙ্গে বেড়ানোর গল্প, বিয়ের গল্প, ব্যবসার গল্প...গল্পের আর শেষ নেই।

ইন্দ্রজিৎ মোটেই বিরক্ত হচ্ছিল না, বরং গভীর মনোযোগে শুনছিল। অনিমেষের কয়েকটা গল্প এমনই যে, খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

কথার মাঝে পরান ঘরে এসে ঢুকল। অনিমেষের চায়ের কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে ও চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই ওর চোখ পড়ল ইন্দ্রজিৎদের দিকে।

পরান যেন সামান্য অবাক হল। কিন্তু কিছু বলল না। আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করতে-করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্রজিৎ অনিমেষ সরকারকে দেখছিল আর ভাবছিল কিডন্যাপিং-এর পিছনে এ-বাড়ির কেউ নেই তো! মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নবনীতা—ওঁরা কি স্রেফ টাকার লোভে জিতেন্দ্রনাথকে কিডন্যাপ করতে পারেন? আর অনিমেষ সরকার? উনি কি কিডন্যাপ করাতে পারেন জিতেন্দ্রনাথকে? কিন্তু সে নিশ্চয়ই টাকার লোভে নয়। অন্য আর কী কারণ থাকতে পারে?

কুয়াশা দিয়ে তৈরি একটা ছবি ইন্দ্রজিতের চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। ছবিটা স্পষ্ট হতে গিয়েও বারবার অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

অনিমেষ সরকারের গল্প শেষ হলে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'একটুকরো কাগজে আপনার অ্যাড্রেস আর সেল-ফোন নাম্বারটা একটু লিখে দেবেন?'

'কেন বলুন তো! এ-বাড়ির ফোন নাম্বার তো আপনি জানেন!'

'না, আপনার সঙ্গে আমার আলাদা কথা বলার দরকার হতে পারে—।'

'ঠিক আছে, লিখে নিন।'

'আমার পেনের রিফিল শেষ হয়ে গেছে।' মিথ্যে কথা বলল ইন্দ্রজিৎ।

তখন নিমরাজি হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন অনিমেষ। হাতে ধরা রুমালটা পকেটে রেখে পা টেনে কোণের টেবিলটার কাছে গেলেন। ড্রয়ার থেকে পেন বের করে একটা ছোট প্যাডের কাগজে খসখস করে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখলেন। তারপর পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে নিয়ে ইন্দ্রজিৎকে দিলেন।

'কী মনে হচ্ছে, মিস্টার চৌধুরী? এই কেসটা আপনি সল্‌ভ করতে পারবেন?'

ইন্দ্রজিৎ হাসল : 'সলভ তো করতেই হবে! এটা আমার প্রথম কেস।'

'উইশ য়ু বেস্ট অফ লাক।' হাসলেন অনিমেষ।

ইন্দ্রজিৎ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আপাতত ওর কাজ শেষ। তবে মারুতি ভ্যানে ওঠার আগে পরানের সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে ও ভুলল না।

ফেরার পথে স্টিয়ারিং-এ বসে ইন্দ্রজিৎ অনেক কথা বলল। দশরথ নানান প্রশ্ন করল ওকে। প্রশ্নের ঢংগুলো এমন যে, সে যেন কোনও অপরাধীকে থানায় ডেকে এনে জেরা করছে।

ইন্দ্রজিৎ হাসিমুখে দশরথের সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল, আর জিনিকে বলল কথাবার্তাগুলো যতটা সম্ভব টুকে নিতে।

'কাল অফিসে এগুলো ওয়ার্ড প্রসেস করে আমাকে একটা ড্রাফট প্রিন্ট-আউট দিয়ো।'

জিনি বলল, 'ও. কে., স্যার।'

উল্টোডাঙা-ভি. আই. পি.-র মোড়ে গাড়ি আসতেই ইন্দ্রজিৎ ঘড়ি দেখল। রাত প্রায় নটা। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। জিনি আর দশরথদারও বোধহয় একই অবস্থা। তাই ও বলল, 'এসো, এখানে কোনও একটা রেস্তরাঁয় আমরা ডিনার সেরে নিই। জিনি, তুমি বাড়িতে একটা ফোন করে দাও। আমি তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব।'

রাস্তার পাশ ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করল ইন্দ্রজিৎ। ওরা গাড়ি থেকে নামল।

জিনি বলল, 'আমি চট করে একটা ফোন করে আসছি।'

ও চলে যেতেই নিজের পেটে হাত বোলাল ইন্দ্রজিৎ : 'দশরথদা, পেটে একেবারে ছুঁচোয় ডন মারছে। তোমারও নিশ্চয়ই একই অবস্থা?'

দশরথ একগাল হেসে বলল, 'না, স্যার। পুলিশে চাকরি করার সময় ইউনিয়ন করতাম। তখন হাঙ্গার স্ট্রাইক করে-করে খিদে সহ্য করার অভ্যেস হয়ে গেছে।'

ইন্দ্রজিৎ হো-হো করে হেসে ফেলল।

'প্রথমেই সবাইকে জানাই—বিছানার চাদরে যে-রক্তের দাগ পাওয়া গেছে, সেটা মানুষের রক্ত নয়...মুরগির রক্ত।'

ইন্দ্রজিতের কথা শেষ হতে-না-হতেই দশরথ চাপা গলায় বলল, 'মোরগেরও হতে পারে।'

সে-কথা ইন্দ্রজিতের কানে গেল বলে মনে হল না। ও তখন কৌতূহল নিয়ে বসে

থাকা মানুষগুলোর মুখের দিকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে।

ওঁরা সকলেই চমকে উঠলেন।

অনিমেষ সরকার, মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নবনীতা—আর পরান।

প্রথম চারজন সোফায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে ছিলেন। আর পরান একপাশে সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়ে।

'কী বলছেন, মিস্টার চৌধুরী!' অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন অনিমেষ সরকার, 'মানুষের রক্ত নয়! মুরগির রক্ত—!'

'মোরগেরও হতে পারে।' আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল দশরথ।

'হ্যাঁ—মুরগির রক্ত।'

দশরথ আবার বিড়বিড় করল। কী বলল ঠিক বোঝা গেল না, তবে অনুমান করা গেল।

'তা হলে বাবার কোনও বিপদ হয়নি!' এবারে সুরেন্দ্র কথা বললেন।

ইন্দ্রজিৎ সুরেন্দ্রর কথাটা যেন শুনতে পেল না। সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসে চোখ বুজে বলল, 'এই ইনফরমেশানটা ল্যাব থেকে পাওয়ার পরই আমি অন্য অ্যাঙ্গল থেকে ব্যাপারটা অ্যানালিসিস করতে শুরু করলাম...।'

হঠাৎই চোখ খুলে হাসল ইন্দ্রজিৎ : 'আর তখনই সব কেমন ঠিকঠাক খাপে-খাপে মিলে গেল। এবং কিডন্যাপিং রহস্যের উত্তরটা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে।'

'সেন কটেজ'-এর ড্রইং-ডাইনিং স্পেসে বসে কথা হচ্ছিল। ঘড়ির কাঁটা প্রায় সাতটার ঘরে পৌঁছে গেছে। বিচিত্র ঢঙের সুন্দর-সুন্দর সব বাতি ঘরটাকে প্রায় দেওয়ালির রাত করে তুলেছে। কিন্তু এখন আবহাওয়া খানিকটা থমথমে। সবাই কেমন যেন গম্ভীর। এমনকী নবনীতাও। আজ, এই মুহূর্তে, যেন গৃহকর্তার অভাবটা টের পাওয়া যাচ্ছে।

রহস্যটা খতিয়ে দেখতে মাত্র তিনদিন সময় নিয়েছে ইন্দ্রজিৎ। জিনির টাইপ করে দেওয়া তথ্য, নিজের স্মৃতি আর বুদ্ধিকে বারবার ব্যবহার করে তারপর একটা অনুমানে পৌঁছেছে। তারপর অনিমেষ সরকারের লিখে দেওয়া ঠিকানা আর ফোন নম্বর ওকে একটা প্রায়-সিদ্ধান্তের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

সুতরাং, পুরোপুরি তৈরি হওয়ার পর ও মহেন্দ্র সেনকে ফোন করেছে। জানিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় চায়ের আসরে ও সব রহস্যের জট খুলবে। চেষ্টা করবে, কিডন্যাপড-হয়ে-যাওয়া জিতেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনতে।

'...কিডন্যাপাররা টাকা চাইতে দেরি করায় আমার প্রথম খটকা লেগেছিল। তা হলে কি কিডন্যাপিংটা যে বা যারা করিয়েছে তারা খুবই বড়লোক? তাদের টাকার দরকার নেই?' একে-একে মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র এবং নবনীতাকে দেখে নিল ইন্দ্রজিৎ : 'সাধারণত কিডন্যাপিং-এর কেসে যেটা হয়, পণবন্দিদের লুকিয়ে রাখাটা ভীষণ রিস্কি বলে কিডন্যাপাররা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ব্যাপারটায় তাড়াহুড়োর বদলে কেমন যেন ডিলি-ড্যালি গা-ছাড়া ভাব লক্ষ

করা যাচ্ছিল।

'সেদিন আপনাদের সবার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হল, কিডন্যাপিং-এর মতো দুঃসাহসিক কাজ করার সাহস আপনাদের কারও নেই। আশা করি আমার এই মন্তব্যকে আপনারা প্রশংসা হিসেবে নেবেন। যাই হোক, বাকি আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি অনিমেষবাবুকে কয়েকটা কথা বলতে চাই—আর সেইসঙ্গে আপনাদের সবাইকে জানাতে চাই, জিতেন্দ্রনাথকে কে কিডন্যাপ করেছে।'

সবাই উসখুস করতে লাগলেন। এ-ওর দিকে অস্বস্তির চোখে দেখতে লাগলেন।

অনিমেষ বললেন, 'বলুন, কী বলতে চান—।'

হাসল ইন্দ্রজিৎ—অপরাধীকে ধরে ফেলার হাসি : 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—জিতেন্দ্রনাথকে আপনিই কিডন্যাপ করেছেন।'

সবাই অবাক চোখে তাকালেন অনিমেষ সরকারের দিকে। ঘরে আলোচনা আর গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। দশরথ মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগল।

'একমিনিট!' সবাইকে কথা থামাতে ইশারা করল ইন্দ্রজিৎ : 'আর-একটা কথা অনিমেষবাবুকে আমার বলার আছে। জিতেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে আপনার সারা জীবনেও আর দেখা হবে না। আপনি যদি একশো বছরও এ-বাড়িতে অপেক্ষা করেন, তা হলেও তাঁর দেখা পাবেন না।'

'কেন, জিতেন কি আর বেঁচে নেই?' অনিমেষ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

'সে তো আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন—।' চোখ মটকে বাঁকা হাসল ইন্দ্রজিৎ।

'বাবা...বাবাকে কি মেরে ফেলা হয়েছে?' মিহি গলায় প্রশ্ন করলেন সুরেন্দ্র।

'বাবা কি এ-বাড়িতে আর কখনও আসবেন না?' মহেন্দ্র।

'কীসব কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছেন। স্টপ বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ।' নবনীতা।

হাত তুলে সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলল ইন্দ্রজিৎ। তারপর : 'অনিমেষ সরকার যতদিন এ-বাড়িতে আছেন ততদিন জিতেন্দ্রনাথের এ-বাড়িতে আসা সম্ভব নয়। ওঁরা দুজন হরিহর-আত্মা হলেও ওঁদের দুজনকে একসঙ্গে পাওয়া ইম্‌পসিবল।'

'কেন? অনিমেষ প্রশ্ন করলেন।

'কারণ, আপনারা দুজনে একই লোক। হরিহর-আত্মা নন—একই আত্মা।'

পলকে সবাই চুপ করে গেলেন। নিস্তব্ধতা পুরু মোলায়েম চাদরের মতো বিছিয়ে গেল সারাটা ঘরে।

অনেক—অনেকক্ষণ পর জিতেন্দ্রনাথের গলায় কথা বললেন অনিমেষ, 'থ্যাংক য়ু, মিস্টার চৌধুরী।' এবং পরচুলা, চাপদাড়ি ও চশমা খুলে ফেললেন। নাকের ডগা থেকে টেনে খুলে নিলেন একদলা প্লাস্টিসিন।

'বাবা!' মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র এবং নবনীতা।

পরান ছুটে গিয়ে জিতেন্দ্রনাথের পা জড়িয়ে ধরল। কান্না-ভাঙা গলায় ডুকরে উঠল, 'বড়বাবু! আপনি বড়বাবু!'

জিতেন্দ্রনাথ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, বললেন, 'হ্যাঁ রে, আমি। আর কোনও চিন্তা নেই।'

এবার ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি খুব প্রমিসিং ডিটেকটিভ, মিস্টার চৌধুরী। এখন বলুন তো, আমাকে আপনি কী করে সন্দেহ করলেন?'

ইন্দ্রজিৎ মাথার ঝাঁকড়া চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর : 'প্রথম সন্দেহ হল, আপনি জিতেন্দ্রনাথের লেখা বহু চিঠির কথা বলেছেন, একটা চিঠি আমাকে দেখিয়েছেনও—কিন্তু আপনার লেখা কোনও চিঠির কথা বলেননি। বাড়িতে আপনার লেখা কোনও চিঠিও পায়নি কেউ। সবসময়েই অনিমেষ সরকার ফোন করে কথা বলতেন।

'দ্বিতীয় : আপনার লাঠিটা নতুন। আর আপনার সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটাটা মাঝে-মাঝে ঠিকঠাক স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছিল।

'তৃতীয় : আমি যখন সন্দেহ থেকেই আপনাকে অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার লিখে দিতে বলছিলাম, আপনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না।

'চার নম্বর : আপনার রুমাল। আমি আর আপনি যখন সেদিন ও-ঘরে বসে—' ইশারা করে ঘরটার দিকে দেখাল ইন্দ্রজিৎ : '—কথা বলছিলাম তখন আপনি রুমাল বের করে চোখ মোছার ভান করছিলেন। সেইসময়ে পরান চায়ের কাপ-প্লেট নিতে ঘরে ঢুকেছিল। আপনার হাতের রুমালটা দেখে ও চমকে উঠেছিল। আমি পরে ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ওটা জিতেন্দ্রনাথের রুমাল। সে-রুমাল আপনার পকেটে গেল কেমন করে!

'অবশ্য তখন আমি আপনাকে কিডন্যাপিং-এর নাটের গুরু বলে সন্দেহ করেছিলাম। পুরোপুরি জিতেন্দ্রনাথ বলে ভাবিনি।'

'সেটা ভাবলেন কখন?'

'ওই রক্তের রিপোর্টটা পাওয়ার পর। তখন বুঝলাম, পয়সা থাকলে একটা নকল কিডন্যাপিং-এর বাবস্থা করা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। তা ছাড়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে কিডন্যাপারদের যেন কোনও মাথাব্যথাই ছিল না। এ ছাড়া আর-একটা ব্যাপার সবচেয়ে উদ্ভট ছিল...।

'কোনটা?'

'আপনার ওই "মানিক" বন্ধু অনিমেষ সরকারকে হঠাৎ করে "জন্ম" দেওয়া। আগে তো কখনও আপনি অনিমেষ সরকারের কথা ছেলেমেয়েদের বলেননি! তা হলে হঠাৎ করে এই ক্ষমতাবান "বন্ধু" এল কোত্থেকে।

'আসলে, মিস্টার সেন—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কম-বেশি দুটো করে ব্যক্তি আছে। একটা নরম, আর-একটা কঠিন। একজনের কাজ ভালোবাসা, অন্যজনের কাজ শাসন করা। যদিও ব্যাপারটা অ্যাবসলিউটলি আপনাদের ফ্যামিলির ব্যাপার—তবুও বলছি, আপনার একটা পারসোনালিটি বহুদিন ধরে ঘুমিয়ে ছিল। অনিমেষ সরকার।

আপনি জিতেন্দ্রনাথ আর অনিমেষ—দুজনকেই সজাগ রাখুন। তবে দুজনের মধ্যে ব্যালান্সটা আপনাকেই মেইনটেইন করতে হবে। বেশি ভালোবাসাও যেমন ঠিক নয়, বেশি শাসনও তাই। যদি আপনি এবার থেকে এটা মেইনটেইন করতে পারেন তা হলে সবার ভালো হবে। আর সীমন্তিনীদেবীও খুশি হবেন।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। সকলের দিকে একবার দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বয়েসে ছোট হয়েও অনেক অপ্রিয় কথা বললাম—হোপ য়ু উড্‌ন্ট মাইন্ড। আমাদের কাজ শেষ—আমরা এবার যাই।'

'একমিনিট, মিস্টার চৌধুরী।' উঠে দাঁড়ালেন জিতেন্দ্রনাথ। তারপর পরানকে বললেন, 'পরান, আমার চেকবইটা নিয়ে আয় তো।'

পরান তাড়াতাড়ি চলে গেল জিতেন্দ্রনাথের ঘরের দিকে।

জিতেন্দ্রনাথ ইন্দ্রজিতের কাছে এসে আন্তরিক গলায় বললেন, 'আপনার কথায় আমি কিছুই মনে করিনি। বরং আপনার কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব। আসলে মেন্টাল টরচারে-টরচারে আমি দিশেহারা হয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। তারপর, ঝোঁকের মাথায় এসব করে ফেলেছি...।'

চেকবই এসে গিয়েছিল। জিতেন্দ্রনাথ পেন নিয়ে খসখস করে একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন। নামের জায়গায় এসে থমকালেন তিনি, 'কী নামে হবে চেকটা?'

'প্রাইভেট আই ডট কম।'

'কত টাকার চেক দিলে, বাবা?' নবনীতা জিগ্যেস করল।

জিতেন্দ্রনাথ ওর দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'দ্যাট ইজ নান অফ ইওর ব্লাডি বিজনেস, লেডি।'

ইন্দ্রজিৎ বুঝল জিতেন্দ্রনাথ তাঁর নতুন ভূমিকা শুরু করে দিয়েছেন।

ওরা তিনজনে বেরিয়ে এল 'সেন কটেজ' থেকে।

মারুতি ভ্যানে ওঠার পর দশরথ বলল, 'স্যার, কাল সকালে এই চেকটা শার্লক হোমসের ছবিতে ঠেকিয়ে তারপর ব্যাঙ্কে জমা দেবেন।'

ইন্দ্রজিৎ হাসল। গাড়ি স্টার্ট দিল।

জিনি বলল, 'আমাদের মাইনে নিয়ে আর তা হলে কোনও চিন্তা রইল না।'

ইন্দ্রজিৎ বলল, 'আজকেও ডিনার সেরে গেলে কেমন হয়?'

'আমি, স্যার, ঠিক এই রিকোয়েস্টটাই করব ভাবছিলাম। কিন্তু সংকোচ আর লজ্জা এসে আমার কণ্ঠরোধ করেছিল। যদিও আমার হাঙ্গার স্ট্রাইকের অভ্যেস আছে, তবুও...।'

মারুতি ভ্যানের মিউজিক সিস্টেম অন করে দিল ইন্দ্রজিৎ। সুরের ঝংকারে দশরথের শেষ কথাগুলো আর শোনা গেল না।

সতেরো শব্দের ম্যাজিক

খুন করলে শাস্তি পেতে হয়। সেটাই নিয়ম। আর আমি তো নিয়মের বাইরে নই। এখন যে এই জেলে বসে ফাঁসির জন্যে অপেক্ষা শুরু করেছি সেটাও নিয়মের মধ্যেই পড়ে।

কিন্তু কারও প্রতি আমার কোনও অভিযোগ নেই। কারণ, খুন করলে যে ফাঁসি হতে পারে সেটা আমার জানাই ছিল। তার ওপর নিজের দোস্তকে খুন করেছি, আর সেই খুনের কথা পুলিশের কাছে কবুলও করেছি।

একটু আগে টেলিফোন করে আমি নিজেই পুলিশে খবর দিয়েছি।

আমার পায়ের কাছে শুভঙ্করের দেহটা চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। ওর গলার ফুটো দিয়ে এখনও রক্ত বেরিয়ে আসছে—ঠিক কর্পোরেশনের ফুটো হয়ে যাওয়া জলের পাইপের মতো। হ্যাঁ, শুভঙ্করের হাত-পা তখনও সামান্য নড়ছিল। ঝাপসাভাবে একটু-আধটু চিন্তাও বোধহয় করতে পারছিল। ও কী ভাবছিল আমি জানি। আমিও একই কথা ভাবছিলাম। সতেরোটা শব্দের জন্যে ওকে মরতে হল। আমাকে মারতে হল ওই ক'টা শব্দের জন্যে। ওই সতেরোটা শব্দ দুনিয়ার আর কেউ জানে না। শুধু আমি জানি। আর শুভঙ্কর জানত।

এও জানি, সবাই অবাক হয়ে ভাববে বহুদিনের পুরোনো বন্ধু শুভঙ্কর মিত্রকে কেন আমি খুন করলাম। বিশেষ করে যে-শুভঙ্কর দিনকয়েক আগেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে একরকম অলৌকিকভাবে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

যদি আপনারা বিরক্ত না হন তা হলে শুরু থেকে সব খুলে বলি—শুধু ওই সতেরোটা শব্দ ছাড়া।

শুভঙ্কর আর আমি একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, কলেজে পড়েছি। তবে ওই একসঙ্গে পড়েছি পর্যন্তই। পড়াশোনায় কখনও ওর ধারেকাছেও আমি আসতে পারিনি। পড়াশোনায় ও যদি জিরাফ হয়, আমি তা হলে ছারপোকা—এতটাই উচ্চতার ফারাক ছিল। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ছিল শুভঙ্কর। কী সহজভাবেই না আমার সঙ্গে মিশত! পরের উপকার করার জন্যে সবসময় এক-পা বাড়িয়েই থাকত। পরের দুঃখে দুঃখ পেত, পরের সুখে সুখ। আমাকে পড়াশোনায় ভালো করে তোলার ব্যাপারেও ও কম মেহনত করেনি। কিন্তু ধন্য আমার অপদার্থ মেধা! সে তার জায়গা থেকে একচুলও নড়েনি।

সুতরাং শুভঙ্কর সব পরীক্ষায় পাশ করত লাফিয়ে-লাফিয়ে, আর আমি গড়িয়ে-গড়িয়ে। কিন্তু একদিনের জন্যেও ওকে আমি ঈর্ষা করিনি। ও ছিল এমন মানুষ যাকে ঈর্ষা করা যায় না, শুধু ভালোবাসা যায়।

শুভঙ্কর বইয়ের পোকা ছিল। নানান ধরনের বই পড়ত ও। বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে শুরু করে চীনা আর তিব্বতি পুঁথির কপিও ওর প্রিয় ছিল। সবসময় দেখতাম চিন্তায় কেমন বিভোর হয়ে আছে। কিছু জিগ্যেস করলেই বলত, আত্মার শক্তির মূল রহস্যে পৌঁছনো দরকার। তা হলেই হাতে পাওয়া যাবে চরম শক্তি।

আমি যে ওর কথাবার্তার একটি বর্ণেরও মানে বুঝতাম না, সেটা নিশ্চয়ই আর বলার প্রয়োজন নেই!

দুর্দান্ত রেজাল্ট করে রীতিমতো দার্শনিক হয়ে শুভঙ্কর কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ইউনিভার্সিটির দিকে এগোল। আর আমি সেই গড়িয়ে-গড়িয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়ে পড়াশোনার চাকা থামালাম। এবং চাকরি পেলাম পুলিশে।

শুভঙ্করের সঙ্গে যোগাযোগ আর ছিল না। কী করে যেন দশ-দশটা বছর কেটে গেল। তারপর হঠাৎই একদিন শুভঙ্করের সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

ওর বয়েস যেন দশের জায়গায় পনেরো বছর বেড়ে গেছে। মাথায় অনেকটা টাক পড়েছে। আর জ্ঞানও নিশ্চয়ই বহু-বহুগুণ বেড়েছে এই সময়ে। কারণ, এখনও ওর চোখে সেই কলেজজীবনের ভাবুক দৃষ্টি। আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল দীপ্তি। চশমার কাচদুটোও যেন সেই দীপ্তিতে চকচক করছে। একেই কি বলে জ্ঞানের আলো?

'আরে, প্রদীপ না!'

'শুভঙ্কর, তুই!'

এরপর রাস্তায় দাঁড়িয়েই হাত ঝাঁকানো, পিঠ চাপড়ানো, আর পুরোনো দিন নিয়ে নানা কথা।

'কী করছিস এখন তুই?' শুভঙ্কর জিগ্যেস করল।

'আমি এখন চিফ মিনিস্টারের বডিগার্ড।' আমি একটু গর্বের সঙ্গে বললাম। রাজ্যের হর্তাকর্তা বিধাতার প্রাণরক্ষী হওয়াটা নিশ্চয়ই খুব ফেলনা নয়।

খেলাধুলো বরাবরই আমার প্রিয়। ঝুঁকি নিতেও খারাপ লাগে না। তাই এই পাহারাদারির কাজটা বেশ মেজাজি ঢঙে করতে পারি। এই কাজের কতকগুলো ইন্টারেস্টিং দিক আছে। উঁচুমহলের কিছু-কিছু গোপন খবর আগেভাগেই জানা যায়। সেজন্যে বাঁকা-পথে কমবেশি কু-প্রস্তাব যে আসেনি এমন নয়। কিন্তু আমি অনায়াসে সেগুলো খারিজ করে দিয়েছি। বিশ্বাসঘাতকতা আমার ভৌত বা রাসায়নিক ধর্মে নেই। তা ছাড়া দেশের জন্যে আমি প্রাণ দিতেও রাজি, নিতেও।

অনেক সময় মুখ্যমন্ত্রীর কোনও অনুষ্ঠানে পাশ পাওয়ার জন্যে কেউ-কেউ আমাকে ধরে। আমি এরকম পাশ অনেককেই জোগাড় করে দিয়েছি। শুভঙ্করও আমাকে হঠাৎ একই অনুরোধ করল।

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে সামনের শনিবার চিফ মিনিস্টার একটা আলোচনা-চক্র ডেকেছেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খরা, বন্যা ইত্যাদি নিয়ে বিশিষ্ট

বক্তারা তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হিসেবে হাজির থাকবেন নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন। তিনি বলবেন, এইসব বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে কীভাবে উন্নত করা যায়।

শুভঙ্কর একেবারে নাছোড়বান্দার মতো আমাকে চেপে ধরল।

আমি ওর ফোন-নাম্বার নিলাম। বললাম, দেখছি, কী করা যায়। যদি একটা পাশ জোগাড় করতে পারি তা হলে ওকে ফোন করে দেব।

ও বলল, 'স্টেজের একটু কাছাকাছি দিতে চেষ্টা করিস।'

তাই দিলাম। এবং অনুষ্ঠানের দিন দেখি শুভঙ্কর তৃতীয় সারিতে বসে আছে। ওর টানা-টানা ভাবুক চোখ বিশিষ্ট মানুষদের আলোচনা শুনতে মগ্ন। অবশ্য আমার কানে ওসব কথাবার্তা ঢুকছিল না। আমি দর্শকদের ওপরে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলাম। কারও এতটুকু বেচাল দেখলেই আমার ক্ষিপ্র ডানহাত পৌঁছে যাবে কোমরে আঁটা সার্ভিস রিভলবারে।

শেষ পর্যন্ত রিভলবারে হাত আমাকে দিতেই হল।

হলের চতুর্থ সারি থেকে তিনজন লোক হঠাৎই প্যাসেজে বেরিয়ে এল। তারপর আচমকা চিৎকার করে ওদের দুজন রিভলবার বের করে গুলি ছুড়তে শুরু করল।

এসব ঘটনা তো আপনারা কাগজে পড়েছেন। তবে আমি আপনাদের যেসব খুঁটিনাটি তথ্য দেব সেগুলো কাগজে বেরোয়নি।

অসমের একটা জঙ্গি দল—নাম, বিটা ফ্রিডম—গত কয়েকমাস ধরেই কলকাতায় নানারকম উৎপাত করছিল। এরা গুলি ছোড়ার আগে চেঁচিয়ে সেই নামটাই বলেছে। আর এদের সুইসাইড স্কোয়াড কখনও বেঁচে ফেরার কথা ভাবে না।

এসব জঙ্গি-ফঙ্গির কেসে আমিও ওদের সঙ্গে একমত। ওদের বাঁচিয়ে অ্যারেস্ট করার কোনও সিন নেই। অন্তত আমার কাছে। তাই স্টেজের একপাশ থেকে চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে নেমে এলাম নীচে—প্রথম সারির দর্শকদের সামনে। রিভলবারসমেত ডানহাত তৈরি।

ওদের গুলিতে একটা ফুলদানি ঠিকরে পড়ল। স্টেজের দুজন আহত হয়ে বসে পড়েছে। সবাই দুদ্দাড় করে ছুটে পালাচ্ছে।

দর্শকরাও চিৎকার করে উদভ্রান্তভাবে ছোটাছুটি শুরু করেছে। তারই মধ্যে দেখি শুভঙ্করও ছুটে আসছে আমার কাছে।

আমি নিখুঁত নিশানায় গুলি করলাম। একজনের কপালে, আর-একজনের বুকে। ওরা জমার খাতা থেকে পলকে ঢুকে পড়ল খরচের খাতায়।

তিন নম্বরকে গুলি করতে গিয়েই আমি থমকে গেলাম।

লোকটা পিন টেনে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে দিয়েছে প্যাসেজে—আমার কাছাকাছি। তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে।

ওকে গুলি করার কথা ভুলে গিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম গ্রেনেডটার ওপরে—

যদি ফেটে যাওয়ার আগে ওটাকে দরজার বাইরে ফাঁকা জায়গায় ছুড়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু আমাকে হারিয়ে দিয়ে এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় শুভঙ্কর মিত্র গ্রেনেডটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পরদিনের কাগজে আমাদের দুজনকেই হিরো বানিয়ে দেওয়া হল। পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরকারি পুরস্কারও ঘোষণা করা হল। কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুভঙ্কর মিত্র একেবারে গ্রেনেডটার ওপরে গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী-এক আশ্চর্য কায়দায় ও গ্রেনেডটাকে এমনভাবে দরজা দিয়ে ছুড়ে দিয়েছিল যে, গ্রেনেডটা ফেটে গেলেও কেউই মারাত্মকরকম জখম হয়নি।

গ্রেনেডের বিস্ফোরণে কাঠ, লোহা, কাচ তীরবেগে ছিটকে গেছে নানা দিকে। কিন্তু সবাই বেঁচে গেছে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় শুভঙ্কর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার ছ'ঘণ্টা পর ওর জ্ঞান ফিরেছিল। তারপর প্রায় তিরিশ ঘণ্টা ও একেবারে শয্যাশায়ী ছিল।

সব মিলিয়ে বিশ্বাস-হতে-চায়-না এমন একটা ঘটনা শুভঙ্কর ঘটিয়ে দিয়েছে।

দু-দিন পর সন্ধেবেলা ওর বাড়িতে গেলাম।

ও আমাকে দেখে খুশি হয়ে হাসল। হাসিটা কলেজজীবন থেকে নেওয়া। দেখে ভালো লাগল। আমাদের দুজনের বয়েস কমতে লাগল।

'বোস, প্রদীপ। একেবারে কান ঘেঁষে বেঁচে গেছি, কী বলিস! বছরচারেক আগে তিব্বতে একবার এরকম সিচুয়েশন হয়েছিল।'

'ওসব তিব্বত-টিব্বতের ব্যাপার জানি না। তুই সেদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিস।'

'আরে না, না। আমি শুধু সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম...তারপর সব কপাল। লাক, বুঝলি, লাক!'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'তুই বলছিস লাক। কিন্তু কাগজে তোর কথা যা লিখেছে.... ফ্যান্টাসটিক। লিখেছে, তুই চোখের পলকে যে-অ্যাকশান নিয়েছিস তা এক-কথায় অকল্পনীয়। কেউ দেখেশুনে কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাজ শেষ।'

শুভঙ্কর লজ্জা পেয়ে গেল। চোখ নামিয়ে বিনয়ের সুরে আমতা-আমতা করে বলল, 'ওরা সবকিছু ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লেখে। আসলে আমার দিকে কেউ অতটা খেয়াল করেনি...।'

আমি অল্প হাসলাম : 'আমি কিন্তু খেয়াল করেছি। কারণ, খেয়াল করাটাই আমার কাজ।'

শুভঙ্কর চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। ওর চোখে কেমন যেন একটা ধরা-পড়ে-যাওয়ার ভয়।

আমি বলতে লাগলাম, 'শুভঙ্কর, তোর আর গ্রেনেডটার মাঝে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুই আমাকে পেরিয়ে কী-করে ওটার কাছে গেলি সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। এই দেখলাম তুই দূরে দাঁড়িয়ে—তারপরই দেখি তুই একেবারে গ্রেনেডটার ওপরে। তা ছাড়া...।'

শুভঙ্কর আপত্তির ঢঙে মাথা নেড়ে আমাকে থামাতে চাইল, কিন্তু আমি থামলাম না। বলার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল।

'তা ছাড়া তুই পড়েছিলি গ্রেনেডটার একেবারে ওপরে। ওটা ফেটেছে তোর বডির নীচে। উর্ধ—আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না, কারণ, আমি বলতে গেলে তোর ওপরে গিয়ে পড়েছিলাম। গ্রেনেডের এক্সপ্লোশানের ধাক্কায় তুই ছিটকে শূন্যে উড়ে গিয়েছিস। তারপর—তুই কি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরেছিলি?'

শুভঙ্কর গলাখাঁকারি দিয়ে সময় নিল। তারপর বলল, 'না, আসলে ঠিক তা নয়...।'

আমি ঠান্ডা চোখে শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'শুভঙ্কর, তুই হয়তো ব্যাপক বুদ্ধিমান। কিন্তু তাই বলে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, আমি এক ব্যাপক মূর্খ।'

শুভঙ্কর তা সত্ত্বেও চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চোখ থেকে চশমা খুলে চোখ মুছল। তারপর : 'তুই কি ভালো করে কাগজ পড়িসনি! গ্রেনেডটা অনেকটা দূরে ফেটেছে...।'

'শুভঙ্কর, আমি কিন্তু তোর কাছেই ছিলাম।' অনেকটা গার্জেনি সুরে বললাম আমি।

শুভঙ্করের মুখ হঠাৎই কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ও চোখ বুজে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেলল আবার। মেপে নেওয়ার চোখে তাকাল আমার দিকে। কিন্তু ওর দৃষ্টিতে কোনও তীব্র ভাব ছিল না—বরং কেমন যেন বিষণ্ণ, শান্ত। ওকে দেখে আমার মায়া হচ্ছিল।

শুভঙ্কর একচিলতে হাসল। অদ্ভুত এক দুর্জ্ঞেয় হাসি। তারপর হঠাৎই চাঙ্গা হয়ে উঠে টান-টান হয়ে বসল চেয়ারে, বলল, 'নাঃ, আর গোপন করার কোনও মানে হয় না। একদিন তো কাউকে বলতেই হবে! তা তোকেই বলি।'

এরপর ও সব খুলে বলল আমাকে।

না, ওর সব কথা আমি আপনাদের বলতে পারব না। অন্তত সতেরোটা শব্দ—হ্যাঁ, সতেরোই তো—আমাকে বাদ দিতে হবে। এই সতেরোটা শব্দ কোনওদিন কাউকে বলা যাবে না।

বাকিটা আপনাদের বলছি।

'তুই দেখছি কলেজ-লাইফের ব্যাপারগুলো মনে রেখেছিস—' শুভঙ্কর বলল, হাসল পুরোনো কথা ভেবে : 'সেই যে ক্যান্টিনে বসে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা তর্ক। কথা বলতে-বলতে নির্জন পথে উদ্দেশ্যহীন হেঁটে যাওয়া। আত্মা নিয়ে কত কী বকবক করে গেছি আমি। আর তুই একটুও বিরক্ত না হয়ে চুপচাপ শুনে গেছিস—মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়ে। সেদিন ইনডোর স্টেডিয়ামের ওই ব্যাপারটার পর আরও বেশি করে সব মনে পড়ে গেছে। তুই বলতি, আত্মার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। চিন্তার গভীরতা আর তীব্রতা দিয়ে সেটা প্রমাণ করা যায়। শুধুমাত্র আত্মার শক্তি দিয়ে এক-পা-ও না হেঁটে, কোনও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই কোনও মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে। তুই বলতি, আত্মার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

এসব পুরোনো কথা বলতে গিয়ে নিজেকে কেমন বোকা-বোকা লাগছিল। এসব অবাস্তব উদ্ভট চিন্তার কোনও মানে হয়। শুধুমাত্র চিন্তার জোরে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যাওয়া! রাবিশ!

কিন্তু সেদিন ইনডোর স্টেডিয়ামের ওই ব্যাপারটা! আমি তো সেখানে হাজির ছিলাম, সব দেখেওছি!

কেমন যেন হতবুদ্ধিভাবে ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম শুভঙ্করের দিকে। কী বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

হেসে ফেলল শুভঙ্কর। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলে এল আমার পাশে। পিঠে আলতো চাপড় মেরে বলল, 'প্রদীপ, তুই যা-যা বললি সেগুলো একদিক থেকে ভুল, আবার একদিক থেকে ঠিকও বটে। যখন এসব কথা বিশ্বাস করতাম তখন আমার বয়েস কম ছিল, জানও। শুধু আত্মার পক্ষে এসব করা সম্ভব নয়। কিন্তু...' ওর চোখ উত্তেজনায় চকচক করে উঠল, ওর কথা বলার গতিও বাড়ছিল একইসঙ্গে : 'কিন্তু এমন কিছু স্পেশাল টেকনিক আছে যা মনের সঙ্গে আমাদের জগতের সবরকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যোগাযোগ তৈরি করে দেয়। মানে, মাইন্ড আর ফিজিক্যাল ফোর্সের একটা স্পেশাল লিঙ্ক। ফলে, শুধুমাত্র মন দিয়ে, আত্মার শক্তি দিয়ে সবকিছু—যা খুশি করা যায়। যেমন ধর, সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে চাস? চোখের পলকে সেটা সম্ভব, প্রদীপ। একটা গ্রেনেডের এক্সপ্লোশানকে সামাল দিতে হবে? কোনও ব্যাপারই নয়! তুই তো নিজের চোখেই দেখেছিস! তবে এ-কাজেও বহু শক্তি খরচ করতে হয়। শক্তির নিত্যতা সূত্রকে তুই তো আর এড়াতে পারিস না! দেখলি তো, ওই ব্যাপারটার পর আমার কী সাঙ্ঘাতিক অবস্থা হয়েছিল! অবশ্য ওই কাজটা অনেক টাফ ছিল। সেই তুলনায় একটা বুলেটের নিশানা ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজ মোটামুটি জলভাত। আর তার চেয়েও সহজ হল ফায়ার করার আগেই বুলেটগুলো নিজের পকেটে নিয়ে আসা। তা হলে ফায়ার করার ব্যাপারটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। কোহিনুর দেখবি? নিয়ে আসব?'

'কোহিনুর!' ওর আচমকা প্রশ্নে আমি হাঁ হয়ে গেলাম।

হাসল শুভঙ্কর : 'হ্যাঁ রে, হিরে কোহিনুর।'

'তুই ভবিষ্যৎ দেখতে পাস?' আমি প্রসঙ্গ পালটে জিগ্যেস করলাম।

'না। ওসব ভবিষ্যৎ-টবিষ্যৎ দেখার ব্যাপারটা...।'

'তুই মনের কথা টের পাস? টেলিপ্যাথি?'

'ওঃ, ক্যান্টিনের আড্ডার টপিকগুলো তুই ভুলিসনি দেখছি! না, ভাই, টেলিপ্যাথি জানি না— অন্তত এখনও। দু-চারবছর লেগে থাকলে হয়তো কোনও রেজাল্ট পেলেও পেতে পারি। তবে এখনই আমি অনেক কিছু পারি যেগুলো টেলিপ্যাথির চেয়ে কম ইন্টারেস্টিং নয়। ইচ্ছে করলেই আমি যে-কোনও শব্দ, যে-কোনও কথা শুনতে পারি। যা ইচ্ছে তা-ই দেখতে পাই। যেমন ধর, অ্যাস্টারয়েড বেল্টের গ্রহাণুগুলোর চেহারা আমি দেখেছি—এবড়োখেবড়ো পাথর...।'

আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে চাপা স্বরে বললাম, 'আমাকে কিছু একটা করে দেখা তো!'

হাসল শুভঙ্কর। ভারি অদ্ভুত সে-হাসি। যেন অঙ্কে ডক্টরেট কোনও পণ্ডিতকে ক্লাস ওয়ানের অঙ্ক করতে বলা হয়েছে।

আমি অবাক চোখে শুভঙ্করকে দেখছিলাম। বিশ্বাস হতে চায় না, অথচ বিশ্বাস না করেও তো উপায় নেই। এই মানুষটা সব পারে! এই মানুষটা এখন ভগবান!

দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাস, বছরের-পর-বছর ও একই স্বপ্ন নিয়ে কাটিয়েছে। নানারকম জটিল তত্ত্ব, পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করেছে। বহুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। সফল হতে পারেনি। কিন্তু তিলতিল করে ও এগিয়ে গেছে সাফল্যের দিকে—থামেনি একলহমার জন্যেও। শেষ পর্যন্ত হাতের নাগালে এসেছে অমৃতের পাত্র...।

আমাকে এসব কথা বলতে নিশ্চয়ই ওর ভালো লাগছিল। নিজের নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর কৃতিত্বের কথা কার না বলতে ইচ্ছে করে!

'কিছু একটা করে দেখাব?' শুভঙ্কর যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলল, 'দাঁড়া—' ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল ও : 'ওই জানলাটা দেখছিস?'

ঘরের একটা বন্ধ জানলার দিকে তাকালাম। খট করে শব্দ করে জানলাটা খুলে গেল। পরমুহূর্তেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।

'টিভিটা দেখ!' বলল শুভঙ্কর।

সঙ্গে-সঙ্গে টিভি-টা অন হয়ে গেল।

'ওটার দিকে তাকিয়ে থাক।'

টিভি-টা অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই আবার ফিরে এল। কিন্তু দেখলাম টিভি-টার সারা গায়ে মিহি বরফকুচি লেগে আছে।

'ওটাকে হিমালয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।' হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল শুভঙ্কর।

এবার ও তীব্র চোখে টিভি-র মেইন্‌স কর্ডটার দিকে তাকাল।

আমার হতভম্ব দৃষ্টির সামনে কর্ডটা শূন্যে ভেসে উঠল সাপের মতো—তার শেষ প্রান্তে প্লাগটা যেন সাপের ফণা। ওটা এগিয়ে যাচ্ছিল দেওয়ালে বসানো সকেটের দিকে।

কিন্তু সকেটের কাছে পৌঁছনোর আগেই প্লাগটা আচমকা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

শুভঙ্কর কেমন একটা বিরক্তির শব্দ করে উঠল, বলল, 'নাঃ! দাঁড়া, তোকে আরও কঠিন কিছু দেখাই।'

ওর শরীর থরথর করে কাঁপছিল। কাঁপা গলায় ও বলল, 'টিভি-টার দিকে লক্ষ কর, প্রদীপ। সকেটে প্লাগ না গুঁজেই ওটা তোকে চালিয়ে দেখাব। স্রেফ বাতাস থেকে ইলেকট্রন নিয়ে...।'

রঙিন টিভি সেটটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল শুভঙ্কর।

হঠাৎই পাওয়ার অন হওয়ার ছোট্ট লাল বাতিটা জ্বলে উঠল। বারকয়েক দপদপ করে জ্বলল-নিভল। তারপর জ্বলেই রইল। টিভির স্পিকার থেকে শব্দ বেরোতে শুরু করল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আলতো পায়ে পৌঁছে গেলাম ওর পেছনে। কোমর থেকে সার্ভিস রিভলবারটা বের করে নিলাম।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, একটা বিরাট জুয়া খেলছি—কিন্তু এ ছাড়া আর তো কোনও উপায়ও নেই।

রিভলবারের বাঁট দিয়ে ওর বাঁ-কানের পেছনে প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিলাম। টুঁ শব্দ না-করে শুভঙ্করের দেহটা ভাঁজ খেয়ে উলটে পড়ল মেঝেতে। আরও একটা ঘা বসিয়ে দিলাম ওর মাথায়। পরখ করে নিশ্চিন্ত হলাম। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ওর জ্ঞান আর ফিরছে না। সুতরাং আমার কাজ শুরু করলাম।

পেশাদারি ঢঙে ওর ফ্ল্যাট তন্নতন্ন করে সার্চ করতে লাগলাম। একটু পরেই একটা ড্রয়ারে ওর গবেষণার কাগজপত্রগুলো পেলাম। যা চাই সবই রয়েছে সেখানে। লেখা রয়েছে ওর অলৌকিক ক্ষমতার গোপন রহস্য। জুয়ায় আমি জিতেছি।

টেলিফোন তুলে নিয়ে পুলিশে ফোন করলাম।

তারপর মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে থাকা শুভঙ্করের গলায় রিভলবার ঠেকিয়ে ফায়ার করলাম। পুলিশ এসে পৌঁছতে-পৌঁছতে শুভঙ্কর মিত্র মরে কাঠ।

শুভঙ্কর আমার বন্ধু ছিল। এমন বন্ধু যাকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু ওই গোপন রহস্য জানার পরেও বিশ্বাস করা যায় কি না সেটাই প্রশ্ন।

মাত্র সতেরোটা শব্দে শুভঙ্করের অলৌকিক ক্ষমতা পাওয়ার রহস্য ফাঁস করা আছে গবেষণার কাগজে। এই মন্ত্রটা একবার কেউ পড়ে নিলেই হল! চোর ডাকাত-খুনি-পাগল—যে-কেউ এটা পড়ে নিয়ে কাজে লাগাতে পারে, এতই সহজ সেই সূত্র।

শুভঙ্কর এমনিতে খুব সৎ, আদর্শবাদী। কিন্তু এই ক্ষমতা হাতে নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ও নিজেকে ভগবান ভাবতে শুরু করবে। তখন?

ধরা যাক, আপনি ওই সতেরোটা শব্দ জেনে গেছেন। তখন আপনি অনায়াসে যে-কোনও ব্যাঙ্কের ভল্টে ঢুকে পড়তে পারবেন, যে-কোনও বন্ধ ঘরে উঁকি মারতে পারবেন, দেওয়াল ভেদ করে ইচ্ছেমতো যাতায়াত করতে পারবেন। পিস্তল বা রিভলবারের গুলি আপনাকে খতম করতে পারবে না। গ্রেনেড কিংবা অ্যাটম বোমার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েও আপনার বিন্দুমাত্র ভয় করবে না। কারণ চোখের পলকে—শুধু ইচ্ছে করলেই—আপনি হাজার-হাজার মাইল দূরে চলে যেতে পারবেন।

এরকম ক্ষমতা যদি পান, তখন?

লোকে বলে, ক্ষমতা থেকে দুর্নীতির জন্ম হয়। সুতরাং চূড়ান্ত ক্ষমতা হাতে পেলে জন্ম নেবে চূড়ান্ত দুর্নীতি। ওই সতেরোটা শব্দই চূড়ান্ত ক্ষমতার শেষ কথা। সুতরাং, শুভঙ্কর আমার বন্ধু হলেও আমি ওকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছি। ওই সতেরোটা শব্দের ক্ষমতা হাতে নিয়ে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না—শুভঙ্করকেও না।

তবে নিজেকে বিশ্বাস করতে আমার আপত্তি নেই।

আপনার কোনও আপত্তি আছে নাকি?

সাবধান! সাপ আছে

'চোখ বুজে ঘুরে দাঁড়াও, বিশ্বাস,' অনন্ত কর মিঠে সুরে বললেন। সুতরাং আমি চোখ বুজলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম, অনেকটা ঘুমিয়ে-চলা মানুষের মতো। শুনলাম, অনন্ত কর সিন্দুক খোলার কম্বিনেশান ডায়াল ঘোরাচ্ছেন।

ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক।

ডানদিকে ষোলো ঘর। মনে-মনে হিসেব করলাম।

ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক।

বাঁদিকে এগারো ঘর। শয়তানি হাসি হাসলাম।

ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক।

'ডানদিকে ছাব্বিশ,' জোরে বলে উঠলাম আমি। কিন্তু সৌভাগ্যবশত অনন্ত কর কানে কম শোনেন।

'ঠিক আছে, বিশ্বাস,' বললেন অনন্ত কর, 'এবার ফিরে দাঁড়াতে পারো'।

ফিরে দাঁড়ালাম। লুব্ধ চোখে দেখলাম দশ আর একশোর নোটের বান্ডিলগুলো : দু-লক্ষ চল্লিশহাজার টাকা। আমার শোওয়ার ঘরের তাকে রাখা তাসের প্যাকেটের মতো সুবোধ শিশু হয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে বান্ডিলগুলো।

অনন্ত কর আরও একটা একশোর বান্ডিল সযত্নে আগেরগুলোর সঙ্গে যোগ করলেন। দু-লাখ পঞ্চাশ হাজার।

জলতরঙ্গের শব্দ করে সিন্দুকের ভারি দরজাটা বন্ধ করলেন তিনি।

'আজকের মতো কাজ শেষ,' অনন্ত বললেন, 'সাড়ে পাঁচটা বাজে। তুমি এবার যেতে পারো। আমাকে আরও ঘন্টাখানেক কাজ করতে হবে।'

'আচ্ছা, স্যার,' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তৃষ্ণার্ত চোখে তাকালাম সিন্দুকটার দিকে—যেন একটা কালো কোলাব্যাঙ বসে আছে। আর অনন্ত কর—তিনিও কোলাব্যাঙ, তবে সাদা—সোজা হয়ে দাঁড়ালেন নিজের পায়ে। লোকটা সত্যিই দয়ালু, যাকে দেখলে আমার ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে যায়। তা না হলে হয়তো সেই মুহূর্তেই তাঁর দয়ালু মস্তকে এক ঘা বসিয়ে, সিন্দুকের ডায়াল নম্বর অনুযায়ী (আমার জন্মতারিখের চেয়েও যেটা আমার বেশি মুখস্থ) ঘুরিয়ে নোটের বান্ডিলগুলো আমার টেবিলের ড্রয়ারে লুকোনো পলিথিনের ব্যাগে ভরে (দীর্ঘ কয়েকবছরের চাকরি-জীবনে তেতাল্লিশটা ব্যাগ আমি জমিয়ে ফেলেছি টিফিন নিয়ে আসার অছিলায়—) সোজা রাস্তায় নেমে চম্পট দিতাম। লোকে ভাবত 'জনৈক নিরপরাধ, নিরীহ, কলিকাতাবাসী কৈকেয়ী-ঘরনির আদেশে ক্রয়-কর্ম সমাপনান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। অহো, উহার প্রতি আমাদিগের সমবেদনা রহিল।' সুতরাং কাজ শেষ।

কিন্তু সেটা ছিল আমার প্ল্যান নাম্বার ওয়ান। 'কর ফাইনান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানি'তে মাসখানেক কেরানি হিসেবে কাজ করার পর ওই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমার মন রুখে দাঁড়িয়েছে। এত অবুদ্ধিমানের মতো এ-কাজ করাটা সুবিবেচনার পরিচয় নয়। অনন্ত করের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের টেবিলের দিকে এগোতে-এগোতে পরিকল্পনাটা আরও একবার নাকচ করলাম।

'কর ফাইনান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানি'র অফিস বলতে একটা 'এল' প্যাটার্নের ঘর, তার 'সবেধন নীলমণি' একটিমাত্র দরজা, কোনও জানলা নেই। অনন্ত করের টেবিল এবং সিন্দুকটা 'এল'-এর ক্ষুদ্রতর বাহুতে অবস্থিত, এবং 'এল'-আকৃতির জন্যে আমার টেবিল থেকে অদৃশ্যমান। আর 'এল'-এর দীর্ঘতর বাহুর প্রথম বাসিন্দা মিসেস রাও, আমাদের দু-হাজার বছরের পুরোনো স্টেনোগ্রাফার, এবং দ্বিতীয় বাসিন্দা আমি। কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা আমার চতুষ্কোণ 'বাসস্থান', তারপর দুটি সোফা অতিথিদের জন্যে। অবশেষে—সবশেষে, দরজা। এ ছাড়াও কয়েকটা ফাইলিং ক্যাবিনেট, একটা জল-শীতল যন্ত্র, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, টেলিফোন, কিবোর্ড ইত্যাদি নিজের-নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং সেই কারণেই অফিসের যে-ঘাট-সরেটা ম্যাপ আমি এঁকেছি তাতে এগুলোর কোনও ছবি নেই।

এককথায় বাড়িটা যেন চুরি-ডাকাতির সুযোগ-সুবিধের দিকে লক্ষ রেখেই তৈরি করা হয়েছে—অর্থাৎ, শুধু আমার জন্যে। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সাহসী, তস্করসম্রাট শ্রীনলিনীরঞ্জন বিশ্বাসের জন্যে। বেআইনি কুকাজের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী, যার সম্পর্কে সারা পৃথিবী একসুরে বলবে, 'লোকটা জীবনের যে-কোনও ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারত।' কিন্তু কেউ জানবে না সে হল কলকাতার অন্যতম স্নেহাস্পদ বাসিন্দা নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস।

এ পর্যন্ত আমি শুধু ম্যাপ এঁকে এবং তেত্রিশটা ব্যাগ জোগাড় করেই ক্ষান্ত হয়েছি। আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রয়োগে সিন্দুকের কম্বিনেশান নম্বরটাও জেনেছি (একবার, আমার কানের হিসেব নির্ভুল কি না পরীক্ষা করতে, আমি চোখ বুজে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন স্পষ্টই অনন্ত করকে কম্বিনেশান ঘোরাতে দেখেছি। বলাই বাহুল্য আমার চক্ষু এবং কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়েছে)। অনন্ত করই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই কম্বিনেশান নম্বর জানেন। সুতরাং, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, সিন্দুক লুঠ হওয়ার পর তিনি যেন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন।

অনেক ভাবনাচিন্তার পর কতকগুলো পন্থা আমাকে বর্জন করতে হয়েছে। যেমন, অনন্ত করকে খুন অথবা আঘাত করতে আমি পারব না। তার প্রধান কারণ, আমার মানবিকতা বোধ এবং দয়া এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আর দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিমান এবং সাহসী হলেও অনন্ত করকে খুন, অথবা খুনের কাছাকাছি কিছু না-করে কীভাবে তাঁর উপস্থিতিতে সিন্দুক খালি করব তা আমি ভেবে পাইনি। ফলে শাস্তি এড়ানোর আশা তখন হয়ে পড়বে দুরাশা। অবশ্য এমন একটা ওষুধ আছে যেটা রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে

দিলে চিরকালের মতো স্মৃতিভ্রংশ দেখা দেয়। বাথরুমে বসে সেই ওষুধ নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। কিন্তু সেই সব ধারাবাহিক পরীক্ষার শেষ রিপোর্ট অনুযায়ী ওষুধের ওপর তেমন ভরসা করা যায় না। আমার কুকুর কিমিকে সেই ওষুধ খানিকটা ইনজেক্ট করে দিয়েছিলাম। ফলে মাত্র ঘণ্টাখানেক বেচারা লেজ নাড়তে পারেনি। সুতরাং পাগলা কুত্তা করের ওপর সেই ওষুধের প্রভাব (আদৌ যদি কিছু হয়) সহজেই অনুমেয়। অতএব টাকা লুঠ করতে হবে সম্পূর্ণ গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে। একবার যদি অফিস-বাড়িতে একা ঢুকতে পারি, তা হলে সিন্দুক খুলে টাকাগুলো পলিথিনের ব্যাগে ভরে নেওয়া একমিনিটের কাজ। অবশ্য এখনও অফিসে লুকিয়ে বসে থাকা যায়, কিন্তু তাতে—।

'যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলো না,' অনন্ত ডেকে বললেন।

—অফিস থেকে আর বেরোতে পারব না, কারণ অফিসের দরজাটা ইস্পাতের তৈরি, এমনি বন্ধ করলেই সেটায় তালা লেগে যায়, আর সে-তালার একমাত্র চাবি শুধু করের কাছে।

অবশ্য মোম দিয়ে তালার ছাপ তুলে নকল চাবি বানিয়ে নেওয়া তেমন একটা কঠিন কাজ নয়, কিন্তু তাতে লুকোনো বিপদঘণ্টির তো সুরাহা হবে না। প্রতি রাতে অফিস ছেড়ে বেরোবার সময় মিস্টার কর বিপদঘণ্টিটা চালু করে দিয়ে যান। এরপর যে-ই অফিসের দরজা খুলুক না কেন ওটা ভয়ঙ্কর শব্দ করে বেজে ওঠে। রোজ সকাল দশটায় অফিসের দরজায় এসে মিস্টার কর তিনপ্রস্থ চাবি দিয়ে বিপদঘণ্টিকে অকেজো করেন—অবশ্য অকেজো হওয়ার আগে ওটা তারস্বরে মিনিটপাঁচেক ধরে চেঁচিয়ে (!) রাস্তার লোক জড়ো করে ফেলে।

আমার বাড়ি অফিস থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সুতরাং ঘণ্টির চিল-চিৎকার আমিও শুনতে পাই এবং বুঝতে পারি আবারও আমার অফিসে দেরি হতে চলেছে। ঘণ্টি এভাবে বেজে ওঠার আগে যদি ওটাকে অকেজো করা হয়, তা হলে অফিসের বন্ধ দরজা আর কোনওদিনই খুলবে না।

এই সব দুরন্ত মারপ্যাঁচ আমার কাছে, তস্করসম্রাট নন্দিনী বিশ্বাসের কাছে, এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত গ্রীষ্মটা এই সমস্যা সমাধানের চিন্তাতেই কেটে গেছে। কিন্তু এখন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময়, ঝরাপাতা বৃষ্টি মনে করিয়ে দেয় বয়ে যাওয়া সময়ের কথা।

মিস্টার করের কাছ থেকে হতাশ মনে বিদায় নিয়ে দরজা বন্ধ করে অফিস থেকে বেরোলাম। শুনতে পেলাম দরজা লক হয়ে যাওয়ার 'ক্লিক' শব্দ। নেমে এলাম রাস্তায়। জনতার ভিড়ে আমি তখন এক অতি-সাধারণ নাগরিক।

অফিস-বাড়ির (লোহা ও কংক্রিট) এক প্রান্তে চিঠি ফেলার গর্ত (সিমেন্টে বসানো ইস্পাতের বাক্স)। গর্তটা ছ'ইঞ্চি চওড়া, মাটি থেকে সাড়ে তিন ফুট ওপরে। সুতরাং একচোখে উঁকি মারার পক্ষে উপযুক্ত। বহু অন্ধকার রাতে একচোখে অন্ধকার অফিসে উঁকি মেরে নানানরকম মতলব ভেঁজে সময় নষ্ট করেছি—লাভ হয়নি। এখন গর্তের

লোহার ঢাকনাটা তুলে আর-একবার উঁকি মারলাম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অপরাধের অকুস্থলে। অনন্ত করের টেবিলের আলোয় অফিসটা হালকাভাবে আলোকিত। চুরির পরদিন সকালে পুলিশ এবং সম্ভাসিত জনতা যেভাবে বিস্ময় অধ্যুষিত চোখে ঘরটা দেখবে, সেভাবে এখন ওটা দেখতে চেষ্টা করলাম: কোনও ড্রয়ারের হাতলে আঙুলের ছাপ পর্যন্ত নেই, একটা আলপিন পর্যন্ত এদিক-ওদিক হয়নি। কীভাবে কোনওরকম সাক্ষর না-রেখে তস্করচূড়ামণি ভেতরে ঢুকেছে এবং বেরিয়ে এসেছে, সে-কথা ভেবে ওরা কূল পাবে না। অবশ্য এখন, আমার অবস্থাও ওদেরই মতো।

ঢাকনাটা আস্তে নামিয়ে রেখে পা চালালাম। আমার বাতিল করা দু-নম্বর প্ল্যান ছিল অফিস-বাড়ি থেকে বেরোনোর জন্যে কোনও দুঁদে চোরের সাহায্য নেওয়া—যদিও তাতে নিজের তরফে ভয়ের ব্যাপার কিছুটা ছিল। প্ল্যানের বুদ্ধি জুগিয়েছি বলে লুঠের সিংহভাগ আমারই নেওয়া উচিত—হয়তো তাই নেব। কিন্তু ভয়ের ব্যাপার কিংবা গণ্ডগোলটা সেই নির্বোধ দুঁদে চোরকে নিয়ে। এমনও হতে পারে, সে হয়তো অন্য কোনও স্থূলবুদ্ধির কাজে ফেঁসে গিয়ে ধরা পড়ল, আর চট করে পুলিশে আমার নামটা বলে দিল; এ ছাড়া নিজের ভাগে সন্তুষ্ট না-হলে সে হয়তো আমাকে পরে ব্ল্যাকমেলও করতে পারে; কিংবা পাতি চোর-ছ্যাঁচোড়রা যেরকম বদমাইশ আর অকৃতজ্ঞ হয়, সেরকমটা হলে সে চুরির সময়েই আমাকে খুন করতে পারে।

এ ছাড়া আরও একটা বড় অসুবিধে হচ্ছে দাগি চোরদের সঙ্গে মেলামেশা করলে চট করে পুলিশের নজরে পড়বার ভয় থাকে। আমি সাধারণ চোর-ডাকাতদের থেকে আলাদা।

রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে দেখতে পাই ঝকঝকে লাল জাগুয়ারে আমি বসে আছি। আমার ডানহাতের কবজিতে ওমেগার লেটেস্ট মডেল জ্বলজ্বল করছে। আমার ঘরের দেওয়ালে একশো ওয়াট আউটপুটের স্টিরিও সিস্টেম। মেঝেতে কাশ্মীরি কার্পেট। রেফ্রিজারেটর। টি-ভি। আরও কত কী!

দু-লাখ পঞ্চাশ হাজারে দুনিয়া কেনা যায়।

তখন এই অকিঞ্চিতকর নলিনী বিশ্বাস টেরিউলের স্যুট পরে সকিঞ্চিতকর নলিনী বিশ্বাস হয়ে যাবে। নারীজাতির প্রতি তার এতদিনকার অবহেলাজনিত দোষ সে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠবে। এবং তাদের সীমাহীন প্রশ্রয় দেবে বলে সেই মুহূর্ত থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে নিজের কাছে। জেগে উঠবে নলিনীরঞ্জন রমণীমোহন বিশ্বাস।

লুঠের অবশিষ্ট যাবে বিভিন্ন অর্থকরী উদ্যোগের বিনিয়োগ ও লগ্নী হিসেবে। এভাবে আমার টাকা কয়েকবছরেই ফুলে-ফেঁপে উঠবে। হয়তো কুড়ি বছর পরে বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে দু-লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা গুনে-গুনে আমি ফেরত পাঠাব অনন্ত করকে। সঙ্গে থাকবে রহস্যময় এক চিঠি। অথবা আমার মনের দয়ালু অংশটাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি তৈরি করে দেব অবৈতনিক স্কুল, হাসপাতাল, কিংবা বিশ্বাস ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানি।

এসব ভাবনায় কোনও ফাঁক নেই, শুধু একটা জিনিস ছাড়া : যদি কোনও মতলব মাথা থেকে বের করতে হয় তবে তা আজ রাতেই করতে হবে। কারণ, আজ শুক্রবার। কাল সেকেন্ড স্যাটারডে। অতএব শনি-রবি কোম্পানি বন্ধ। আর সোমবার থেকেই শুরু হবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থ লগ্নীর ধারাবাহিক কর্মসূচি। অর্থাৎ, সেদিন থেকে আমার রেফ্রিজারেটর, টি-ভি, স্টিরিও ইত্যাদির টাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিতরণ করা হবে রাজ্যের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের।

সুতরাং এই আড়াই লাখ নিয়ে উধাও হওয়ার আজই শেষ সুযোগ। মিস্টার কর এখনও ঘণ্টাখানেক অফিসে থাকবেন, এবং তারপর অল্পসময়ের জন্যে হলেও অফিস-বাড়িটাকে দখলে পাওয়া যাবে। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ নিয়ে একবার শেষ চেষ্টা না-করে এ-সুযোগ আমি ছাড়ছি না।

সুতরাং পায়চারি করতে-করতে ঢুকে পড়লাম 'বুক কর্নার' দোকানটায়।

দোকানের মালিক মোহন সরকার।

রহস্য-গোয়েন্দাকাহিনীর নেশা আমার বহুকালের। এবং সেই সূত্রেই মোহন সরকারের দোকানে আমার যাতায়াত এবং ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব। বই কিনি আর না কিনি, ঘেঁটে দেখতে আমার ভালো লাগে। আর সেই সুযোগে সন্ধান করি নতুন কোনও রহস্য গল্পের, যেটাকে বাস্তব চেহারা দেওয়া যায়। অর্থাৎ কেতাবী অপরাধে আমার বিরাট আস্থা আছে।

মোহনের বইয়ের দোকানে ঢুকে ম্যাগাজিনের র‍্যাকের কাছে এগিয়ে গেলাম। মোহন কয়েকটা অল্পবয়েসি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল—সম্ভবত বই কেনা-বেচার ব্যাপারেই। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসল। আমি নতুন রহস্য-গোয়েন্দাজাতীয় পত্রিকাগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগলাম।

একটু পরে মোহন আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কী দেখছিস?'

আমি ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকিয়ে 'এই, কিছু না—' গোছের একটা ভঙ্গি করলাম। তারপর ওকে বললাম, 'একগ্লাস জল খাওয়া তো—।'

একটু পরেই ও একগ্লাস জল নিয়ে এল। বলল, 'কিনবি-টিনবি না, ফালতু ঘাঁটাঘাঁটি করিস না। বই লাট হয়ে গেলে খদ্দের নিতে চায় না।'

'আরে গর্দভ, ম্যাগাজিন লাট না-হলে মানায় না।' হেসে ওকে বললাম।

'এগুলো লাট হলে তোকে লাট করে দেব।'

এমন সময় দোকানে জনৈক প্রৌঢ় খদ্দের আসতেই মোহন 'আসছি' বলে চলে গেল সেদিকে।

আমার প্রথম দিককার পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে একটা ছিল মোহনের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। অনন্ত করের অফিস থেকে 'বুক কর্নার' বেশি দূরে নয়। অতএব, ক্ষীণ আশা ছিল যে, চিৎকার শুনে মিস্টার কর অন্তত দু-এক আঁজলা জল নিয়ে মোহনের দোকানে ছুটে আসবেন। এবং এই তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অফিসের দরজা তিনি হাট

ঘরে খুলে রেখে আসবেন। তারপর...। কিন্তু এ-মতলবটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে একটা কারণে : মিস্টার কর কানে শুনতে পান না, অতএব আগুন লাগার চিৎকার-চেঁচামেচি ওঁর কানেই ঢুকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে মোহনের প্রতি ঈর্ষায় সে-মতলবটাকে কাজে লাগাতে ইচ্ছে হল। ওর লামিনেটেড প্লাস্টিক লাগানো নতুন কাউন্টারকে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখলে আমার ভালোই লাগবে। সত্যি, অঢেল পয়সার অভাব শরীরে বড় কাঁটা দেয়! ভাবতে-ভাবতে তেষ্টা পেল। হাতের গ্লাস তুলে মোহনের দেওয়া জলে চুমুক দিলাম। তারপর আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইলাম কাচের গ্লাসটার দিকে।

জল, মনে-মনে ভাবলাম। যদি একবার অফিসের নর্দমাগুলো বন্ধ করে জলের কলগুলো সব খুলে দেওয়া যায়? কালা হোক বা না হোক, ব্যাপারটা অনন্ত করের নজরে পড়বেই। তারপরই তিনি দৌড়বেন কলগুলো বন্ধ করতে। কিন্তু কলের ওয়াশারগুলো আগেই আমাকে কেটে রাখতে হবে। তা হলে কর অফিসের বাইরে ছুটে যাবেন সাহায্যের আশায়। তাড়াহুড়োতে যদি তিনি দরজা খোলা রেখে যান তা হলে তো কথাই নেই। আর দরজা বন্ধ করে গেলেও ওই হইহট্টগোলে, লোকজনের ভিড়ে, আমি ঠিক কাজ হাসিল করে নেব। কিন্তু অফিসের চার-চারটে কল নিয়ে লটঘট করা, নর্দমা বন্ধ করা, এসব অত্যন্ত ঝামেলার কাজ। সুতরাং আনরিয়্যালাইজেব্‌ল্‌।

মোহন সরকারের দেওয়াল-ঘড়ির টিক-টিক শব্দে আচ্ছন্নতা কাটল। ছটা বাজতে কুড়ি মিনিট। হাতে আর পঞ্চাশ মিনিট। বড় কম সময়।

আরও কুড়ি মিনিট পরে, ঘড়িতে যখন ছটা বাজল, তখন আমার দু-দুটো নতুন পরিকল্পনা বাতিল করা হয়ে গেছে। প্রথম, ওপরতলার টি-ভি কোম্পানির মেঝে খুঁড়ে করের অফিসে নেমে আসা। আর দ্বিতীয়টা, অফিস-বাড়ির ছাদ থেকে সটান গর্ত খুঁড়ে-খুঁড়ে করের অফিসে হাজির হওয়া। তা হলে কোনও চাবি-টাবির আর দরকার নেই।

মোহনের দিকে ফিরে তাকালাম। ও কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কী একটা বই দেখছে।

'মোহন, তোকে দরজা-জানলা বন্ধ একটা ঘরে বন্দি করে রাখলে কী করে বেরোবি?' বুঝতে পারলাম, নেহাতই সময় কাটাচ্ছি।

'বেরোব না।' বই থেকে চোখ না-তুলেই মোহন জবাব দিল।

অতএব বেরোতে আমিও পারব না।

আরও একটা মূল্যবান মিনিট নষ্ট হল। একইসঙ্গে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যেতে লাগল চকচকে লাল জাগুয়ার, ওমেগার লেটেস্ট মডেল, একশো ওয়াট আউটপুটের স্টিরিও-সিস্টেম, কাশ্মীরি কার্পেট, রেফ্রিজারেটর, টি-ভি.....স্পষ্ট দেখলাম, লাস্যময়ী ললনার দল আমাকে হাত নেড়ে বিদায় নিচ্ছে। উঠছে গিয়ে মোহন সরকারের গাড়িতে।

ওহে বিশ্বাসবাবু, তুমি বুদ্ধিমান, তস্করকুলশিরোমণি হতে পারো, কিন্তু স্বীকার করে নাও, বুড়ো অনন্ত করের কাছে তুমি হেরে গেছ।

স্বীকার করে নিয়েই আনমনাভাবে হাত বাড়ালাম ম্যাগাজিন র‍্যাকের দিকে। তুলে নিলাম নতুন এক কপি 'মাসিক ক্রিমিনাল'। পাতা উলটেই যে-লেখাটা বেরোল সেটাই পড়তে শুরু করলাম :

বন্ধ ঘরের রহস্য

চিন্তাহরণ চাকলাদার

লালবাজারে ডি. সি. সমীর চক্রবর্তী চুপচাপ চেয়ারে বসেছিলেন। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। চোখে-মুখে চিন্তার ছায়া। তিনি ভাবছেন ইন্সপেক্টর যুধাজিৎ সেনের কথা। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন লালবাজারের সেই বিখ্যাত প্রতিভাধর অফিসার যুধাজিৎ সেন। নিজের কর্মদক্ষতার জন্য ডি. সি.-র কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয়। তাঁকে ঢুকতে দেখেই ডি. সি. বললেন, 'বোসো, সেন। তোমার কথাই ভাবছিলাম। কী অদ্ভুত যোগাযোগ বলো।' একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'গত রাতে যশবীর মেহেরা নামে এক কোটিপতির ঘরে প্রায় দু-লাখ টাকা দামের একটা নেকলেস চুরি গেছে। মেহেরার বাড়ি সাদার্ন অ্যাভিনিউ। এই নাও তাঁর বাড়ির ঠিকানা।' সেনের দিকে একটা চিরকুট এগিয়ে দিলেন তিনি, 'এ-কাজে চৌধুরী আর বোস তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে।'

এইবার হাসলেন যুধাজিৎ সেন। বললেন, 'আমি ঠিক এটাই আশা করছিলাম, স্যার।' চেয়ারে আর-একটু আরাম করে বসলেন। চোখের সানগ্লাসটা খুলে রাখলেন টেবিলের ওপরে। ডি.সি.-র স্নেহ ও প্রশ্রয়ে যুধাজিৎ সেন যেন তাঁর বন্ধু হয়ে গেছেন। চোখ নাচিয়ে তিনি বললেন 'কিন্তু আপনাকে আমি এ-কথাই বলতে এসেছি যে, ঠিক দশমিনিট আগে আমি মেহেরা নেকলেস কেস সলভ করে ফেলেছি। নেকলেসটা এখন পুলিশ হেফাজতে। কেস মিটলেই মিসেস মেহেরা ওটা ফেরত পেয়ে যাবেন। আর নেকলেস-চোর এখন লক-আপে বিচারের অপেক্ষায়।'

'আশ্চর্য!' অবাক বিস্ময়ে বললেন সমীর চক্রবর্তী, 'কী করে ধরলে চোরকে?'

'বলছি।' সুবিখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবরের চোখে ঝিলিক মারল খুশি। পকেট থেকে পাঁচশো পঞ্চান্নর একটা প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখলেন তিনি। আনুষ্ঠানিকভাবে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'কেসটা বড় অদ্ভুত, আর একইসঙ্গে বড্ড কমপ্লিকেটেড। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, কী বিচিত্র ঘটনাচক্রেই না চোরকে আমি গ্রেপ্তার করেছি। তখন আমি জানিই না মেহেরাদের নেকলেস চুরি গেছে। গতকাল রাত দশটা নাগাদ আমি বাড়িতেই ছিলাম। সোফায় আরাম করে বসে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছিলাম। হঠাৎই শুনতে পেলাম দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি বেঁটেখাটো রোগা চেহারার একজন যুবক সেখানে দাঁড়িয়ে। প্রথমে সে বিরক্ত করার জন্যে কাঁচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইল, তারপর জানাল যে, তার গাড়িটা আমার বাড়ির সামনে হঠাৎই বিগড়ে গেছে। কাছাকাছি কোনও মোটর গ্যারেজ নেই। আর এত রাতে লোকজনের সাহায্য পাওয়াও মুশকিল। সুতরাং আমি যদি আমার ফোনটা

ব্যবহারের অনুমতি দিই তা হলে সে বাড়িতে ফোন করে একটা খবর দিতে পারে।
'প্রথমটায় আমি তাকে ঠিক চিনে উঠতে পারিনি, কিন্তু তার অতিরিক্ত শৌখিন ভদ্র ব্যবহার আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলল। ফোন করা হয়ে গেলে আমি তাকে এগিয়ে দিলাম গাড়ি পর্যন্ত। আর তখনই মেহেরোর নেকলেসটা আমার নজরে পড়ল—ওটা গাড়ির পেছনের সিটে নির্বাচভাবে পড়ে ছিল। তখন নেকলেসটার ঠিকুজি-কুষ্ঠি না-জানলেও এটুকু বুঝেছিলাম, ওটার দাম কম করেও আকাশছোঁয়া। সুতরাং লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চেপে ধরলাম এবং খুব সহজেই সে সবকিছু স্বীকার করে বসল। তার নাম প্রশান্ত সরখেল। অসমসাহসী এবং বুদ্ধিমান সিন্দুক-ভাঙিয়ে হিসেবে নিচু মহলে তার নাম-ডাক আছে। গত কয়েকবছরে গোটা ভারত জুড়ে যেসব "আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব" চুরি-ডাকাতি হয়েছে, সেসব তারই কীর্তি। তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সমস্ত রাজ্যের পুলিশ।'
'একেই বলে ঘটনাচক্র!' সিগারেটটা টেবিলের ওপরে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ডি. সি. বললেন, 'তোমার তারিফ করতে হয়।'

দারুণ, মনে-মনে বলে উঠলাম। তারপর পাতা ওলটালাম।

যুধাজিৎ সেন সামান্য হেসে মাথা ঝোঁকালেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'ঘটনাচক্রই বটে। তবে আমার কৌতূহল হচ্ছিল কী করে সরখেল এই অসম্ভব কাজ হাসিল করল। সুতরাং সরখেলের কাছ থেকে মেহেরো ম্যানসনের ঠিকানা নিলাম। নেকলেসটা রাখলাম নিজের হেফাজতে। আর ওকে হাত-পা বেঁধে বন্দি করে রাখলাম বাড়িতে। তারপর রওনা হলাম সাদার্ন অ্যাভিনিউর দিকে।
'রাত তখন এগারোটা। কিন্তু মেহেরো ম্যানসন আলোকসজ্জা আর মণ্ডপসজ্জায় ঝলমল। শুনলাম, মিসেস মেহেরোর ছোট ছেলের আজ জন্মদিন। তাই এই উৎসব। বাড়ি অতিথি-অভ্যাগতে ভরপুর। চারপাশে রঙচঙে ব্যস্ত মানুষজনের আনাগোনা। আমি একজন সুন্দরী তরুণীর পথ আটকে জানতে চাইলাম মিস্টার মেহেরোকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে। বিশেষ দরকার। তরুণীটি জানাল, মিস্টার মেহেরো দোতলায় তাঁর স্ত্রী ও ছেলের কাছে আছেন।
'সুতরাং দোতলায় উঠলাম। কেউই আমাকে বাধা দিল না। উৎসব-বাড়িতে কে-ই-বা কার খবর রাখে! যেমনটা হয়েছিল প্রশান্ত সরখেলের বেলায়। দোতলায় পৌঁছে খোঁজাখুঁজি করতে হল না। দেখলাম একটা ঘরের দরজায় নিওন সাইনে লেখা 'হ্যাপি বার্থডে' এবং সেই ঘরে আলোয় সাজানো ঘর থেকে পাঁচমিশেলি হইহুল্লোড় ভেসে আসছে। সুতরাং সেই ঘরে ঢুকে পড়লাম।
'বাচ্চা-মেহেরোকে সাজিয়েগুজিয়ে একটা সুন্দর খাটে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে ঘিরে আত্মীয়-পরিজন অতিথিদের সমাবেশ। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই গুঞ্জন নিচু পরদায় নেমে এল। সকলেরই চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। আমি নীরবে পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে তুলে ধরলাম। গম্ভীর গলায় বললাম, অ্যাটেনশান প্লিজ, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন। মিস্টার মেহেরো কোথায়?
'আমার প্রশ্নে বাচ্চাটার পাশ থেকে বছর চল্লিশের জনৈক ব্যক্তি এগিয়ে

এলেন। চোখে চশমা, পুরু গোঁফ। আমার সামনে এসে থামলেন তিনি। 'ইয়েস?'

'আপনার স্ত্রীর একটা দামি নেকলেস চুরি গেছে।' শান্ত স্বরে বললাম।

'এ-খবরে সবাই নিশ্চয় চমকে গেছে।' টেবিলে টোকা মারতে-মারতে ডি সি চক্রবর্তী বললেন।

'সে আর বলতে।' সিগারেটে এক সুদীর্ঘ টান দিয়ে যুধাজিৎ সেন বললেন, 'নেকলেসটা যে ফিরে পাওয়া গেছে সে কথা বলে ওঠবার আগেই একজন সুন্দরী মহিলা অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন ঘরের মাঝখানে। সম্ভবত মিসেস মেহেরা। তারপর জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, ঘণ্টাদুয়েক আগে নেকলেসটা সবাইকে দেখিয়ে মিসেস মেহেরা একতলার ভল্টে রেখে আসেন। এবং সেই ভল্ট পরিদর্শনের জন্যে তিনি অতিথিদের আহ্বান জানান। সঙ্গে-সঙ্গেই আমি অনুমান করলাম, সরখেলও নিমন্ত্রিতদের ছদ্মবেশে সেই ভল্টে সকলের সঙ্গে ঢুকেছিল। অবশ্য এটা নেহাতই সহজ কাজ।'

তারপর কী হল? মনে-মনে প্রশ্ন করে পাতা ওলটালাম।

যুধাজিৎ সেনের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে উৎসুক চোখে তাকালেন ডি. সি.।

লালবাজারের তীক্ষ্ণধী অফিসার বলে চললেন, 'ভল্টের ভেতর একটা সিন্দুকে ছিল নেকলেসটা। তার সঙ্গে অন্যান্য গয়নাও ছিল। ভল্টের একটাই মাত্র দরজা—কোনও জানলা নেই। সেই দরজার চাবি সবসময়েই থাকে মিসেস মেহেরার কাছে। যদিও দরজার নকল চাবি তৈরি করতে অসুবিধে নেই, কিন্তু তাতে উপকার হবে সামান্যই। কারণ, দরজায় লাগানো আছে একটা বিপদঘণ্টি। দরজা খুললেই সেই ঘণ্টি বাজতে শুরু করে। বিপদঘণ্টিটা বন্ধ করা যায় একমাত্র ভল্টের ভেতর থেকে। এবং সেটা করতে গেলেও তিনটে চাবির দরকার। এ ছাড়া, একটুও না-বাজতে যদি সেই ঘণ্টি বন্ধ করা হয়, তা হলে ভল্টের দরজা আর খুলবে না—বাইরে থেকেও না, ভেতর থেকেও না।'

'এ যে ময়দানবের দুর্গ।' অবাক হয়ে বললেন চক্রবর্তী।

'মেহেরা দানবের দুর্গ।' হেসে বললেন যুধাজিৎ সেন, 'তবে এ-দুর্গকেও হার মানিয়েছে প্রশান্ত সরখেল। আমার অনুমান, অন্য সব অতিথির সঙ্গে সে ভল্টে ঢোকে, এবং মিসেস মেহেরার অলক্ষ্যে সিন্দুকের পেছনে লুকিয়ে থাকে। অন্যান্য অতিথিরা ভল্ট ছেড়ে বেরিয়ে যান। সব শেষে যান মিসেস মেহেরা। নেকলেসটা সিন্দুকে বন্ধ করে বিপদঘণ্টি চালু করে তিনি বাইরে থেকে ভল্টের দরজা বন্ধ করে দেন। আমরা জানি প্রশান্ত সরখেল পাকা সিন্দুকবাজ। সুতরাং, সিন্দুক খুলে নেকলেস হাতানো তার কাছে নিতান্তই ছেলেখেলা। কিন্তু ওই বন্ধ ভল্ট থেকে বিপদঘণ্টি না-বাজিয়ে সে বেরোল কেমন করে?'

যুধাজিৎ সেন সিগারেটের শেষ টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। পাঁচশো পঞ্চান্নর প্যাকেটটা রাখলেন পকেটে। তারপর টেবিলে রাখা সানগ্লাসটার গায়ে আঁচড় কাটতে লাগলেন। সানগ্লাসের দিকে নজর স্থির রেখেই তিনি বললেন, 'কেমন করে সরখেল বেরোল সে-কথা জানার জন্যে আমি মিসেস মেহেরাকে বললাম আমাকে সেই ভল্টে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে।' শান্ত

হেসে কথা শেষ করলেন সুধাজিৎ সেন।

'অবাক!' বললেন ডি. সি., 'তোমার তুলনা নেই, সেন। কিন্তু তুমি বেরোলে কেমন করে?'

সুধাজিৎ সেন চোখ তুলে তাকালেন। মুখে দুষ্টু হাসি। বললেন, 'ভেবেই দেখুন না।'

'দরজা ড্রিল দিয়ে ফুটো করে?' সমীর চক্রবর্তী প্রশ্ন করলেন।

'উঁহু। মনে রাখবেন, সরখেল ঠিক যে-কায়দায় এই ঘর থেকে বেরিয়েছে আমাকেও ওই একই কায়দায় বেরোতে হয়েছে। আর, একটা গোটা ড্রিল সঙ্গে করে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া ওর পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া দরজার মধ্যে কোনওরকম খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন আমার নজরে পড়েনি।'

'তা হলে নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কেউ তোমাকে বেরোতে সাহায্য করেছে।' সমীর চক্রবর্তী তাঁর দ্বিতীয় অনুমান উচ্চারণ করলেন।

'না।'

'ফল্স্ দেওয়াল?'

'উঁহু—।'

'লুকোনো দরজা?'

'তাও নয়।'

'দে, বইটা দে।' হঠাৎ পেছন থেকে মোহনের গলা শুনতে পেলাম—শুনে চমকে উঠলাম।

'দাঁড়া, আর-একটু—।'

কিন্তু তার আগেই মোহন লোমশ হাত বাড়িয়ে বইটা ছিনিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে।

'যা, কাট্‌। বললাম শালা বইগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, তাও—।'

'এই, মোহন—প্লিজ। শুধু এই গল্পটা শেষ করতে দে।'

'হ্যাঁ, শেষ করতে দিই, আর পাতা উলটে দেখবি গল্পটার শেষে "ক্রমশ" লেখা আছে। ব্যস্‌, তখন যে ক'মাস এই গল্পটা শেষ না-হবে, সে ক'মাস তুমি আমাকে জ্বালাতে আসবে।'

ভগবানকে ডাকলাম, যেন মোহনের ধারণা ভুল হয়। 'বন্ধ ঘরের রহস্য' যেন এই সংখ্যাতেই শেষ হয়। কিন্তু অতীতে মাসিক 'ক্রিমিনাল' যে এরকম করেনি তা নয়। সুধাজিৎ সেন ও সমীর চক্রবর্তীকে মাসের পর মাস একই কাহিনি নিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তাঁদের খাওয়া নেই দাওয়া নেই, শুধু সিগারেটের পর সিগারেট উড়িয়ে মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত টেবিলে বসে একটাই রহস্যের সমাধান করে গেছেন। জানি না, অনেক পাঠক হয়তো এই মাসিক উৎকণ্ঠা পছন্দ করেন, কিন্তু আমি করি না। আমি ঝাড়াঝাপটা রহস্য পছন্দ করি। গল্পের রহস্যের কায়দা ও চালাকি মেশানো সমাধান আমার মোটেই ভালো লাগে না।

কিন্তু সে-কথা মোহনকে বোঝানোর প্রয়োজন দেখলাম না। শুধু বললাম, 'শোন, মোহন, এই গল্পটা যদি এই সংখ্যাতেই শেষ হয়ে থাকে তা হলে ম্যাগাজিনটা আমি কিনব।'

'কিনবি? তুই?' ওর চোখ-মুখে হালকা বিস্ময়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ছ'টা পনেরো।

'বল্, রাজি?' অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'ঠিক আছে।' নিমরাজি হয়ে মোহন বলল, 'তবে আমি দেখব গল্পটার শেষ আছে কি না। তোর কথায় আমি বিশ্বাস করি না।'

অপমানটা গায়ে না-মেখে বললাম, 'আয়, দুজনে মিলেই দেখি।'

দেখলাম।

দুজনে একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে পাতা উলটে চললাম।

দু-পাতা পরেই গল্পটা শেষ হয়েছে। (যুধাজিৎ সেনকে তা হলে বেশি কষ্ট করতে হয়নি)। দেখলাম, গল্পের নীচে লম্বা ড্যাশ—অর্থাৎ, গল্প শেষ। একইসঙ্গে শেষ দুটো লাইনে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

> 'ও, তা হলে এই ব্যাপার,' বললেন সমীর চক্রবর্তী, 'সাবাস, সেন! তোমার জবাব নেই!'

মোহন ডানহাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিল—দামের জন্যে।

'এই নে—' পকেট থেকে পুরোপুরি তিনটে টাকা বের করে ওর হাতে দিলাম। বললাম, 'কমিশন চাই না। বাড়তি পয়সাটা তোর বই লাট করার ফাইন হিসেবে রেখে দে।'

দেওয়াল ঘড়িতে ছ'টা সতেরো।

'আজকের দিনটা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।' হেসে বলল মোহন, 'কারণ, তুই পুরো দাম দিয়ে আমার দোকান থেকে ম্যাগাজিন কিনেছিস।'

আমি চট করে ম্যাগাজিনটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেলাম। কিন্তু ও আরও তৎপর। ঝটিতি ওটা লুকিয়ে ফেলল পেছনে। হাসল দাঁত বের করে—অনেকটা বাঁদরের মতো। ডারউইন হাজির থাকলে এই মুহূর্তে মোহন সরকারকে মিসিং লিংক ভেবে তুলে নিয়ে যেতেন।

'ম্যাগাজিনটা তোর ভীষণ দরকার, নারে?'

'জানিস তো রহস্য গল্প আমার ভালো লাগে?'

'তাই নাকি? দেখি তো এই "বন্ধ ঘরের রহস্য"তে কী এমন আছে। তোর ইন্টারেস্ট দেখে মনে হচ্ছে এ-গল্পের নায়ক নির্ঘাত ছুঁড়ি নিয়ে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে দিয়েছে।'

'নারে।' ওকে বললাম, 'বিস্ময়কর প্রতিভা যুধাজিৎ সেন শুধু রহস্যই ভালোবাসে, অন্য কিছু নয়।'

তা সত্ত্বেও মোহন গল্পটা উলটেপালটে দেখতে শুরু করল। আমি কাড়াকাড়ির চেষ্টা ছেড়ে র‍্যাকের দিকে ফিরলাম। পয়সা যখন দিয়েছি, তখন দ্বিতীয় এককপি 'মাসিক ক্রিমিনাল' পড়বার অধিকার আমার আছে।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই র‍্যাকে দ্বিতীয় কোনও কপি দেখলাম না। কলকাতায় 'মাসিক

ক্রিমিনাল'-ভক্তদের সংখ্যা অস্বাভাবিক। হয়তো মোহন সরকারের হাতের কপিটাই এ-শহরের শেষ কপি। হয়তো পৃথিবীরও শেষ কপি।

ঘড়িতে ছ'টা কুড়ি।

সুতরাং আবার কাড়াকাড়ি অধ্যায় শুরু করলাম।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিচ্ছি।' মোহন বলল, 'তবে তুই যা চাইছিস, ফটিনটি, সেসব এ-গল্পে নেই। দাঁড়া, ম্যাগাজিনটা প্যাক করে দিই।'

'না, না, ওসবের দরকার নেই। আমি গল্পটা পড়তে-পড়তে যাব।'

'আজ বড় পবিত্র দিন।' হেসে বলল মোহন। আমার ডারউইনের কথা আবার মনে পড়ল। তারপর : 'তুই আমার দোকান থেকে প্রথম বই কিনলি, সুতরাং এ-বই আমি জন্মদিনের রঙিন মোড়কে না-মুড়ে ছাড়ছি না।'

দোকানে অন্য খদ্দের নেই। সুতরাং মোহনের সব নজর এখন আমারই দিকে। বইটা হাতে করে ও অদৃশ্য হয়ে গেল কাউন্টারের পেছনে। আমার উৎকণ্ঠিত চোখের সামনে ঘড়িতে সময় বয়ে যায় : ছ'টা বাইশ, ছ'টা তেইশ, ছ'টা চব্বিশ।

ছ'টা পঁচিশে আমাকে ডারউইনের কথা তৃতীয়বার মনে করিয়ে দিয়ে মোহন বেরিয়ে এল কাউন্টারের পেছন থেকে। ম্যাগাজিনটাকে গোলাপি ফুল ছাপা কাগজে মুড়ে ও সোনালি ফিতে দিয়ে বেঁধে এনেছে।

'পত্রিকা কেনার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ।' হেসে বলল মোহন।

ম্যাগাজিনটা ওর হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম দোকান ছেড়ে। মোড়কটা ব্যস্ত হাতে ছিঁড়তে-ছিঁড়তে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে চললাম অফিসের দিকে। চঞ্চল বইয়ের পাতায় আমার চোখও চঞ্চল :

> 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও আমাকে।' চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন ডি. সি. চক্রবর্তী।
>
> 'ভাবুন স্যার।' বললেন যুধাজিৎ সেন, 'আরাম করে ভাবুন।' তাঁর চোখে দুষ্টুমির হাসি।

সামনের ডি. সি. এম. শো-রুমের দেওয়াল-ঘড়িতে ছ'টা সাতাশ।

> 'কোনও যন্ত্রপাতি সঙ্গে ছিল না বলছ?' প্রশ্ন করলেন সমীর চক্রবর্তী।

আগেই তো সে-কথা আপনাকে একশোবার বলা হয়েছে, বিরক্ত হয়ে ভাবলাম।

> 'না।' যুধাজিৎ সেন ঠোঁটে হাসলেন—বোকা ছেলের ব্যর্থতায় অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাসি। 'সাধারণ কোনও মানুষের কাছে সাধারণ যেসব জিনিস থাকে আমার কাছে তার বেশি কিছু ছিল না। মানিব্যাগ, চিরুনি আর রুমাল।'
>
> 'মানিব্যাগটা নিশ্চয়ই সাধারণ মানিব্যাগ নয়?' ধূর্তস্বরে প্রশ্ন করলেন সমীর চক্রবর্তী।

সুধাজিৎ সেন হাসি চেপে বললেন, 'আপনি ভুল পথে চলেছেন, স্যার। সবখেল এবং আমি শুধুমাত্র উপস্থিতবুদ্ধি ভাঙিয়ে ওই ভল্ট থেকে বেরিয়ে এসেছি।'

'দারুণ! তুলনা নেই।' মনে-মনে বললাম। ম্যাগাজিনটাকে ঢুকিয়ে নিলাম জামার ভেতর। কারণ, আমি এখন অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু অনন্ত কর ভেতরে আছেন তো?

বেল বাজালাম। কোনও উত্তর নেই।

দরজায় দমাদম ঘুষি মারলাম। উত্তর নেই।

এবার চিৎকার করে উঠলাম, 'মিস্টার কর, মিস্টার কর?'

অরণ্যে রোদন।

রাস্তার ওপারে স্টেট ব্যাংক বিল্ডিংয়ের ঘড়িতে ছ'টা উনত্রিশ। বুড়ো নির্ঘাত ভেতরেই আছে, মনকে প্রবোধ দিলাম নীরবে। যদি কোনও লোক সাড়ে পাঁচটায় বলে আমাকে এখনও ঘণ্টাখানেক কাজ করতে হবে, তা হলে ছ'টা উনত্রিশে তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকারই কথা।

আরও মিনিটখানেক দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পর আসল রহস্যটা মাথায় ঝিলিক মারল। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, অনন্ত কর কানে শুনতে পান না। তা হলে তিনি নিশ্চয়ই ভেতরে আছেন। সাড়া দিচ্ছেন না আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন না বলে। সুতরাং নতুন আশা নিয়ে এগিয়ে গেলাম চিঠি ফেলার গর্তের কাছে। উঁকি মারলাম। তাঁর টেবিলের আলোর রেশ অফিসের দেওয়াল থেকে ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু অফিসের 'এল' আকৃতির জন্যে অনন্ত কর আমার নজরের আড়ালে।

'মিস্টার কর!' আমি চিৎকার করলাম (ছ'ইঞ্চি চওড়া গর্তে যতখানি জোরে চিৎকার করা সম্ভব) 'মিস্টার কর, আমি বিশ্বাস!'

'বিশ্বাস?' তাঁর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ, বিস্ময়।

'হ্যাঁ, স্যার, আমি!' ভোকাল কর্ডের অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে উত্তর দিলাম।

'সে কী? আমি তো জানি তুমি অনেকক্ষণ আগে চলে গেছ।'

'হ্যাঁ, চলে গেছি! এখন আমি অফিসের বাইরে, মিস্টার কর! চিঠি ফেলার গর্তের কাছে!'

'ও।' অনন্ত করের গলায় দিশেহারা সুর, 'তা কী ব্যাপার, ফিরে এলে যে?

'আমার ফাউন্টেন পেনটা ফেলে গেছি!' চিৎকার করে বললাম।

মানসচক্ষে দেখতে পেলাম অনন্ত কর গম্ভীরভাবে বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ছেন। সৌভাগ্যবশত আমার পরিকল্পনার একটা প্রধান অংশ ছিল দিনের-পর-দিন অনন্ত করের কাছে নিজেকে গর্দভ প্রতিপন্ন করা। তবে এই ইমেজ কাজে লাগবে, সে-কথা না-ভেবেই ফাইল উলটোপালটা জায়গায় রেখেছি, হিসেবে ভুল করেছি, অফিসে সুযোগ পেলেই হোঁচট খেয়ে পড়েছি, বোকার মতো মিসেস রাও এবং মিস্টার করকে প্রশ্ন করেছি,

এবং নিজের টুকিটাকি জিনিস প্রায়ই ভুল করে ফেলে গেছি অফিসে। এজন্যে বারদুয়েক আমার চাকরি যেতে-যেতে বেঁচে গেছে। কিন্তু আজ, দু-মাস পরে, আমার সেই গর্দভ-ইমেজ কাজে লাগছে। বড় আনন্দের কথা।

'দাঁড়াও, নলিনী, দরজা খুলছি।' মিস্টার কর চেয়ার ঠেলে (শব্দ শুনে অনুমান করলাম) উঠে দাঁড়ালেন।

আমি স্থির চোখে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। কর অফিসের বাঁক ঘুরে আমার নজরবন্দি হলেন, এবং আমিও লেটার বক্স ছেড়ে এগিয়ে গেলাম বন্ধ দরজার কাছে।

দরজাটা সামান্য খুলে তিনি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, 'এই সেদিন ম্যানিব্যাগ ফেলে গিয়েছিলে, আজকে আবার পেন?'

অবাক হতে যাচ্ছি, খেয়াল হল নিজের একটু আগে বলা মিথ্যে কথাটা : অফিসে পেন ফেলে গেছি।

'হ্যাঁ, স্যার,' সলজ্জ হাসলাম।

'আজ রাতটা পেন না-হলে চলছিল না?'

'মানে, একজনকে চিঠি লিখতে হবে, স্যার। তাই...'

অদ্ভুতভাবে হাসলেন কর, বললেন, 'প্রেমপত্র?'

চুপ করে রইলাম। জানি না, এসব প্রশ্নরাশির মহান কারণটা কী। তবে আমার মুখে বোধহয় একটা হতাশ বোকা-বোকা ছাপ স্পষ্ট হয়েছিল। কারণ, কর হঠাৎই সদয় হয়ে বললেন, 'এসো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি একপাশে সরে দাঁড়ালেন। আমাকে ভেতরে ঢুকতে জায়গা দিলেন।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম আমার টেবিলের কাছে। বিভিন্ন ড্রয়ার ফাইলপত্র ঘাঁটতে শুরু করলাম। মিস্টার অনন্ত কর দরজায় দাঁড়িয়ে পেচকজাতীয় চোখে আমাকে লক্ষ করতে লাগলেন। আমার পরিকল্পনায় তাঁর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল না।

'কোথায় যে গেল পেনটা!' উচ্চগ্রামে স্বগতোক্তি করলাম, 'ওটা না-পেলে আজ ভীষণ মুশকিল হবে।' আরও একটা ড্রয়ারকে ব্যবচ্ছেদ করতে শুরু করলাম : 'পেনটা একজন আমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল।' অকারণেই যোগ করলাম।

মিস্টার করের মুখমণ্ডলে এবার যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠল অল্প আলোয় সেটাকে বিরক্তি ও করুণার মিশ্রণ বলে চিনে নিতে ভুল হল না। তিনি থপথপ করে অফিসের বাঁক ঘুরে নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলো না, বিশ্বাস।

বললাম, ভুলব না এবং ড্রয়ার ইত্যাদি নিয়ে আরও মিনিটখানেক খটাখট করার পর চিৎকার করে উঠলাম, 'এই তো পেয়েছি! আলপিনের বাক্সের পেছনে পড়ে ছিল!' গলার স্বর তুঙ্গে রেখেই বললাম, 'আমি চললাম, মিস্টার কর!'

'আচ্ছা—' তাঁর আনমনা উত্তর শোনা গেল। রেলিংটা একলাফে টপকে দরজার কাছে গেলাম। দরজাটা খুলে সশব্দে আবার বন্ধ করে দিলাম। তারপর পা টিপে-টিপে

ফিরে এসে লুকিয়ে রইলাম আমার টেবিলের তলায়। জায়গাটা যেন একটা ছোট গুহা, তবে সামান্য আলোর রেশ রয়েছে। সুতরাং 'মাসিক ক্রিমিনাল'টা বের করে পড়তে শুরু করলাম। ডি. সি. সমীর চক্রবর্তী এখনও হালে পানি পাচ্ছেন না।

'আমি হার মানলাম, সেন।' ডি. সি. মাথার টাকে হাত বুলিয়ে বললেন। মুখে তাঁর এখনও কৌতূহলের ছায়া।

'কী যে বলেন—' হাসলেন সুরজিৎ সেন। 'আমি আর প্রণয় সরখেল পারলাম, সেখানে আপনি পারবেন না? বিশেষ করে আপনার এত বছরের পুলিশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। শুনুন, পুরো ব্যাপারটা আর-একবার আপনাকে গুছিয়ে বলি। আপনি একটা ভ্রান্তি বন্দি হয়ে রয়েছেন—'

মিস্টার করের আলো নিভে গেল। শুনতে পেলাম তাঁর এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। আমিও শব্দহীন, যদিও জানি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্গো নাচ নাচলেও মিস্টার করের মৃত কর্ণদ্বয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হবে না। চুপিচুপি গিয়ে তাঁর কানের কাছে আচমকা এক চিৎকার করতে ভীষণ ইচ্ছে হল। দেখতাম, বুড়ো কীরকম চমকে ওঠে। কিন্তু এখন বোকামি করার সময় নয়।

রুদ্ধশ্বাসে শুনলাম শীততাপ যন্ত্র বন্ধ করে দেওয়ার শব্দ। শুনলাম বিপদঘণ্টি চালু করার শব্দ। দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ। এবং সবশেষে তালায় চাবি ঘোরানোর মিঠি আওয়াজ।

আরও একমিনিট ঘাড় গুঁজে টেবিলের তলায় বসে রইলাম—অতিরিক্ত সাবধানতায়। তারপর একলাফে বাইরে এলাম। কলকাতার অন্যতম ধনী নাগরিক হতে আর মাত্র দু-পৃষ্ঠা (মাসিক ক্রিমিনালের) এবং দশমিনিট বাকি।

অফিসে কোনও জানলা নেই। সুতরাং একটা আলো জ্বালতে বাধা নেই। ইচ্ছে হলে সবকটা আলোই জ্বালাতে পারি, কিন্তু সে-আলো শীততাপ যন্ত্রের ফাঁক দিয়ে বাইরের লোকের নজরে পড়তে পারে। এছাড়া প্রতিফলিত আলোকেও বিশ্বাস নেই। তার ওপর চিঠি ফেলার গর্ত তো রয়েছেই। হয়তো বেরিয়ে আসা কোনও দ্বিতীয় বিশ্বাস সেই গর্ত দিয়ে দেখছে এবং টাকা লুঠের মতলব আঁটছে। এখন অতিরিক্ত সাবধান হওয়ার সময়। আলিপুর জেল ও কলকাতার মুক্ত বাসিন্দাদের মধ্যে ফারাক শুধু এই অতিরিক্ত সাবধানতাটুকুন। সুতরাং শুধুমাত্র দেশলাই জ্বালানোর ঝুঁকি নেব ঠিক করলাম।

নিজের পকেট ও টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে স্পষ্ট বুঝলাম, সে-ঝুঁকিও আমাকে আর নিতে হবে না। কারণ দেশলাই কোথাও নেই। এই দুঃখের মুহূর্তে মনে পড়ল, একটা পকেট-টর্চ আমি কিনেছিলাম। তখন আমি সবেমাত্র সিন্দুক লুঠ করবার তোড়জোড় শুরু করেছি। সযত্নে সংগ্রহ করেছি হিন্দি-সিনেমাজাতীয় পোশাক, (কালো প্যান্ট, কালো জামা, কালো মুখোশ—তাতে শুধু চোখের কাছে দুটো ফুটো এবং কালো রবারের জুতো) যাতে

কেউ আমাকে অফিস-বাড়ি থেকে বেরোতে দেখলেও 'আমি' বলে সন্দেহ না-করে। মনে পড়ল, টর্চ লাইট ও পোশাকগুলো কিনেছিলাম নাকতলা অঞ্চল থেকে, যাতে কেউ পরে মধ্য কলকাতার অপরাধের সাথে আমাকে শনাক্ত করতে না-পারে। এখন সেই চুরির সাজপোশাক, টর্চলাইট, সব পড়ে আছে খাটের নীচে।

আমার মতো প্রতিভাধর পুরুষও একমুহূর্তের জন্যে হতাশ হল। সূক্ষ্ম ভাবনাচিন্তার মাঝে শুনতে পাচ্ছি ওপরতলার টি-ডি কোম্পানির নটঘট কাণ্ড। কোম্পানির মালিক সুরোলিয়াকে সেক্রেটারি পামেলা হয়তো এই নিয়ে তৃতীয়বার 'অনিশ সুরোলিয়া, জুনিয়ার' উপহার দিতে চেষ্টা করছে। তাই বোধহয় এত গানবাজনার আওয়াজ, খিলখিল হাসির শব্দ।

সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে আমার আর প্রশান্ত সরখেলের পরিস্থিতির মধ্যে আর-একটু মিল খুঁজে পেলাম। অন্ধকার ভল্টে সরখেল যখন বন্দি, তখন ওপরতলা থেকে ভেসে আসছে আত্মীয়-পরিজনের হইহুল্লোড়ের শব্দ। মিসেস মেহেরা ছেলের জন্মদিন-উৎসব নিয়ে খুশির জোয়ার। আর এখানে সুরোলিয়ার ছেলের আসল জন্মমুহূর্ত স্থির করে উঠতে পারেনা চিন্তা ও দুশ্চিন্তাতে মগ্ন। বড় পবিত্র মুহূর্ত।

হঠাৎই মনে পড়ল, অফিসে এসে অনন্ত কর রোজ ধূপ জ্বালান। সিন্দুকের মাথায় রাখেন। তখন আমি কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে বলেন, 'এখন নয়, বিশ্বাস। এ বড় পবিত্র মুহূর্ত।' অতএব এই অফিসে, সম্ভবত পানিকরের ড্রয়ারে, নির্ঘাত কোথাও-না-কোথাও দেশলাই আছে।

চার সেকেন্ড পরেই বিশ্বাস-উপপাদ্যের সত্যতা প্রমাণিত হল। আমি বারদুয়েক পা ফেলে এগিয়ে গেলাম সিন্দুকের কাছে—হাতে দেশলাই। কিন্তু পরমুহূর্তেই পিছিয়ে করের টেবিলের কাছে ফিরে এলাম।

কারণ, গ্লাভস আনতে ভুলে গেছি।

কিন্তু আইনস্টাইন নলিনী বিশ্বাস এতে স্তব্ধ হওয়ার নয়। নিপুণ দক্ষতায় রুমাল বের করে বাঁহাতে জড়িয়ে নিলাম। তারপর এগিয়ে গেলাম মিসেস রাওয়ের টেবিলে। দেশলাইটা রাখলাম। তারপর টাইপ করার টিস্যু কাগজ গোটাকয়েক জড়িয়ে নিলাম ডানহাতে। কাগজের কোনাগুলো দাঁত দিয়ে সেঁটে দিলাম হাতে। এবার দেশলাই নিয়ে সুরোলিয়ার বাজনার তালে-তালে হাজির হলাম সিন্দুকের কাছে।

ডানদিকে ষোলো। বাঁদিকে এগারো। ডানদিকে ছাব্বিশ।

ক্লিক।

হাতল ঘুরিয়ে টান মারতেই সিন্দুক খুলে গেল।

ফিরে এসে নিজের টেবিলের ড্রয়ার থেকে তেতাল্লিশটা পলিথিনের ব্যাগ বের করে নিলাম। পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, 'কর ফাইনান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানি'র টাকার তুলনায় আমার ব্যাগের সংখ্যা বেশি। অতএব পনেরোটা ব্যাগ ফিরে গেল তার আগের জায়গায়—আমার ড্রয়ারে। এগুলো সোমবার দিন সরিয়ে ফেলব। এবং সেইদিনই আমার চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছেটা অনন্ত করের কাছে প্রকাশ করব।

মিস্টার কর, মিসেস রাও এবং 'কর ফাইনান্স অ্যান্ড লোন' কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ। জানি কলকাতার বুকে এই অভূতপূর্ব চুরির ঘটনায় আপনারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত, শোকে অভিভূত—আমারই মতো। এই দুঃসময়ে আপনাদের কাছে বলেয়া রাখতে হচ্ছে, এ জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি ঠিক করেছি আগামী মাসের মধ্যেই এ-কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দেব। কারণ, ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা কোর্সে সামনের মাসেই আমি ভরতি হচ্ছি (কথাটা সত্যি—মিথ্যে বলে মনে হলেও)। আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি হৃদয়হীন, আমার বিবেক নেই। কিন্তু তা নয়। মিস্টার কর বরাবরই মানুষের উন্নতির চেষ্টাকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেন, আশা করি আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হবে না। এই দুঃখজনক ঘটনায় আমিও আপনাদের সঙ্গে সমব্যথী। সমবেদনার ভাষা...।

রোববার দিন বাকিটা ভেবে তৈরি করে নেব। চাকরিতে আমার তরফ থেকে ইস্তফা দেওয়ার হয়তো প্রয়োজন হবে না। মিস্টার করই হয়তো কোম্পানির খরচ কমানোর জন্যে নিজে থেকেই আমাকে ছাঁটাই করে দেবেন। সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবেক।

টাকাগুলো ব্যাগে ভরে নেওয়ার পর সিন্দুক বন্ধ করলাম। কোম্পানির এই আর্থিক ক্ষতিতে শোক প্রকাশের জন্যে একমুহূর্ত নীরবতা পালন করলাম। মিস্টার করের পয়সা আছে। তিনি হয়তো ঠিক দাঁড়িয়ে যাবেন। কিন্তু মিসেস রাওয়ের সেক্রেটারি হিসেবে চাকরি পাওয়ার মূলধন ওঁর ফুরিয়ে এসেছে। তবে আনন্দবৃক্ষের ফল খায়নি এমন কোনও 'আনন্দ'-এর অভাব কলকাতায় নেই। তাকে ওঁর আনন্দবৃক্ষের ফল খাওয়ালেই মিসেস রাও চটপট চাকরি পেয়ে যাবেন।

টাকার থলেগুলো পায়ের কাছে রেখে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম। মিস্টার করের দেশলাই থেকে আর-একটা কাঠি জ্বাললাম। তারপর এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রতিটি ধাপ মুখস্থ করার জন্যে মনে-মনে তৈরি হলাম। 'মাসিক ক্রিমিনাল'টা নিয়ে বসলাম।

সুরজিৎ সেনকে যে-অবস্থায় রেখে এসেছিলাম তিনি এখনও সেই অবস্থাতেই রয়েছেন। অর্থাৎ মেহেরার ভল্টের চরিত্রের পর্যালোচনার পুনরাবৃত্তি করছেন। চর্বিতচর্বণ। সুতরাং পরের প্যারায় আমার চোখ ছিটকে গেল।

> সমীর চক্রবর্তী সুরজিৎ সেনের প্যাকেট থেকে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'নাঃ, আমার মাথা খেলবে না, সেন। তুমিই বলো, তালাবন্ধ ভল্ট থেকে বেরোলে কী করে?'
>
> সুরজিৎ সেন আন্তরিক হাসলেন, বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই সহজ, স্যার। মানছি, দরজা খোলা অথবা বিপদঘণ্টি নিয়ে কারসাজি করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা পথ আমার হাতে ছিল। সেটা হল...।'

পাতাটা সেখানেই শেষ। সুতরাং পরের পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে নজর দিলাম।

সুরজিৎ সেন হাসিমুখে দৃষ্টি মেলে দিলেন শোভনা রায়ের দিকে। বললেন, 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, মিস রায়। বলুন, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

মোহন সরকার 'বন্ধ ঘরের রহস্য'র শেষ পাতাটা নিখুঁতভাবে ছিঁড়ে নিয়েছে। কিন্তু আমিও তাতে হার মানার পাত্র নই। মানছি, প্রথমটা একটু হতাশ হয়েছি, কিন্তু পরক্ষণেই অফিসের টেলিফোন ও আমার সাহস আমাকে আশা দিয়েছে। সত্যি, এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা শুধুমাত্র নলিনীরঞ্জন বিশ্বাসের বুদ্ধিতেই সম্ভব।

প্রথমে পরিচিত বন্ধুবান্ধব কয়েকজনকে ফোন করলাম, যারা এ ধরনের পত্রিকা পড়ে। কেউ-কেউ বাড়ি নেই, আর বাকিরা গল্পটা পড়েনি। তাদের বললাম দৌড়ে গিয়ে এককপি পত্রিকা কিনে গল্পটা পড়ে নিতে। মুখে 'হ্যাঁ' বললেও আমি জানি পত্রিকা কিনতে ওরা কেউই যাবে না। তারপর একটা বইয়ের দোকানে ফোন করলাম, কিন্তু ওরা বলল টেলিফোনে গল্প পড়ে শোনানো ওদের ধর্ম নয়।

মোহনকে ফোন করলাম। আমার গলা শুনেই ও হাসল। তারপর ফোন নামিয়ে রাখল। আত্মীয়স্বজন দু-একজনকে ফোন করতেই তারা জিগ্যেস করল, আমি কোথা থেকে ফোন করছি। আমার কোনও বিপদ হয়েছে কি না। পুলিশে কি খবর দিতে হবে?

নীরবে ফোন নামিয়ে রাখলাম।

এবার 'ক্রিমিনাল'টা উলটেপালটে দেখলাম। কোনও ফোন নম্বর দেওয়া নেই। দুটো নাম রয়েছে : সহদেব সাহা ও স্বপন সাহা। যথাক্রমে প্রধান উপদেষ্টা ও সম্পাদক। ডিরেক্টরিতে তাঁদের নামে কোনও ফোন নম্বর খুঁজে পেলাম না যে ফোন করব। চিন্তাহরণ চাকলাদারের নাম ধরে ফোন নম্বর খোঁজার কোনও চেষ্টা করলাম না। কারণ, ছদ্মনাম দেখলেই আমি বুঝতে পারি।

স্বীকার করছি, একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম। তারপর শেষ চেষ্টা হিসেবে ফোন করলাম লালবাজারে। না, ডি. সি. সমীর চক্রবর্তী বা ইন্সপেক্টর যুধাজিৎ সেনের নাম তারা কখনও শোনেনি। তবে প্রশান্ত সরখেল বলে একটা লোক বর্তমানে তাদের হাজতে আছে। সে অভিযুক্ত জালিয়াতির অপরাধে, চুরির অপরাধে নয়।

এবার ধীরে-ধীরে নিজেকে শান্ত করলাম। পত্রিকার বাকি গল্পগুলো (মোহনের কৃপায় যেগুলো অটুট আছে) পড়ে শেষ করলাম। বেরোনোর ব্যাপারটা নিয়ে আমি মোটেও আর ভাবছি না। সোমবারে সকাল সাড়ে নটা পর্যন্ত আমার হাতে সময় আছে। তার মধ্যে ফোনে এমন কাউকে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব যে ওই গল্পটা পুরোটা পড়েছে। শুধু এখন ঈশ্বরকে ডাকছি, যুধাজিৎ সেন শেষ পর্যন্ত আমাকে ধোঁকা না-দেয়। কারণ, গল্পের রহস্যের কায়দা এবং চালাকি মেশানো সমাধান আমি একটুও পছন্দ করি না।

অসুর

শীতের দুপুরে কোনও এক শহরতলিতে তিনতলা বাড়িটা ছিল একা-একা দাঁড়িয়ে। সামনে একফালি বাগান, আর দু-পাশে খোলা মাঠের নির্জনতা। পিছন দিকটায় কিছু জংলা ঝোপ। বাড়ির বাসিন্দা ছ'জন মানুষ। কিন্তু ছ'জনের একজন গরহাজির ছিল সেই নির্জন দুপুরে। এবং ঠিক সেই সময়েই এসে হাজির হল সপ্তম ব্যক্তি...।

পরনে ফুল হাতার কালো জামা, কালো কর্ড-এর প্যান্ট। চোখে-মুখে কেমন একটা উদাসীন দৃষ্টি। চেহারা তার রোগার দিকেই। কিন্তু চোয়ালের কঠিন রেখা ভেতরের শক্তির একটা আভাস দিচ্ছে। পা ফেলায় বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। অলসভাবে মেঠো পথ ধরে সে এগিয়ে আসছিল। আধা-গ্রাম আধা-শহর মিশিয়ে তৈরি এই শহরতলিতে তার আসা এই প্রথম। এবং বোধহয় এই শেষ।

রাস্তার দু-পাশে ঘাসের ছোঁওয়া এখনও আছে। চোখ তুলে তাকালে দূরে দেখা যায় ওভারহেড লাইন। সেই তারে বসে আছে কয়েকটা ফিঙে। লেজ নাড়িয়ে দোল খাচ্ছে।

এ-অঞ্চলের বাড়িগুলোকে কেউ যেন সযত্ন পরিকল্পনায় হিসেবি দূরত্বে বসিয়ে দিয়েছে। কোনওটা একতলা, কোনওটা দোতলা, আর কোনওটা-বা তিনতলা। শীতের দুপুর। সব বাড়ির জানলা, দরজা বন্ধ। হয়তো বাসিন্দারা বিশ্রাম নিচ্ছে।

তিনতলা হলদে বাড়িটা তাকে টানল কোন অদ্ভুত কারণে, তা সে নিজেই জানে না। হয়তো বাড়ির সামনের ওই একফালি বাগানটা।

নির্জন মাঠের এদিক-ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে সে বাড়িটার দিকে তাকাল।

আধুনিক পরিকল্পনার ছোঁয়াচ বাড়িটার সর্ব অঙ্গে।

ভারি কাঠের দরজার ওপরে নেমপ্লেট। তাতে লেখা—

সুশান্ত মল্লিক, অ্যাডভোকেট

তার একটু ওপরে, ডান পাশে কলিংবেলের সুইচ। বাগান চিরে যে-পথ দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার দু-ধারে গেঁথে দেওয়া ইটে সাদা রঙ করা; খাটো বাঁশের বেড়াও রয়েছে একটা।

শ্লথ পায়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে কী যেন চিন্তা করল সে। চোখ তুলে তাকাল দোতলার বারান্দার দিকে। সাদা রঙের গ্রিলে ঘেরা বারান্দা জনশূন্য। এবং যে-হলদে দরজাটা বাড়ি এবং বারান্দার যোগসূত্র, সেটা বন্ধ।

চিন্তায় ইতি ঘটিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কলিংবেলের বোতামে হাত রাখল সে। ভেতরে ঝনঝনিয়ে ওঠা চাপা আওয়াজটা কানে আসতেই হাসল, বাঁ-হাতটা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পকেটে ঢুকিয়ে অনুভব করল ভাঁজ করা স্টিলের ছুরিটা।

আর একবার হাসল সে।

একটা হালকা লেপ গায়ে দিয়ে বারান্দার লাগোয়া ঘরটাতে শুয়েছিলেন সুশান্ত মল্লিক।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য দিনকয়েক ওকালতিকে ছুটি দিয়েছেন তিনি। পঞ্চাশ পার হওয়ার পর থেকে তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন শরীরের সঙ্গে লাগাতার বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলেন। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ। সবাই জানে, এ সময়ে তাঁকে বিরক্ত করা বারণ। সাধারণত গল্পের বই পাশে নিয়ে শোন। মাথার কাছে রিডিং-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ পড়েন, তারপর একসময় আলো নিভিয়ে পাশ ফিরে ঘুমোনোর আয়োজন করেন।

সুশান্ত মল্লিকের একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যেই তিনি শুনতে পেলেন কলিংবেলের শব্দ। অর্থাৎ, দরজায় কোনও অতিথি অপেক্ষা করছে। কিন্তু তিনি ব্যস্ত হলেন না। কারণ, বেলা এখন সবে দুটো। তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, বিধবা বোন এবং বাড়ির কাজের লোক—সকলেই এখন জেগে। কলিংবেলের শব্দ ওরা কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়ে থাকবে। তারপর ওদের কেউ যাবে দরজা খুলে দিতে।

প্রমাণিত হল, সুশান্ত মল্লিকের অনুমান নির্ভুল। তাঁর স্ত্রী, রমলা মল্লিক, দোতলার রান্নাঘরে এঁটো বাসন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কলের জলের শব্দে কলিংবেলের শব্দটা তাঁর কানে যায়নি। রান্নাঘরের পাশেই একটা মাঝারি ঘর। সে-ঘরে সিনেমার পত্রিকার পাতায় চোখ বোলাতে ব্যস্ত ছিল সুমনা—সুশান্ত মল্লিকের মেয়ে। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করার পর সুযোগ্য পাত্রের অপেক্ষায় দিন গুনছে। ঘণ্টার শব্দটা ওর কানে গেলেও বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা সুমনা করল না। কারণ ও জানে, আর কেউ-না-কেউ শব্দটা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়ে থাকবে। তাই পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেও ওর কান পড়ে রইল সদর দরজার দিকে : কখন শুনতে পাবে দরজা খোলার শব্দ। তারপর না-হয় জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখবে, কে এল।

সুমনার বিধবা পিসি প্রভা রায়গুপ্ত পুজো-আর্চা সেরে খাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন, কানে এল ঘণ্টার শব্দ। এ-বয়সে মানুষ হয়তো একটু অধৈর্য এবং খুঁতখুঁতে হয়। তাই খাওয়ার ব্যবস্থা ছেড়ে তিনি বাইরের করিডরে বেরিয়ে এসে ডেকে উঠলেন, 'সুমু, দেখ তো কে এল।'

সুমনা দোতলায় নির্বিকার থাকলেও প্রভাদেবীর চিৎকারটা রমলাদেবীর কানে গেল। তিনি বাসন মাজা থামিয়ে চাকর অবিনাশকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললেন, 'অবিনাশ,

দরজা খুলে দে। কে এল দেখ—' কথা শেষ করে আবার হাতের কাজে মন দিলেন তিনি।

অবিনাশের বয়স বাইশ-তেইশ। কালো স্বাস্থ্যবান চেহারা। এ-বাড়িতে সে আছে প্রায় চার বছর। রোজকার মতো একতলায় বসে সে কাপড় কাচছিল। কাপড় কাচা হলে স্নান সেরে দোতলায় গিয়ে ঢেকে রাখা খাবার খাবে। তারপর একটু গড়ানোর ব্যবস্থা করবে।

কাপড় কাচার শব্দে ঘণ্টির শব্দ চাপা পড়ে যাওয়ায় সে এতক্ষণ খেয়াল করেনি। কিন্তু 'মা'য়ের গলার আওয়াজে হাতের কাজ থামাল সে। শুনতে পেল ঘণ্টার অধৈর্য শব্দ।

একটু বিরক্ত হয়ে অবিনাশ উঠল। ভিজে হাত থেকে সাবান-জল ঝাড়তে-ঝাড়তে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

নীরবে অপেক্ষা করতে-করতেই তার নজর পড়ল টেলিফোনের তারটায়। দরজার বাঁ-পাশ দিয়ে দেওয়ালের গা বেয়ে নেমে গেছে।

মনে-মনে হাসল সে।

বিজ্ঞানের লম্বা হাত এত দূরেও এসে পৌঁছেছে! এই ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের হাসি কালো ঠোঁটজোড়ায় ছায়া ফেলল। বাঁহাতে ছুরিটা বের করে বুড়ো আঙুলে চাবি টিপতেই ঝলসে উঠল স্টিলের ফলাটা। এবং পরমুহূর্তেই নিখুঁত হাতে বিচ্ছিন্ন হল টেলিফোনের তার।

রোদ-ঝকমকে নীল আকাশে হঠাৎই যেন ছায়া ফেলল একটুকরো ঘন কালো মেঘ।

এমন সময় সশব্দে খুলে গেল সদর দরজা।

দরজায় দাঁড়িয়ে বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক। খালি গা। পরনে চেক লুঙ্গি। খাটো করে পরা। কোথাও-কোথাও সামান্য ভিজে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভিজে হাত দুটো লুঙ্গিতে মুছতে লাগল ছেলেটি। প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই?'

উত্তরে মৃদু স্বরে সে বলল, 'সুশান্ত মল্লিক, অ্যাডভোকেট।'

'উনি অসুস্থ। এখন বিশ্রাম করছেন।'

নীরবে খোলা দরজার চৌকাঠ পেরোল সে। ছেলেটির বিস্ফারিত চোখের সামনে পিঠ দিয়ে বন্ধ করে দিল সদর দরজা। তারপর বাঁহাতটা উঁচিয়ে ধরল ছেলেটার চোখের সামনে। হাতে-ধরা বস্তুর চরিত্র এই আধো-অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝল ছেলেটা। হয়তো আসন্ন বিপর্যয়ের কথা অনুমান করেই এক হৃদয়বিদারী চিৎকারের জন্য ভোকাল কর্ডকে তৈরি করে হাঁ করল। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই অভ্যাসলব্ধ পেশাদারি ভঙ্গিতে সাপের মতো ক্ষিপ্রতায় আগন্তুকের বাঁহাত ছোবল মারল ছেলেটির গলায়। একইসঙ্গে তার

চিৎকার এবং শ্বাসনালিকে মাঝপথেই বিচ্ছিন্ন করল স্টিলের ফলাটা।

অদ্ভুতভাবে ছেলেটার শরীরটা সামনে মাথা ঝুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সে কয়েকমুহূর্তের জন্য। তারপরই সিমেন্টের মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ল। মেঝে তখন রক্তে ভিজে উঠেছে।

ছটফট করা শরীরটার দিকে একপলক দেখল সে। দেখল বাঁহাতের রক্তাক্ত ছুরিটার দিকে। তাকাল কালো জামায় ছিটকে আসা রক্তের রেখার দিকে। তারপর নির্বিকারভাবে ছুরিটা ঘষে-ঘষে মুছে নিল জামার কাপড়ে। দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে ছেলেটার দেহটা ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির কাছে। পা থেকে চটিজোড়া এককোণে খুলে রেখে নিঃশব্দ পায়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে...।

সুমনা শুয়ে-শুয়েই শুনতে পেল সদর দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। সুতরাং অতিথির সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার শব্দের প্রতীক্ষায় ও সময় গুনতে লাগল। কিন্তু মিনিটপাঁচেক পরেও যখন কারও পায়ের শব্দ ওর কানে এল না, তখন একটু অবাক হল ও। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিনেমা-পত্রিকাটা বালিশের পাশে রেখে বেশবাস গুছিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াল।

ভেজানো দরজা খুলে বাইরের অলিন্দে এল সুমনা। ডান পাশেই রান্নাঘর, এখান থেকে মায়ের বাসন মাজার শব্দ বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে। মা-কে আর ব্যস্ত না-করে বাঁদিকে এগোল সুমনা। একপলক দেখল তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে, তারপর তাকাল বাবার ঘরের দরজার দিকে। দরজা রোজকার মতোই ভেজানো—যাতে কোনও অবাঞ্ছিত অতিথি সুশান্ত মল্লিকের ঘুমের ব্যাঘাত না-ঘটায়।

এবার নীচে নামার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে সুমনা। যতই নামে ততই ও অবাক হয়। কারণ, একতলার বাথরুম থেকে অবিনাশের কাপড় কাচার একটানা শব্দ মোটেও শোনা যাচ্ছে না। এটা রোজকার নিয়মের ব্যতিক্রম। সুতরাং অস্বাভাবিক।

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নেমে কলতলার দিকে এগিয়ে চলল সুমনা।

কলতলা এবং বাথরুমের একটাই দরজা, এবং সেটা হাট করে খোলা।

ভেতরে উঁকি মারতেই কোনও শব্দ না-শোনার কারণটা বোঝা গেল : কলতলায় অবিনাশ নেই। বালতি, সাবান, কাপড়চোপড় সব ছড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে, কাপড় কাচতে-কাচতে হাতের কাজ ফেলে অবিনাশ উঠে গেছে সদর দরজা খুলতে।

বাথরুম দেখা শেষ করে সদর দরজার দিকে চলল সুমনা।

সদর দরজার হাতপাঁচেকের মধ্যে পৌঁছতেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকা জিনিসটা যে অবিনাশ সেটা ও বুঝতে পারল।

কিন্তু সদর দরজা বন্ধ!

আর রক্তে ভেসে যাওয়া সিমেন্টের মেঝেতে বিস্রস্তভাবে পড়ে আছে অবিনাশ।

দু-চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। ঠোঁট দুটো ফাঁক করা। এবং গলার নলিটা কে যেন সযত্নে দু-টুকরো করে দিয়েছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় সুমনা কয়েকমুহূর্তের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ল। আপ্রাণ চেষ্টাতেও ওর মুখ থেকে সঙ্গে-সঙ্গে কোনও চিৎকার বেরিয়ে এল না। বুকে জমাট বাঁধা নিশ্বাসটা যখন বাইরে বেরিয়ে এল, তখনই শোনা গেল ওর উন্মাদ চিৎকার। যেন কসাইখানায় খতম হওয়ার সময় কোনও শুয়োর ভাঙা, মর্মন্তুদ, কর্কশ স্বরে আর্তচিৎকার করছে।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল সে। দেখল, বাঁদিকে একটা ভেজানো দরজা। দ্বিধা কাটিয়ে দরজায় হাতের চাপ দিল। ধীরে-ধীরে সেটা খুলে গেল। এবং নিঃশব্দ পায়ে আগন্তুক ভেতরে ঢুকল। আবার ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

যে-ঘরটায় সে পা রাখল সেটা অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করার জন্য আধা-ড্রইংরুমগোছের একটা ঘর। দরজার বাঁ-পাশে রেফ্রিজারেটর। সামনে সাজানো সোফাসেট এবং একটা ছোট টেবিল—হলদে কাপড় দিয়ে ঢাকা। বাঁদিকের শেষ প্রান্তে একটা কাঠের তাকে বসানো রেডিও। এখন বন্ধ।

ঘরের আসবাবপত্রের ওপর একপলক চোখ বুলিয়ে সে এগিয়ে চলল।

সামনেই আর-একটা দরজা। আলতো করে ভেজানো।

দ্বিতীয় দরজা অতিক্রম করেই সে পৌঁছল বারান্দার লাগোয়া বড় ঘরটায়। ঘরে আবছা অন্ধকার। ডানদিকে এবং বাঁদিকে দুটো বড় খাট। ডান পাশে দাঁড় করানো একটা বিশাল কাঠের আলমারি। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা চেয়ার ও টেবিল।

পরমুহূর্তেই তার চোখ পড়ল বাঁদিকের খাটে দেওয়ালের দিকে মুখ করে লেপ গায়ে ঘুমিয়ে রয়েছে একজন মানুষ। শুধুমাত্র তার মাথার পিছনটুকু অস্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে। খাটের বাঁদিকে সাজানো একটা স্টিলের আলমারি, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল। টেবিলে কয়েকটা জিনিস রাখা আছে বোঝা গেলেও আবছা আঁধারে ঠিকমতো নজরে এল না। স্টিলের আলমারির গায়ে লাগানো এক বিশাল আয়না। সেই আয়নায় নিজেকে একপলক দেখে বাঁদিকের খাটটার কাছে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

খাটের খুব কাছে দাঁড়িয়ে সে লেপের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা মাথাটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। জানলায় লাগানো কাচের শার্সির দৌলতে সামান্য আলো ঠিকরে পড়েছে শুয়ে-থাকা মানুষটির গায়ে। তার নজরে পড়ল কাঁচা-পাকা চুলের হালকা আস্তরণ মাথার পিছনটা ঢেকে রেখেছে। মনে-মনে কী ভাবল সে। তারপর পকেট থেকে ইস্পাতের ছুরিটা বের করে বাঁহাতে উঁচিয়ে ধরল। চাবির ওপর বুড়ো আঙুলের চাপ দিতেই একটা 'খট্' করে শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে ছিটকে এল ঝকঝকে ফলাটা। শুয়ে-থাকা লোকটা

সে-শব্দ শুনতে পেল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

সুতরাং নিশ্চিত ভঙ্গিতে সে খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ল, দু চোখের কালো তারা কেন যেন ধকধক করে জ্বলছে...।

চিৎকারটা প্রথমে শুনতে পাননি রমলাদেবী। কারণ থালা বাসনে ছিটকে পড়া জলের শব্দ আর-সব শব্দ ঢেকে দিয়েছিল। আচমকা কলটা বন্ধ করতেই কারও গলা চিরে বেরিয়ে আসা তীব্র চিৎকারটা পাগলের মতো তার কানের পরদায় এসে আঘাত করল। একবার—দুবার—তিনবার...।

সম্পূর্ণ হতভম্ব রমলাদেবীর হাত থেকে অ্যালুমিনিয়ামের হাতাটা খসে পড়ে গেল। দিশেহারাভাবে কয়েকমুহূর্ত তিনি উবু হয়ে বসে রইলেন। তারপর বয়েসের তুলনায় ক্ষিপ্র চেষ্টায় উঠে দাঁড়ালেন। ভিজে হাত দুটো পরনের শাড়িতে মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এলেন বাইরের অলিন্দে। স্বভাবমতো ডেকে উঠলেন, 'কী হল? চেঁচাচ্ছে কে—কী ব্যাপার—?'

অলিন্দ ধরে কয়েক পা এগিয়েই তিনি বুঝলেন, চিৎকারের শব্দটা আসছে একতলা থেকেই। সুতরাং নীচে নামার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ সুমনার কথা মনে হতেই আবার ফিরে এলেন রান্নাঘরের পাশের ঘরটায়। হ্যাঁ, চোখের কোণ দিয়ে যেটুকু তাঁর নজরে পড়েছিল তা সত্যি।

ঘরে সুমনা নেই।

সিনেমার পত্রিকাটা বালিশের পাশে নামানো। ঘরের দরজা হাট করে খোলা।

এবার রমলা মল্লিক ভয় পেলেন। 'সুমু—সুমু' বলে চিৎকার করতে-করতে তিনি টলোমলো পায়ে সিঁড়ি ভেঙে একতলায় নামতে শুরু করলেন।

সিঁড়ির মাঝামাঝি নামার পরই বিপরীত দিক থেকে উদভ্রান্ত ভঙ্গিতে ছুটে আসা সুমনার সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগল।

সুমনার দু-চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক করা। ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে ওর ভারি বুক দুটো উঠছে-নামছে।

মাকে সামনে পেয়ে জাপটে ধরল সুমনা। মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না। রুদ্ধ আবেগে ওর শরীরটা রমলাদেবীর দু-হাতের মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

সেকেন্ডকয়েক পর সুমনার কাঁপা স্বর—'অবিনাশ—মরে গেছে—' এই শব্দ তিনটে উচ্চারণ করল এবং কেঁদেই চলল।

পাঁচবারের বার রমলাদেবী ওর কথার অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন। তখন আরও জোরে আঁকড়ে ধরলেন মেয়েকে। চাপা স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'অবিনাশ মরে গেছে? কী করে?'

সুমনা নীরবে সদর দরজার দিকে আঙুল দেখাল। ওর শরীরের কাঁপুনি তখনও থামেনি।

রমলাদেবীর অভিজ্ঞতা নেহাত কম নয়। প্রথম কয়েকমিনিট তিনি দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন, সুমনা মিথ্যে কথা বলছে না। কিন্তু ওর দেখা ও শোনার মধ্যে কোথাও হয়তো কোনও গলদ রয়েছে, তাই এরকম অসংলগ্ন আচরণ করছে। সুতরাং তিনি মেয়েকে সাহস দেখিয়ে বললেন, 'চল্ তো, দেখি কী ব্যাপার—।'

সুমনা শূন্য চোখে মায়ের চোখের দিকে দু-পলক চেয়ে রইল, তারপর নীরবে তাঁর কথা মেনে নিল। মায়ের হাত ধরে ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। ওর শূন্য দৃষ্টি সামনে—যেন অবিনাশের মৃতদেহটা ওর চোখের তারায় ভাসছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নামতেই রমলা মল্লিকের সন্ধানী নজর পড়ল এককোণে রাখা মামুলি একজোড়া চটির ওপর। কিছু একটা বলতে গিয়েও তিনি থমকে গেলেন। ক্লান্ত সুমনার দিকে মনোযোগ দিলেন : 'চল্, আস্তে-আস্তে চল্। কোনও ভয় নেই, আমি তো আছি।'

সুমনা মাকে নিয়ে মৃত অবিনাশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শুধু রক্তের কালচে রং, আর কিছু কালো মাছি ছাড়া দৃশ্যপটের আর কোনও পরিবর্তন হয়নি।

রমলাদেবীর মুখ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল। সুমনা ভাব-অনুভূতিহীন, নির্বিকার।

সংবিৎ ফিরে পেতে রমলাদেবীর যেটুকু দেরি হল সেটা তিনি পুষিয়ে নিলেন আচমকা ছুট দিয়ে। মেয়েকে ফেলে রেখে তিনি পাগলের মতো দৌড়লেন সিঁড়ির দিকে; মেয়ের কথা তাঁর মনেও রইল না।

মাকে উধাও হতে দেখে সুমনাও চুপ করে থাকল না। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাকে অনুসরণ করল। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে যে-দৃশ্য ও দেখল তাতে অবাক হওয়ারই কথা। এবং সেইসঙ্গে ভয়ের পরশও বুঝি দোলা দিয়ে যায়...।

সুশান্ত মল্লিকের শোওয়ার ঘরে দাঁড়িয়েই নীচের তলার শোরগোলটা তার কানে গেল। একটু যেন বিচলিত হয়েই তার বাঁহাত পকেট ছুঁয়ে দেখল, অনুভব করল ইস্পাতের ভরসা। তারপর বেড়ালের পায়ে বেরিয়ে এল বসবার ঘরে। সিঁড়ির লাগোয়া দরজায় কান পেতে শুনতে পেল একাধিক নারীকণ্ঠ। ওরা কথা বলছে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই কথা মিলিয়ে আসতে লাগল—ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামছে।

সুতরাং সে বেরিয়ে এল দরজার বাইরে, চোরা পায়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে—পলকের জন্য রেলিঙের পাশ দিয়ে তার চোখে পড়ল রঙিন শাড়ির আভাস। নির্লিপ্তভাবে ওদের অনুসরণ করল সে।

যখন সে সিঁড়ির শেষ ধাপে, নজরে পড়ল তার রেখে যাওয়া চটিজোড়া, এবং কানে এল একটা চাপা অদ্ভুত চিৎকার—যদি তাকে চিৎকার বলা যায়। পরক্ষণেই যে কারও

ফিরে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে. সেটা বুঝতে পেরেই চট করে চটিজোড়া হাতে তুলে নিল সে. শ্বাপদের মতো ক্ষিপ্র পায়ে সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠতে শুরু করল। পিছনে ভেসে আসছে পায়ের শব্দ।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে লুকনোর চেষ্টায় আবার বসবার ঘরেই ঢুকে পড়ল সে। চঞ্চল চোখে জরিপ করে ডানদিকের দেওয়ালের গায়ে, সোফা সেটের ঠিক বিপরীত দিকে, সে আবিষ্কার করল একটা ছোট দরজা। ঝটিতি সেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। হাতের চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে আবার দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর ভালো করে দেখতে লাগল ঘরটা।

আটফুট বাই চারফুট ছোট্ট ভাঁড়ার ঘর। টুকিটাকি জিনিসে—হাঁড়ি, কড়াই, টিনের কৌটো, বালতি আর একটা বিশাল আলমারিতে ঠাসা। কোনওরকমে জনাতিনেক পাশাপাশি দাঁড়ানো যায়।

আলমারির পাশে একটা সবুজ কাঠের মই। মাথার ওপরে কাঠের সিলিং। তার এক জায়গায় একটা চৌকো ফোকর—অর্থাৎ, ওপরের কুঠরি-ঘরে যাওয়ার দরজা। সেই চৌকো তক্তাটা একটা আংটা দিয়ে বাইরের কাঠের সঙ্গে আটকানো। এবার কাঠের মইটার অর্থ বুঝতে পারল সে। এই মই বেয়ে উঠে কাঠের চৌকো তক্তাটা খুলে একজনের পক্ষে ওপরের কুঠরি-ঘরে যাওয়া সম্ভব। মই বেয়ে ওপরে ওঠার ইচ্ছেটা একবার তার মনে চাড়া দিয়ে উঠল, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল বসবার ঘরের দরজা। হাঁফাতে-হাঁফাতে কেউ ঢুকল ঘরে। তারপর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ছুটতে শুরু করল।

কান খাড়া করে নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সে। চোখ ভাঁড়ার ঘরের ছোট্ট জানলা দিয়ে দূরের রোদে-ধোওয়া নীল আকাশে। মনে-মনে পরিস্থিতির ওজন মাপতে চাইল সে। পারল না। সব চিন্তা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ভেসে আসছে মশার গুনগুন একটানা কান্না...।

জমাট পাথরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন রমলা মল্লিক। তেমনি নিশ্চল তাঁর বিস্ফারিত দু-চোখ। তাকিয়ে আছেন সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে দেওয়ালের পাশে একটি বিশেষ জায়গার দিকে। মায়ের হতবাক হওয়ার কারণ সুমনা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারল। মায়ের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে ও সেইদিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কোনও কিছুই ওর নজরে পড়ল না।

সুমনা ভয় পেয়ে দু-হাতে ঝাঁকুনি দিল মাকে : 'কী হয়েছে মা? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?'

ক্লান্ত আচ্ছন্ন স্বরে রমলা মল্লিক বললেন, 'সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় একজোড়া চটি দেখেছিলাম, এখন দেখছি না।'

কথার অর্থটা মনের গভীরে কেটে বসতে সুমনার যেটুকু সময় লাগল। তারপরই ও ক্ষিপ্র পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। পিছন থেকে মায়ের ভেসে আসা 'কী হল, সুমু?'র উত্তরে ও কোনওরকমে বলল, 'দাঁড়াও মা, অফিস-ঘরের চাবিটা নিয়ে আসি।'

রমলা মল্লিক মেয়েকে চোখের আড়াল করতে চাইলেন না। ওকে অনুসরণ করলেন। সুমনা তখন একধাক্কায় বসবার ঘরের দরজা খুলে ফ্রিজের ওপরে রাখা অফিস-ঘরের চাবিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। দ্রুতপায়ে পাশ কাটিয়ে নেমে যেতে-যেতে মাকে ও বলল, 'তুমি শিগগির বাবাকে ডাকো! আমি পুলিশে ফোন করছি।'

মাকে বিহ্বল অবস্থায় সিঁড়িতে রেখে সুমনা ছুটে গেল একতলার অফিস-ঘরে। অ্যাডভোকেট সুশান্ত মল্লিকের অফিসে।

মানসিক অস্থিরতায় তালার গায়ে চাবিটা ঢোকাতে কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর। তারপর একঝটকায় দরজা খুলে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বাঁ-প্রান্তে বসানো টেলিফোনের কাছে পৌঁছে গেল সুমনা। কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরাতে যেতেই বুঝল, রিসিভার নিস্তব্ধ। তাতে ডায়াল টোনের সুপরিচিত 'কড়-কড়' শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শতচেষ্টাতেও যখন কিছু হল না, তখন রূঢ় বাস্তবটা সুমনা বুঝতে পারল।

ওদের বাড়ির টেলিফোনের লাইন কেউ কেটে দিয়েছে...।

সাময়িক স্থবিরতা কাটিয়ে রমলা মল্লিক যখন সচল হলেন, তখন বেশ কয়েকসেকেন্ড কেটে গেছে। স্বামীকে অবিশ্বাস্য ঘটনা কীভাবে বিশ্বাস করাবেন সেই কথা ভাবতে-ভাবতে তিনি উঠে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে দেখতে চাইলেন নীচের চটিজোড়ার মতো এই বসবার ঘরে কোনওরকম গরমিল চোখে পড়ছে কি না। পড়ল না। সুতরাং ধীরে-ধীরে তিনি এগোলেন সুশান্ত মল্লিকের শোওয়ার ঘরের দিকে।

ঘরের ভেজানো দরজায় হাত রাখতেই অস্পষ্টভাবে কারও নড়াচড়ার শব্দ তাঁর কানে এল—বোধহয় ভাঁড়ার ঘরের দিক থেকে। থমকে দাঁড়ালেন রমলাদেবী। চোখ এবং পা যথাক্রমে ফেরালেন ভাঁড়ার ঘরের ভেজানো দরজার দিকে। তারপর ধীরে-ধীরে পা বাড়ালেন।

ভেজানো দরজায় হাত ছোঁয়াতেই তাঁর বুক কেঁপে উঠল অজানা আশঙ্কায়। তবু সাহসে ভর করে দরজায় চাপ দিলেন। ক্ষীণ প্রতিবাদে কাঁচকাঁচ সুরে খুলতে শুরু করল দরজা। খানিকটা খুলতেই দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে চাইলেন কিন্তু বিশেষ কিছুই তাঁর নজরে পড়ল না। অতএব মনকে বোঝালেন শব্দটা অবাধ্য ইঁদুরের। তারপর ফিরে এলেন শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে।

ঘরে ঢুকে প্রথমে যে অস্বাভাবিক ব্যাপারটা রমলা মল্লিকের নজরে পড়ল অথবা

বলা যায়, 'কানে এল'—সেটা সুশান্ত মল্লিকের ভারি শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুপস্থিতি। ঘরের প্রতিটি জিনিসই নিজের-নিজের জায়গায় স্বাভাবিকভাবে বর্তমান। এমনকী দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কান পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে সুশান্ত মল্লিকও স্বাভাবিকভাবে শুয়ে আছেন।

হঠাৎ যেন গতি এবং সংবিৎ ফিরে পেলেন রমলাদেবী। দ্রুতপায়ে পৌঁছে গেলেন স্বামীর বিছানার কাছে। ঝুঁকে পড়লেন খাটের ওপর। স্বামীর গায়ে হাত রেখে ধাক্কা দিলেন, ডাকলেন, 'ওগো, শুনছ? শিগগির ওঠো। সর্বনাশ হয়েছে—।'

কিন্তু বারবার ডেকেও কোনও সাড়া না-পেয়ে রমলা মল্লিক অবাক হলেন। আর তখনই তাঁর চোখ পড়ল স্বামীর মাথার দিকে। এবং অসঙ্গতিটা তাঁর নজরে পড়ল।

তাঁর হাতের ধাক্কায় স্বামীর শরীরটা নড়ছে ঠিকই, কিন্তু সেই অনুপাতে মাথাটা প্রায় নড়ছে না-বললেই চলে।

বুকভরা আশঙ্কা নিয়ে একঝটকায় লেপটা তুলে নিলেন রমলাদেবী। এবং বুঝলেন, মাথাটা কেন ঠিকঠাক নড়ছিল না।

সুশান্ত মল্লিকের মাথা এবং শরীরের মাঝে প্রায় চার আঙুল পরিমাণ ফাঁক যেন হাঁ করে রমলা মল্লিককে গ্রাস করতে আসছে।

রক্তাক্ত বিছানা-বালিশের রং হঠাৎ যেন হলুদ ফুলে বদলে গেল রমলাদেবীর চোখের সামনে। তিনি টলে পড়লেন মেঝেতে।

হয়তো সেই কারণেই, সুশান্ত মল্লিকের খাটের নীচে রাখা ফল-কাটার ধারালো রক্তাক্ত বঁটিটা তাঁর নজরে পড়ল না।

রমলাদেবীর পড়ে যাওয়ার ভারি শব্দটাও তার কানে গেল। এর আগের ছোটখাটো শব্দগুলো তার কানে গেলেও মাথায় ঢোকেনি। শেষ শব্দটায় সে চমকে উঠল। সন্তর্পণে খুলে ফেলল ভাঁড়ার ঘরের দরজা। ডাইনে-বাঁয়ে একপলক করে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না-পেয়ে এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে।

ওপরে যাওয়ার এবং নীচে নামার সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সে একটু যেন দ্বিধায় পড়ল। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিল এবং নীচে যাওয়ার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

'নিঃশব্দ' শব্দটা যেন তার পায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং অবিচলিত ধীরপায়ে সে নেমে এল অফিস-ঘরের দরজার সামনে। চটিজোড়া আবার খুলে রাখল সিঁড়ির গোড়ায়। সামনেই বাথরুম। তার খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ছে ছড়িয়ে রাখা ভেজা কাপড়চোপড়, সাবান-জল ভরা বালতি, সব মিলিয়ে অসমাপ্ত কাজের ইশারা।

এবার তার মনোযোগ পড়ল অফিস-ঘরের দিকে।

কিছুটা কৌতূহল কিছুটা আগ্রহ নিয়ে সে ভেতরে উঁকি মারল।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে, তার দিকে পিছন ফিরে, টেলিফোন নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে একটি মেয়ে—যুবতী।

হাসল সে। ফোনের তার তো সে আগেই কেটে দিয়েছে, তা হলে?

নীরবে মেয়েটির পিছনে গিয়ে থামল সে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে ওর কার্যকলাপ লক্ষ করতে লাগল। এবং নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

ফোন রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই মেয়েটি তার মুখোমুখি হল।

মুহূর্তের নীরবতা।

তার কালো পোশাক এবং সাদা হাসির পরস্পরবিরোধী চেহারায় মেয়েটির চোখজোড়া অবাক হল, বিস্ফারিত হল।

এবং কোনও শব্দ তৈরির আশায় নরম ঠোঁটজোড়া স্ফুরিত হতেই বিদ্যুতের মতো তার থাবা আছড়ে পড়ল মেয়েটির মুখে...।

রমলাদেবীর জ্ঞান ফিরলেও আচ্ছন্ন ভাবটা কাটতে বেশ সময় লাগল। তিনি 'কোথায়, কী করে, কেন?' এইসব প্রশ্নের উত্তরগুলো ধীরে-ধীরে তাঁর মনকে ভারি করে তুলল। মাথাটা দু-হাতে চেপে ধরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। নীরবে তাকালেন স্বামীর শরীরের দিকে। স্বামীর লেপে-ঢাকা দেহটা জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। দু-চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল, জ্বালা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন। ইতস্তত তাকিয়ে ঝুঁকে পড়লেন খাটের নীচে, ফল-কাটার বঁটিটা টেনে নিতে গিয়ে থমকালেন। কারণ, বঁটি রক্তে মাখামাখি। কিন্তু মনের দ্বিধা কাটিয়ে আস্থা-ভরা ডানহাতে তুলে নিলেন বঁটিটা। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে চলে এলেন বসবার ঘরে। ভাঁড়ার ঘরের খোলা দরজা দেখে সচকিত হলেন। ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

কেউ নেই।

বসবার ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় ফ্রিজের ওপর থেকে তালা এবং চাবিটা তুলে নিলেন। বঁটিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে দরজায় তালা দিলেন রমলাদেবী। চাবিটা কোমরে গুঁজে দোতলার বাকি দুটো ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, প্রতিটির দরজার কড়া সরু পাটের দড়ি দিয়ে বাঁধলেন। পাটের দড়ির বাকিটা ফেলে দিলেন বারান্দার একপাশে। তারপর মেঝে থেকে রক্তাক্ত বঁটিটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন।

দরজার কড়া দড়ি বাঁধার উদ্দেশ্য নিয়ে রমলাদেবীর মনে কোনওরকম ভুল ধারণা ছিল না। তিনি একমুহূর্তের জন্যও ভাবেননি, ওই হালকা দড়ি দিয়ে অদৃশ্য খুনিকে তিনি আটকে রাখতে পারবেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর অজান্তে কেউ কোনও ঘরে ঢুকলে সেটা যেন তিনি বুঝতে পারেন। আর বসবার ঘরের দরজায় তালা দেওয়ার কারণ,

সুশান্ত মল্লিকের শোওয়ার ঘরেই তাঁদের টাকা-পয়সা, গয়না-সম্পত্তি ইত্যাদি থাকে। অনুপ্রবেশকারী যদি কোনও চোর-ডাকাত হয় তা হলে সেগুলো যাতে তার হাতে না-পড়ে সেইজন্যই এই সাবধান হওয়া।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রমলাদেবী মনস্থির করতে কয়েকমুহূর্ত খরচ করলেন। তারপর গলা তুলে ডাকলেন, 'সুমু—সুমু—উ—উ!'

বন্ধ বাড়িতে তাঁর ডাক কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

দু-মিনিট অপেক্ষার পরও কোনও উত্তর পেলেন না। শুধুই নিস্তব্ধতা।

সুতরাং এইবার তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নামতে শুরু করলেন তিনি। লক্ষ্য অফিস-ঘর। বাইরের পৃথিবী তখন তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গেছে। তা নইলে রমলাদেবী হয়তো শুনতে পেতেন প্রভা রায়গুপ্তের উৎকণ্ঠিত স্বর। তিনি তখন একনাগাড়ে রমলা মল্লিক এবং সুমনা মল্লিকের কুশল সম্পর্কে প্রশ্ন করে চলেছেন।

অফিস-ঘরে পৌঁছে ঘরের যা অবস্থা রমলাদেবীর নজরে পড়ল, তাতে ঘরটাকে অফিস-ঘর বাদে আর সব কিছু বলা চলতে পারে। কাচের টেবিলের কাচ শতটুকরো, টেলিফোনটা পড়ে আছে মেঝেতে, খাতাপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে। একটা চেয়ার কাত হয়ে পড়ে আছে, আর সুমনা পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। ওর বাঁ-কানের পাশে পড়ে আছে কালো টেলিফোন-রিসিভারটা।

রমলাদেবী হাতের বঁটিটা একপাশে নামিয়ে রাখলেন। এগিয়ে গিয়ে সুমনার দেহের পাশে হাঁটুগেড়ে বসলেন। হাতের ধাক্কায় একমাত্র মেয়ের দেহটা চিৎ করে ফেললেন। বুঝলেন, ও আর বেঁচে নেই।

সুশান্ত মল্লিকের বেলায় রক্তপাতের যেমন ছড়াছড়ি ছিল এখানে তা নেই। টেলিফোনের কালো কর্ডটা সুমনার নরম গলায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। তার চাপে সুমনার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, মুখের ভেতরে জিভের আর জায়গা হয়নি।

চাপা রাগে, আক্রোশে রমলাদেবীর বুকের ভেতরটা যেন টুকরো-টুকরো হয়ে গেল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে। সম্ভবত দোতলায় যে-কয়েকমিনিট তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই ঘটে গেছে অফিস-ঘরের তাণ্ডব। উঠে দাঁড়াতে গিয়েই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন রমলাদেবী। তাই হাত বাড়ালেন বঁটিটার দিকে।

এবং দেখলেন বঁটিটা তার জায়গায় নেই!

সুতরাং ভুল শোধরানোর সময়টুকু তিনি পেলেন না।

পরমুহূর্তেই তাঁর শরীরের ওঠার চেষ্টাকে থামিয়ে দিল ধারালো কোনও কিছুর অমানুষিক আঘাত...।

প্রভা রায়গুপ্ত এবার অধৈর্য হয়ে পড়লেন। অফিস-ঘরের 'সশব্দ তাণ্ডব' তাঁর শুনতে না-পাওয়ার কারণ তখন তিনি বাড়ির পিছনদিকের ছাদে নিজের এঁটো বাসনগুলো ধুয়ে

রাখছিলেন। এবং প্রথমবারে সুমনার চিৎকার তিনি যে শুনতে পাননি তার কারণ, তখন তিনি নিত্যকার নিয়মমাফিক খাওয়ার আগে সেই ছাদে দাঁড়িয়েই পাখিদের খাওয়াচ্ছিলেন। পাখিদের খাওয়ানো হলে তবে তিনি নিজে খেতে বসেন।

কিন্তু রমলাদেবীর শেষবারের চিৎকারে তিনি বিচলিত হয়েছেন, এবং বারবার ভ্রাতৃবধূর ও তাঁর কন্যার নাম ধরে ডেকে উঠেছেন—কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। মানুষের বয়েস হলে স্বভাব একটু খুঁতখুঁতে হয়, এবং অল্পেতেই ভয় পেয়ে যায়। হয়তো সেই কারণেই, রমলাদেবী অথবা সুমনার কাছ থেকে কোনও উত্তর না-পেয়ে তিনি বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

শীতের দুপুরে জানালা-দরজা ভেজিয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শোয়াটা প্রভাদেবীর পুরোনো অভ্যেস। প্রথমত, সেই অভ্যাস ভেঙে তাঁকে বিছানা ছাড়তে হল। দ্বিতীয়ত, সাত বছরের পুরোনো বাতের ব্যথাকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে ঘরের বাইরে আসতে হল। তারপর নিরুপায় হয়েই তিনতলা থেকে তিনি নেমে আসতে লাগলেন দোতলায়।

দোতলায় এসে দাঁড়াতেই দুটো জিনিস তাকে ভীষণ অবাক করল।

এক, বসবার ঘরের দরজায় তালা দেওয়া, অন্যান্য ঘরগুলোর দরজার কড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা।

দুই, অদ্ভুত অপার্থিব নীরবতা।

কিন্তু একটা আবিষ্কার তাঁর অবাক হওয়ার প্রথম কারণকে একটু কমজোরি করে দিল। বাথরুমের লাগোয়া খাওয়ার ঘরের দরজার কড়ায় দড়ি বাঁধা নেই। কিন্তু খোলা দড়িটা একটা কড়া থেকে ঝুলছে বলে সিঁড়ির কাছ থেকে তাঁর মনে হয়েছিল দরজা বুঝি বন্ধ।

আরও অবাক হলেন প্রভাদেবী। রমলাদেবী এবং সুমনার নাম ধরে আরও দু-চারবার ডাকলেন। তাঁর গলা ক্রমশ খাদে নেমে আসতে লাগল। একবার ভাবলেন, নীচটা দেখে আসি। সুতরাং বাথরুম, রান্নাঘর এবং সুমনার ঘরের দড়ি-বাঁধা দরজাগুলোর দিকে একপলক তাকিয়ে তিনি একতলার সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দটা কি ক্রমশ বেড়ে ওঠায় বুকের শব্দটা জোরালো ঠেকছে?

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে প্রায় একইসঙ্গে তিনটে জিনিসের ওপর প্রভাদেবীর নজর পড়ল।

বাথরুমের খোলা দরজা।

অফিস-ঘরের খোলা দরজা।

এবং একজোড়া চটি...।

চটচটে বঁটিটা নামিয়ে সে ক্লান্ত দেহ নিয়ে বসল মাটিতে। দেখল একপলক নিজের তৈরি ধ্বংসস্তূপের দিকে।

এখন শীতকাল—সুতরাং শীত করার কথা। কিন্তু তার শরীরে যেন অসহ্য জ্বালা। সেই জ্বালা মাকড়সা-জাল ছড়িয়ে দিয়েছে তার জটপাকানো মস্তিষ্কে।

জটপাকানো অন্ধ মস্তিষ্কে সুষম চিন্তা করতে চেষ্টা করল সে। ভাবতে চেষ্টা করল, সে কোথায়। এখানে এল কী করে? মেঝেতে শুয়ে আছে এরাই-বা কারা? কই, এদের কখনও দেখেছে বলে তো মনে পড়ছে না!

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনার পর সে সিদ্ধান্তে এল, না, এদের কাউকেই সে চেনে না, এই বাড়িটাও তার অচেনা, এমনকী এই পৃথিবীটাও তার অচেনা। একমাত্র চেনা-পরিচিত যে ছিল, ও আজ কোথায়! সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল ওকে। আর তখনই এই পৃথিবী তাকে বাধা দিয়েছে। গলা টিপে শেষ করেছে তার 'ইচ্ছে'কে। আর, এক 'ইচ্ছে'কে শেষ করতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে ওদের দ্বিতীয় 'ইচ্ছে'—যে 'ইচ্ছে' ওদের মনের মাঝে ছিল। ওরা যখন তার সব 'ইচ্ছে' শেষ করে দিচ্ছিল, তখন ওদের বাধা দিতে গিয়ে রুখতে গিয়ে মাথার ভেতরে ঘটে গেছে ভিসুভিয়াসের বিস্ফোরণ। তারপর? ...তার পরের ইতিহাসে আছে সাদা ধবধবে চার দেওয়াল, দৈহিক অত্যাচার, ইলেকট্রিক শক, কালো ফ্রেমের চশমা, সাদা পোশাক, আর স্টেথোস্কোপ। অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেছে মুক্ত খোলা আকাশ, নীরব সুন্দর চাঁদ, আর মুখর তারা।

সুদীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি সে কাটিয়ে উঠেছে। তারপর এসে পৌঁছেছে এইখানে, একশো দুশমনের মাঝখানে। এখন এই শত্রুহীন মুহূর্তে নিজেকে আর-একবার ক্লান্ত বলে মনে হল তার। অবসাদ যেন বরফ-ঠান্ডা আস্তরে তার মনকে জড়িয়ে রেখেছে। দু-চোখ যেন চাইছে বুজে আসতে। আ—ঃ। বড় হাঁ করে শ্বাস নিল সে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। টিপে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল দোতলায়। দোতলায় এসে অবাক হয়ে লক্ষ করল, সামনের দরজাটায় তালা দেওয়া। সুতরাং ডানদিকে এগোল সে। কী খেয়ালবশে থামল গিয়ে শেষপ্রান্তে, খাওয়ার ঘরের দরজায়। কড়ায় বাঁধা দড়িটা খুলে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। দরজা ভেজিয়ে দিল। সামনের টেবিলে রাখা জলের গেলাস দেখে তেষ্টা পেল তার। সুতরাং জল ভরতি গেলাসটা তুলে ঠোঁটে ঠেকাল সে—।

এবং সেই মুহূর্তে এক হৃদয়বিদারী তীক্ষ্ণ চিৎকারে তার হৃৎপিণ্ড যেন হোঁচট খেল।

থামল না সেই চিৎকার। বিভিন্ন লয়ে বিভিন্ন পরদায় কাটা রেকর্ডের মতো বেজেই চলল।

একরাশ বিরক্তি আর ঘৃণা নিয়ে পিছন ফিরে ঘরের দরজার দিকে তাকাল সে। দেখল চিৎকারের উৎস...।

অফিস-ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভেতরের দৃশ্যটা সম্পূর্ণ দেখতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হল না প্রভাদেবীর। বরং ঘরের দুজন যে মৃত সেটা বুঝতেই তাঁর সময় লাগল।

হতভম্ব প্রভাদেবীর সমস্ত মন যেন জমাট বেঁধে গেল সেই মুহূর্তে। অবস্থাটা ভালো

করে যাচাই করার জন্য আলো জ্বাললেন তিনি। এবারে আরও স্পষ্টভাবে সবকিছু তাঁর নজরে পড়ল।

সুমনা, রক্তমাখা বঁটি—যেটা এখন অচেনা লাগছে, এবং রমলার ধ্বংসাবশেষ।

পাকস্থলীর বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় প্রভাদেবীর শরীরটা কেঁপে উঠল। গা গুলিয়ে উঠল। পেট চেপে ধরে উপুড় হয়ে বমি করতে লাগলেন তিনি। শরীরের প্রচণ্ড কাঁপুনি যেন কিছুতেই আর থামতে চাইছে না।

কিছুক্ষণ পর জল-ভরা লাল চোখে অফিস-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

এবং তখনই নজরে পড়ল অচেনা চটিজোড়া।

সুতরাং এবারে কৌতূহল হয়ে উঠল প্রবল। প্রভাদেবী আবার ফিরে চললেন দোতলায়।

প্রথমে দেখতে চাইলেন সুশান্তর শোওয়ার ঘর। বসবার ঘরের ভেতর দিয়ে সুশান্তর শোওয়ার ঘরে যেতে হয়। দেখলেন, সেই দরজায় তালা। তা হলে কি সুশান্ত বাড়িতে নেই? কিন্তু না, এই তো ওর চটি, জুতো—দু-জোড়াই এখানে রয়েছে।

দোতলায় উঠেই সামনের অংশটুকু জুতো রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার হয়। সেখানে শুধু সুশান্ত মল্লিক কেন, সকলের চটি এবং জুতোই রয়েছে।

আচ্ছন্ন প্রভাদেবী এগিয়ে চললেন খাওয়ার ঘরের দরজার দিকে। কারণ, একমাত্র ওটার দরজাই বাইরে থেকে খোলা। সাধারণত আমিষাশীদের খাওয়ার ঘরে তিনি কখনওই পা দেন না, কিন্তু এই সংকট-মুহূর্তে সব নিয়মই ভাঙা যায়।

ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত ঠাকুরের নাম বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন প্রভাদেবী। তারপর হাতের চাপে খুলে ফেললেন খাওয়ার ঘরের ভেজানো দরজা।

সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত ঘটনার কার্যকারণ তাঁর বোধগম্য হল। বুঝলেন, তাঁর সামনে দাঁড়ানো এই একজনের উপস্থিতির ফলে, তাঁর সমস্ত আত্মীয় এখন অনুপস্থিত। মরতে ভয় পান না প্রভাদেবী। কিন্তু তবুও কেন জানি না তাঁর গলা চিরে বেরিয়ে এল এক অদ্ভুত চিৎকার। থামল না—বিভিন্ন লয়ে, বিভিন্ন পরদায় বেজেই চলল—।

আর সেই মুহূর্তেই তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াল কালো পোশাক পরা লোকটা...।

সে তার ঘৃণাভরা চোখে, তেষ্টাভরা বুক নিয়ে, তাকাল তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা বিধবা মেয়েছেলেটার দিকে। হঠাৎই জমাট আক্রোশ ফেটে পড়ল তার দু-চোখে। জলের গ্লাসটা ঠোঁটের কাছ থেকে নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। কালো দস্তানায় ঢাকা দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে দরজা লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটল। বিধবা বুড়িটার চিৎকার তখনও তার কানে দামামা বাজিয়ে চলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে কী ঘটে গেল, শূন্যে ছিটকে উঠল সাদা থান-পরা শরীরটা। কালো

দুটো হাতের একঝটকায় বারান্দার রেলিঙের আওতা ছাড়িয়ে একেবারে যেন উড়ে গেল বাইরে—বাড়ির বাইরে। তাঁর অন্তিম আর্তনাদটুকুর সাক্ষী রইল বাইরের ঘন নীল আকাশ, সোনালি রোদ্দুর, আর ধূসর প্রান্তর।

হতভম্বের মতো কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে। বারকয়েক আক্ষেপে মাথা নাড়ল। তারপর পা বাড়াল বসবার ঘরের দিকে।

তালাবদ্ধ দরজায় পৌঁছে চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে চলল অফিস-ঘরের দিকে।

সেখানে পড়ে থাকা বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত মহিলার শরীর হাতড়ে চাবিটা একসময় পেল সে। সুতরাং আবার উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

তালা খুলে বসবার ঘরে ঢুকে সোফায় কিছুক্ষণ সে বসল। নতুন করে অনুভব করল ক্লান্তি। তাই গা এলিয়ে দিল সোফায়।

ঘুমে যখন তার চোখ দুটো বুজে এসেছে তখন বসবার ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে তিনটের সঙ্কেত বাজল, ঢং—ঢং—ঢং...।

এবার আমরা সেই অনুপস্থিত, এ পর্যন্ত অপাংক্তেয়, মানুষটির প্রসঙ্গে আসব। বয়েস তার তেরো। ক্লাস এইটের মেধাবী ছাত্র। বাড়ির ছ'নম্বর বাসিন্দা। সুশান্ত মল্লিকের একমাত্র ছেলে সুকান্ত মল্লিক। রোজকার মতো স্কুলেই গিয়েছিল ও। ফিরছে এখন, পাঁচটার সময়। শীতের বেলা, তাই আঁধার নেমে এসেছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে রোজকার মতো দুলকি চালে মেঠো পথ ধরে হেঁটে বাড়ির দিকে আসছে ও। ওই দেখুন, বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপছে ছেলেটা, হ্যাঁ, রোজকার মতো। কিন্তু ও জানে না, 'রোজকার মতো' নয় এমন কিছু এখন ওদের বাড়িতে রয়েছে—।

সময়ের ঘড়িতে এখন পাঁচটা। স্কুলের ছুটি হয় সাড়ে চারটেয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করে দশ-পনেরো মিনিটের পায়ে-হাঁটা পথ পেরিয়ে আসতে কিছুটা সময় লাগে বইকি!

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে পরপর দুবার অবাক হল সুকান্ত, এবং একবার আশ্বস্ত হল।

প্রথম অবাক : দোতলায় বাবার ঘরের আলো, যা রোজই জ্বলে, আজ জ্বলছে না।

দ্বিতীয় অবাক : বাড়ির সদর দরজা বন্ধ, অন্যদিন যা ভেজানো থাকে। এ ছাড়া দরজার মাথায় বসানো আলোটা আজ নেভানো রয়েছে—সুতরাং ব্যতিক্রম।

আশ্বস্ত হওয়ার কারণ, রোজকার মতো একতলায় অফিস-ঘরের আলো জ্বলছে।

কলিংবেলে আঙুলের চাপ দিল সুকান্ত। পরিচিত 'বাজার' এর কড়কড় শব্দ

জোরালো ভাবেই ওর কানে এল। কিন্তু কোনও উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বেল বাজাল ও। কিন্তু কেউই কলিংবেলের ডাকে সাড়া দিল না।

ভয় পেল সুকান্ত। দু-হাতে পাগলের মতো পিটতে শুরু করল সদর দরজা। কিন্তু কোনও ফল হল না।

তখন ও চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করল, 'মা—মা—! দিদি—দিদি!'

উত্তর নেই। তা হলে কি বাড়িতে কেউ নেই? উঁহু, তা সম্ভব নয়। কারণ, সদর দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া। সুতরাং দ্বিতীয় পথের সন্ধানে অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলল সুকান্ত। ফুলবাগানের নরম মাটিতে পা ফেলে একজায়গায় এসে থামল। কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখল বইয়ের ঝোলানো ব্যাগটা। তারপর বহুবছরের অভ্যাসে পাঁচিলের গায়ে পা দিয়ে বেয়ে উঠতে চেষ্টা করল। এই পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ির ভেতরে আগেও অনেকবার ঢুকেছে ও। এখন এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ ওর কাছে খোলা নেই।

পাঁচিল ডিঙিয়ে একলাফে ভেতরের ছোট্ট উঠোনে পড়ল সুকান্ত। জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার। শুধু সামনে অফিস-ঘরের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে একটুকরো আলোর রেশ।

সেদিকে না-গিয়ে প্রথমে সদর দরজার দিকে এগোল সুকান্ত। উদ্দেশ্য দরজার ছিটকিনি খোলা।

কিন্তু ওর এই ইচ্ছেয় বাদ সাধল অবিনাশের মৃতদেহ। অবিনাশের দেহের ওপরে হোঁচট খেয়ে পড়ল ও। অন্ধকারে কিছু নজরে আসে না। তাই হাতড়ে-হাতড়ে দেওয়ালের গায়ে বসানো আলোর সুইচ টিপল ও।

আলো জ্বালতেই গোটা দৃশ্যের বীভৎসতা ওর মুখে-চোখে আছড়ে পড়ল। ঘাড় মুচড়ে পড়ে আছে অবিনাশ। কালচে রক্তের ছোপ ওর সর্বাঙ্গে, মেঝেতে, এমনকী সাদা দেওয়ালের গায়েও ছিটেফোঁটা নজরে পড়ছে।

অস্ফুট এক শব্দ করে ডুকরে কেঁদে উঠল সুকান্ত। ওর ছোট বুকটা নিঃশব্দে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ও হাঁটতে শুরু করল অফিস-ঘরের দিকে। ও যেন বোবা হয়ে গেছে। শুধু ভেতরের প্রচণ্ড আবেগে ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

অফিস-ঘরে পৌঁছে ভেজানো দরজায় হাতের চাপ দিল সুকান্ত। ধীরে-ধীরে খুলে গেল নরকের দরজা।

পরের পাঁচমিনিট ও পাথর হয়ে গেল। সেই অবস্থাতেই তাকিয়ে দেখল সবকিছু।

সে-দৃশ্যের অভিঘাত বুঝি বৃদ্ধ, যুবক, শিশু বিচার করে না। সুতরাং নির্বাক, স্তম্ভিত সুকান্ত টলোমলো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

মাকে এবং দিদিকে ও পরনের শাড়ি দেখেই চিনতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে ফল-কাটার বঁটিটাও। তবে অন্যমনস্ক থাকায় সিঁড়ির গোড়ায় রাখা চটিজোড়া ওর নজরে পড়ল না।

দোতলায় পৌঁছে শুধুমাত্র বসবার ঘরেই যে আলো জ্বলছে সেটা ওর চোখে পড়ল। এবং পুরোপুরি অবাক হয়ে ওঠার আগেই দপ্‌ করে জ্বলে উঠল ডান প্রান্তে খাওয়ার ঘরের আলোটা।

সুকান্ত প্রথমে উঁকি মারল বসবার ঘরে। কেউ নেই।

চাপা স্বরে ডেকে উঠল, 'বাবা—বাবা!'

উত্তর নেই।

তখন স্কুলের জামা-জুতো পরেই ও এগিয়ে চলল খাওয়ার ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকেই দেখল, কালো পোশাক পরা একজন অপরিচিত লোক ওর দিকে পিছন ফিরে বসে কী যেন খাচ্ছে। গলার স্বর ভারিক্কি করে ও বলে উঠল, 'তুমি কে?'

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল লোকটা। বিদ্যুৎগতিতে চেয়ার ঠেলে ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি এখানে কী করছ? আমার মাকে, দিদিকে, অবিনাশদাকে মারল কে? তুমি?'

অত্যন্ত সরল প্রশ্ন। এবং তার উত্তর ঠিক ততটাই জটিল ঠেকল লোকটার কাছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে হাসল সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল ইস্পাতের ছুরিটা।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির নিয়ম অনুযায়ী এই মুহূর্তে সুকান্তর আতঙ্কে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে ঠিক বিপরীতটাই ঘটল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বসবার ঘর লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটতে শুরু করল ও।

একলাথিতে চেয়ারটা মেঝেতে ছিটকে ফেলে লোকটা ওকে তাড়া করল। অনেকক্ষণ বাদে তার মুখে-চোখে জিঘাংসার পুরোনো রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

অন্ধকার বারান্দার দৈর্ঘ্য পেরিয়ে দড়াম করে বসবার ঘরের আধ-ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সুকান্ত। চকিতে দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল এঁটে দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার ওপাশে লোকটার শরীর এসে আছড়ে পড়ল প্রচণ্ড শব্দে। গোটা বাড়িটা যেন সন্ত্রস্তভাবে কেঁপে উঠল।

পরের কয়েকসেকেন্ডে সুকান্ত ওর ভাবনা-চিন্তার কাজ শেষ করল। ও জানে, এই নির্জন লোকালয়ে, এই শীতের সন্ধ্যায়, সাহায্য আশা করা উদ্ভট কল্পনা। সুতরাং ওর এখন দরকার একটা নিখুঁত লুকোনোর জায়গা, কারণ, দরজার ওপিঠে ক্ষুব্ধ চিতাবাঘের মতো প্রচণ্ড শক্তিতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চলেছে লোকটা। কাঠের খিল কতক্ষণ এ-অত্যাচার সইতে পারবে কে জানে!

কী ভেবে বসবার ঘর ছেড়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল সুকান্ত।

ঘর অন্ধকার।

কিন্তু বছরছরের চেনা মাপে অন্ধকার কোনও বাধা নয়। তা ছাড়া এখন আলো জ্বালারও সময় নেই। দরজা পেটানোর দুদ্দাড় শব্দ কামানের বিস্ফোরণের মতো কানে এসে ঠেকছে। সুতরাং তড়িৎগতিতে ডানদিকের দেওয়ালে গাঁথা তাকের কাছে গেল সুকান্ত। তাকে রাখা টর্চলাইটের ধাতব শরীর অন্ধকারেও ঝিলিক মারছিল। সেটা হাতে

করে বসবার ঘরে ফিরে এল ও। রেফ্রিজারেটরের মাথায় কয়েকটা চুলের কাঁটা ছিল—এখানে মা-দিদি যে এগুলো রাখে তা ওর বহুদিনের জানা। সেখান থেকে একটা কাঁটা নিয়ে সুইচবোর্ডের প্লাগ পয়েন্টে কাঁটার দুটো মাথা গুঁজে দিল। তারপর প্লাগ পয়েন্টের সুইচ অন করে দিল।

একটা চাপা শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে গোটা বাড়িটার সমস্ত আলো নিভে গেল। আর সুকান্তের হাতের টর্চের আলো জ্বলে উঠল। ও জানে কীভাবে বাড়ির সমস্ত আলো ফিউজ করতে হয়। আগেও একদিন করেছিল।

এবার ও ঢুকল ভাঁড়ার ঘরে। আলমারির পাশে রাখা কাঠের মইটা বেয়ে ওপরে উঠল। কাঠের সিলিংয়ের চৌকো অংশটায় জোরে চাপ দিতেই ডালাটা ভেতরে ঢুকে গেল, আর ওপরের কুঠরি-ঘরে ঢুকে পড়ল সুকান্ত।

এই ছোট্ট কাঠের 'কার'-এ ওদের চাল-গম-সরষের বস্তা থাকে। থাকে মুড়ি-চিঁড়ের সঞ্চয়। সুতরাং ইঁদুর-আরশোলার উপদ্রবও আছে। জ্বলন্ত টর্চটাকে একপাশে নামিয়ে রেখে, ছোট্ট দু-হাতে মইটাকে টেনে ওপরে তুলতে লাগল ও—যাতে আর কেউ এই মই বেয়ে ওপরে উঠতে না-পারে।

অতিকষ্টে, একরাশ ধুলো মেখে, মিনিটপাঁচেক পর ও সফল হল। মইটা অদ্ভুতভাবে 'কিছুটা ভেতরে কিছুটা বাইরে' অবস্থায় আটকে রইল।

সুকান্তর সামনে-পিছনে ধুলোমাখা বস্তা আর থলে। টর্চের আলোয় চোখে পড়ছে হলুদ আর শুকনো লঙ্কার ঠোঙা। এবং ওর সাধের হামানদিস্তে। প্রতি বছর বিশ্বকর্মা পুজোর সময় যে হামানদিস্তে দিয়ে ও কাঁচ গুঁড়ো করে সুতোয় মাঞ্জা দেয়।

নিজের শরীরটাকে যতটা সম্ভব ভেতরে ঢুকিয়ে ও চুপটি করে বসল। নিভিয়ে দিল টর্চের আলো।

চারিদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যেতেই দরজা ধাক্কার শব্দটা বিকটভাবে কানে এসে বাজল। সুকান্ত শুনল, প্রতিবাদে-প্রতিবাদে ক্লান্ত কাঠের খিলের ক্ষীণ মচমচ শব্দ। ও বুঝল, বসবার ঘরের দরজা ভাঙতে আর দেরি নেই। কিন্তু বাবা, পিসিমণি—ওরা কি এ-শব্দ শুনতে পাচ্ছে না? শুনতে যদি পেয়ে থাকে তা হলে ছুটে আসছে না কেন?...তা হলে কি ওদের অবস্থাও মা-দিদি-অবিনাশদার মতো?

হঠাৎ সুকান্তর মনে পড়ল, টর্চ আনতে শোওয়ার ঘরে ঢুকবার সময় একটা বিশ্রী আঁশটে দুর্গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মেরেছিল। ও ফিসফিস করে ডেকে উঠল, 'বাবা বাবা—'

এক সময়, এক চূড়ান্ত মুহূর্তে, ভেঙে পড়ল শেষ প্রতিরোধ বসবার ঘরের দরজা।

লাথি মেরে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাল্লাটাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকল সে।

সামনে অন্ধকার, পিছনেও অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে মাঝে-মাঝে ঝলসে উঠছে তার হাতের ইস্পাতের ছুরিটা। কালো অন্ধকারে তার কালো পোশাক মিশে গেছে।

প্রথম কয়েকসেকেন্ড সে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুনতে চেষ্টা করল কোনও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। তারপর ধীরপায়ে এগোল শোওয়ার ঘরের দিকে।

এখানেও যথারীতি অন্ধকার। নজর চলে না। সুতরাং পকেট হাতড়ে একটা সস্তার লাইটার বের করল সে। চাবি টিপতেই একটা নীলচে আলোর শিখা লাফিয়ে জ্বলে উঠল। ডানহাতে লাইটার উঁচিয়ে ধরল সে। ক্ষীণ আলোয় বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা মৃতদেহটা আবছাভাবে চোখে পড়ল। নিচু হয়ে খাটের তলাটা দেখল সে। না, কেউই সেখানে লুকিয়ে নেই। এবং তারপরই শুরু হল তার তন্নতন্ন অনুসন্ধান পর্ব।

শোওয়ার ঘর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁজে দেখার পর সে ফিরে এল বসবার ঘরে। ইস্পাতের ছুরিটা পকেটে রেখে শোওয়ার ঘর এবং বসবার ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ করল। বসবার ঘর থেকে এক গাছা দড়ি বের করে শক্ত হাতে বাঁধল দরজার কড়া দুটো। পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল আবার। কী এক অজানা প্রতিজ্ঞায় তার চোয়াল আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। এবার ছুরিটা বের করে বাঁহাতে উঁচিয়ে ধরল সে।

শোওয়ার ঘর শেষ করে এবার বসবার ঘরের পালা।

প্রথমে সোফাসেটগুলোকে টেনে এনে ভাঙা দরজার মুখে স্তূপাকারে রাখল সে। উদ্দেশ্য জলের মতোই সরল : যাতে কেউ আচমকা দরজা ডিঙিয়ে পালাতে না পারে।

বসবার ঘরে আতিপাতি করে খুঁজেও কাউকে পাওয়া গেল না। সুতরাং সে নিশ্চিত হল, বাচ্চাটা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে।

বুকভরা ভারি শ্বাস নিয়ে জ্বলন্ত লাইটার হাতে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল সে। ডানদিকে-বাঁদিকে তাকাল। তাকাতেই ওই ছোট ঘরটায় যে-বিশাল পরিবর্তনটা তার নজরে পড়ল তা হল সবুজ কাঠের মইটা। ওটার ওপরের দিকটা ঢুকে গেছে কুঠরি-ঘরের ভেতরে। আর বাকি অংশটা বেরিয়ে আছে বাইরে। নির্ঘাত কুঠরি-ঘরে ঢুকেছে ছেলেটা। ছুরি উঁচিয়ে ওপরে তাকাতেই একইসঙ্গে মইয়ের শেষটুকু আর বাচ্চাটার জ্বলন্ত চোখে তার চোখ পড়ল। একমুহূর্ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির হয়ে রইল। তারপর...।

সুকান্ত চারপাশের শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া করে রেখেছিল। শুধুমাত্র শব্দ শুনেই পাশের ঘরের কার্যকলাপের হদিশ পাচ্ছিল ও। অবশেষে, যখন লাইটারের আলোটা ভাঁড়ার ঘরের দরজায় এসে থামল, তখন ও ভয় পেল। শরীরটাকে আরও গুটিয়ে নিল ভেতরে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর কৌতূহলে নীচের দিকে একবার উঁকি মারল সুকান্ত।

এবং সঙ্গে-সঙ্গেই কালো জামা পরা লোকটার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। ত্রাসে পিছিয়ে আসার আগেই ও শুনতে পেল এক অদ্ভুত জান্তব চিৎকার। সে-চিৎকারে

ফেটে পড়ছে জয়ের উল্লাস। পরমুহূর্তেই নীচের কালো চেহারাটা শূন্যে লাফিয়ে উঠল। ইস্পাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল সুকান্তর চোখের সামনে। ঝটিতি মুখ সরিয়ে নিল ও। লোকটার ছুরির ফলা হাওয়ায় শিস কেটে ফিরে গেল নীচে।

এবার অবাক হয়ে সুকান্ত লক্ষ করল, লোকটা ছুরিটার গায়ে চাপ দিয়ে ভাঁজ করে ওটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখছে। তারপর আংশিক বেরিয়ে থাকা মইটা লক্ষ্য করে আচমকা লাফ দিল সে। ভয়ে চমকে পেছোতে যেতেই হামানদিস্তের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুকান্ত। অন্ধকারে অনুভব করল জিভের ডগায় নোনতা স্বাদ। একটা ঘড়ঘড় শব্দ করে ওর গায়ে গা ঘষে কাঠের মইটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই শব্দে সুকান্তর সংঘর্ষের শব্দটা চাপা পড়ে গেল।

একমিনিট...দু-মিনিট...।

সুকান্ত বুঝল, দেওয়ালের গায়ে মই লাগিয়ে, নিজেকে তৈরি করে, ওপরে উঠতে শুরু করেছে লোকটা। একটু পরেই চৌকো কাঠের ফোকরের ভেতরে জেগে উঠল কালো মাথাটা। জ্বলজ্বলে চোখজোড়া নিঃশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লোকটা তার জ্বলন্ত লাইটার-ধরা হাতটা তুলে ধরতে গেল। আর সেইমুহূর্তেই এক অমানুষিক শক্তি সুকান্তর শরীরে ভর করল। হামানদিস্তের মোটা লোহার রডটা নিয়ে দু-হাতে সর্বশক্তি দিয়ে ও লোকটার মাথায় আঘাত করল। একবার, দুবার...।

ধীরে-ধীরে মইয়ের গা থেকে ঢলে পড়তে লাগল লোকটা। মইটা কাত হয়ে গিয়ে ঠেকল দেওয়ালের কোণে, আর শানবাঁধানো মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ল লোকটার শরীর। জ্বলন্ত লাইটারটা নিভে গিয়ে কোথায় যেন ঠিকরে পড়ল।

কুঠরি-ঘরের ফোকর দিয়ে টর্চের আলোয় সুকান্ত দেখল, ঠিক নীচেই শ্লথ ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে লোকটা।

টর্চটাকে জ্বলন্ত অবস্থায় পাশে নামিয়ে রেখে দু-হাতে গোটা হামানদিস্তেটা তুলে ধরল ও। তারপর, গুলি খেলার সময় যেরকম 'নাল্পু' করে, সেরকম ভঙ্গিতে লোকটার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল হামানদিস্তেটা।

লোকটার মাথার সঙ্গে পাঁচ কেজি ওজনের লোহার সংঘর্ষের শব্দটা তেমন জোরদার হল না। 'ফট' করে একটা শব্দ হল শুধু।

জ্বলন্ত টর্চটা হাতে নিয়ে একটা পা আলমারির গায়ে দিয়ে, অন্য পা-টা হেলে যাওয়া মইটার গায়ে রেখে অতিকষ্টে মেঝেতে নেমে এল সুকান্ত। টর্চের আলোয় দেখল, লোকটার কালো পোশাকের সঙ্গে রক্তাক্ত মুখটা নিতান্তই বেমানান লাগছে। হামানদিস্তের দুটো অংশ দু-পাশে পড়ে রয়েছে।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সুকান্ত লোকটার শরীর ডিঙিয়ে হামানদিস্তের রডটা তুলে নিল। তারপর কী ভেবে নিভিয়ে দিল টর্চটা। এবং লোকটার মাথা আন্দাজ করে রড দিয়ে পাগলের মতো আঘাত করে চলল—একবার, দুবার...।

জ্ঞানশূন্য মিনিটপাঁচেকের পর থামল সুকান্ত। রডটা নামিয়ে রেখে টর্চটা জ্বালাল।

তারপর জ্বলন্ত টর্চটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে দু-হাতে চেপে ধরল লোকটার পা দুটো। অনেক কসরৎ করে পা দুটোকে টেনে নিয়ে এল ভাঁড়ার ঘরের দরজার বাইরে। এবার শরীরের সমস্ত ক্ষমতা একজোট করে লোকটাকে টেনে নিয়ে এল বসবার ঘরে। সেখানে তাকে শুইয়ে রেখে ও ভাঁড়ার ঘরে আবার ঢুকল। পড়ে থাকা টর্চের আলোয় দেখতে পেল লাইটারটা। লাইটার ও টর্চটা তুলে নিয়ে ফিরে এল বসবার ঘরে। লাইটারটা পকেটে রেখে শোওয়ার ঘরের দরজায় বাঁধা রেশমি দড়িটা খুলতে চেষ্টা করল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় নিরাশ হয়ে ও লোকটার শুয়ে থাকা শরীরের পকেট হাতড়ে ছুরিটা বের করল। চাবি টিপতেই ফলাটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এরপর শোওয়ার ঘরের দরজা খোলা কয়েকসেকেন্ডের কাজ। সুতরাং...।

বাবার শরীর এবং মাথাকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করেও বিচলিত হল না সুকান্ত। কারণ, ইতিমধ্যেই ও সবরকম ভাব এবং আবেগ নিঃশেষে খরচ করে বসে আছে। শুধু শ্লথ পায়ে ও ফিরে এল বসবার ঘরে। আধঘণ্টার চেষ্টায় অনেক শব্দ করে ও সরিয়ে ফেলল সোফাসেটগুলো। তারপর ভাঙা দরজা পেরিয়ে টর্চ জ্বেলে রওনা হল তিনতলার দিকে। এখন ও খুঁজতে চলেছে পিসিকে।

তিনতলা, দোতলা, একতলায় খোঁজ করেও পিসিকে পেল না ও। তাই ফিরে এল বসবার ঘরে। কালো-পোশাকি লোকটার গায়ে টর্চের আলো ফেলে কী চিন্তা করল। তারপর ফিরে চলল খাওয়ার ঘরের দিকে।

বারান্দার বাঁ-কোণে খাওয়ার ঘরের দরজার ঠিক মুখেই থাকে কেরোসিন তেলের টিনটা। সেটাকে একহাতে নিয়ে অন্য হাতে টর্চ জ্বেলে বসবার ঘরে ফিরে এল ও। টর্চটাকে জ্বলন্ত অবস্থায় একটা সোফার ওপরে রেখে কেরোসিন তেলের টিনটা লোকটার গায়ে উপুড় করে দিল।

একটু পরে খালি টিনটা একপাশে ছুড়ে ফেলল। পকেট থেকে লাইটারটা বের করে জ্বালল। আগুন ধরিয়ে দিল কালো পোশাকে। তারপর লাইটার ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল বসবার ঘর থেকে। আগুনের শিখা তখন লোকটার শরীরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

অন্ধকারেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সুকান্ত।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে অন্ধকার অফিস-ঘরের সামনে একমুহূর্ত দাঁড়াল ও। তারপর এগিয়ে চলল সদর দরজার দিকে। অন্ধকার থাকলেও এবারে অবিনাশের মৃতদেহে হোঁচট খেল না ও। পা যথাসম্ভব উঁচু করে দরজার ছিটকিনিটা খুলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর মেঠো পথ ধরে দিগভ্রান্তের মতো হাঁটতে শুরু করল।

আসুন, এদিকেই নরকের দরজা

এবার এদিকে আসুন...দেখবেন, মাথার দিকে খেয়াল রাখবেন, নইলে ঝুলে থাকা পাথরে যে-কোনও সময় চোট পাবেন। বুঝতেই তো পারছেন, ১৭০০ সালের দুর্গ এর চেয়ে আর কত ভদ্র হবে! সিঁড়ির ধাপগুলো নড়বড়ে হলেও তেমন ভয় নেই, কাঠগুলো দিব্যি মজবুত আছে। আমার আটবছরের চাকরিতে এ-সিঁড়ি ভেঙে কেউ কখনও পড়ে যায়নি। আসুন—ধীরে-ধীরে নেমে আসুন আপনারা। হ্যাঁ, এই যে—এটাই শেষ কুয়ো, যেখানে বিশ্বাসঘাতিনী নাকিসা বেগমকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন বাহাদুর শাহ্। না, না, পুরো ইতিহাস আমি কী করে জানব? সবই আমাদের শোনা কথা। লোকমুখে যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে। আর, এই যে বিশাল পাথরে বাঁধানো উঠোনটা দেখছেন, এখানেই বিকেলে বেড়াতেন বেগমরা। যাতে বাইরের কেউ তাদের দেখতে না-পায়, সেইজন্যে চারধারে রয়েছে পনেরো ফুট উঁচু পাথরের পাঁচিল। কী বলছেন, হারেম? উঁহু, এটাকে আপনারা দুর্গও বলতে পারেন, আবার কঠিনষ্ঠির কারখানাও বলতে পারেন। ব্যস, এ-ই সব—আর দেখানোর কিছু নেই। কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে বলুন। নেই? তা হলে আপনারা এবার আস্তে-আস্তে ফিরে যান। যান, যান, কোনও ভয় নেই; যে-পথ দিয়ে এসেছেন, সেই পথ ধরেই ফিরে যান। এটা তো আর নবাব-বাদশাদের 'ভুলভুলাইয়া' নয়, বেরোতে কোনও অসুবিধেই হবে না—।

এ কী, স্যার, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে? কী বলছেন, আমি সবকিছু আপনাদের দেখাইনি? তাই কি কখনও হয়? এই দেখানোটাই যে আমার চাকরি! আপনারা যদি স্যাটিসফাইড না হন, তা হলে কালই মিস্টার সেনগুপ্ত আমার চাকরি খেয়ে দেবেন। এ-দুর্গের দেখাশোনার ভার ওঁর ওপরেই আছে কিনা। কুয়ো? কুয়োটা তো আপনারা দেখলেন, ওই তো! কী বলছেন? ওটা নয়? অন্য আর-একটা কুয়ো? যেখানে—যেখানে তিতু সরকার, মানে তিতির সরকার নামে কচি মেয়েটা আত্মহত্যা করেছিল?

শ-শ-শ-শ! আস্তে, স্যার, আস্তে বলুন! দেখছেন তো, এখনও জনাকয়েক ট্যুরিস্ট ওপাশটায় ঘোরাফেরা করছে। তা ছাড়া, মিস্টার সেনগুপ্ত যদি একবার এসব কথা শুনতে পান, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। তিনি চান না, দশবছর আগেকার ওই ঘটনা নিয়ে কেউ আর কোনওরকম ঘাঁটাঘাঁটি করুক।

হ্যাঁ, কুয়োটা আমি চিনি। কিন্তু ওই যে বললাম, মিস্টার সেনগুপ্তের বারণ আছে। না, স্যার, তা আমি পারি না। তা হলে আমার চাকরিটাই চলে যাবে।...আচ্ছা, আপনি যখন এত করে বলছেন—তা ছাড়া আপনার কাছ থেকে বকশিশ নেওয়ার পর তো আর আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারি না! কুয়োটা আপনি সত্যিই দেখতে চান? কিন্তু

হঠাৎ এ-কুয়ো দেখার সাধ হল কেন বলুন তো? ও, মেয়েটা মারা যাওয়ার পর যে-সব রিপোর্টার এসেছিল, আপনি তাদের মধ্যে ছিলেন? তাই বলুন! কী যেন নাম বললেন মেয়েটার, তিতির সরকার?

না, তখন এ-চাকরি আমি করতাম না। কিন্তু আর-সবাইয়ের মতো খবরের কাগজগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছিলাম। তা হলে স্যার আপনি একমিনিট অপেক্ষা করুন, আমি অন্য ট্যুরিস্টদের বেরোনোর রাস্তাটা দেখিয়ে দিই। তা ছাড়া পাঁচটা প্রায় বাজে, বন্ধ করার সময়ও হয়ে গেছে ...।

নিন, এবার বলুন—এখন আর কোনও ভয় নেই। ওঃ, সারাটা দিন যা ধকল গেছে! শেষ দলটাকে বের করে দিয়ে এবার নিশ্চিন্তি! না, আর কেউ এখানে আসবে না। বাইরের জং ধরা ভারি দরজাটায় আমি খিল এঁটে দিয়ে এসেছি। না, না, বাইরের কোনও শব্দই এখানে শোনা যায় না, আর সেইজন্যেই আমাদের কথাও বাইরের কোনও প্রাণীর কানে যাবে না—অবশ্য নিশাচর প্যাঁচাদের কথা আলাদা। এই অন্ধকার ঠাসা দুর্গেই ওদের রাজত্ব। তা ছাড়া সন্ধেও তো হয়ে এল।

আপনি ওই কুয়োটা তা হলে দেখতে চান? যেখানে তিতির সরকার নামে মেয়েটা ডুবে মারা গিয়েছিল? কিন্তু কাজটা করা আমার ঠিক হচ্ছে না। মিস্টার সেনগুপ্ত যদি একবার জানতে পারেন, তা হলে ভীষণ রেগে যাবেন। না, আপনি ঠিকই বলেছেন, তাঁকে জানানোরই-বা দরকার কী? হাঃ-হাঃ-হাঃ...।

আসুন, স্যার, এদিক দিয়ে আসুন। এই বড় হলঘরটা পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে। আমাকে আপনার পেছন-পেছন আসতে বলছেন? আমার কিন্তু অবাক লাগছে, না বলতেই ঠিক রাস্তাটা আপনি চিনলেন কী করে! দেখবেন, সাবধান, এখানকার পাথুরে মেঝেটা ভীষণ এবড়োখেবড়ো।

দশবছর আগেকার ওই ইতিহাস নিয়ে কেউ আবার নতুন করে চর্চা করুক, সেটা মিস্টার সেনগুপ্ত পছন্দ করেন না। কেন জানেন? কারণ, ওই ঘটনা ওঁর মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। মিস্টার সেনগুপ্তকেই গ্রামের লোকেরা তিতির সরকারের লাভার বলে সন্দেহ করেছিল। ওই লাভারই মেয়েটাকে ধীরে-ধীরে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর দিকে। সন্দেহ করার কারণও অবশ্য ছিল। মানে মেয়েটা ছিল মিস্টার সেনগুপ্তের কারখানার ফোরম্যানের বউ। ওরা ওঁর বাড়ির কাছাকাছিই থাকত। ফলে সরকারদের সঙ্গে ওঁর বেশ মেলামেশা ছিল। আর চুপিচুপি বলি স্যার, তিতির সরকারকেও সেনগুপ্তসাহেবের মনে ধরেছিল। বলতে গেলে তিনি ওদের পরিবারেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে মেয়েটা ওভাবে মারা যাওয়ার পর ওঁকেই যে লোকে সন্দেহ করবে এ আর বেশি কথা কী! উনি যদি একবার জানতে পারতেন কারা ওঁর নামে এইসব বাজে কথা রটাচ্ছে, তা হলে আর দেখতে হত না—তাদের কোর্ট পর্যন্ত দৌড় করিয়ে ছাড়তেন। একবছর ধরে তো ওঁর সংসারে অশান্তি লেগে ছিল। বউয়ের

সঙ্গে দিনরাত উনি ঝগড়া করে গেছেন। বারবার বলেছেন, ওঁর কোনও দোষ নেই। আমরা ভেবেছিলাম, মিসেস বোধহয় ওঁকে ছেড়েই চলে যাবেন...যাক সে-কথা, এখন ওঁরা বেশ সুখে আছেন, তা ছাড়া দশবছর সময়টাও তো নেহাত কম নয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এখন যদি আবার সেই পুরোনো কাসুন্দি নিয়ে জিভ চালাচালি হয়, তা হলে আমার অবস্থাটা কী হবে! না স্যার, আপনার কথা আমি বলছি না, আপনি সেরকম লোকই নন। তাই যদি ভাবতাম, তা হলে আপনাকে এত সব কথা বলতামও না, আর ওই কুয়োটাও দেখাতাম না।

লোকে বলে, মেয়েটা নাকি আশ্চর্যরকম সুন্দরী ছিল। বয়েসও ছিল খুব কম—মাত্র একুশ। গায়ের রং ছিল যেন দুধে-আলতা। লোকে বলে, খবরের কাগজে মেয়েটার যে-ছবি ছাপা হয়েছিল, তার চেয়ে অন্তত একশো গুণ সুন্দরী ছিল ও। চোখ ছিল কালো হিরের মতো উজ্জ্বল, চকচকে। কী বলছেন, কালো নয়? একটু কটা চোখ? কী জানি, হবে হয়তো। কারণ সবই আমার শোনা কথা, আর আপনি নিজে তো রিপোর্টার হিসেবে স্পটে হাজির ছিলেন। দেখবেন, সিঁড়ির শেষ ধাপটা খেয়াল রাখবেন—ওটা খানিকটা ভাঙা আছে। কিন্তু...কটা চোখ বলছেন? না, স্যার, এ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। শুধু ভাবছি আপনার কী স্মৃতিশক্তি!

যাকগে, মোটের ওপর মেয়েটা ছিল অল্পবয়েসি, অসম্ভবরকম সুন্দরী, নিষ্পাপ, আর কিছুটা সরল প্রকৃতির—সাধারণত গ্রামের মেয়েরা যা হয়ে থাকে। ওর বাবা মিস্টার সেনগুপ্তের বাগানেই মালির কাজ করত। আপনি হয়তো ওকে কখনও দেখেননি। না, না, খবরের কাগজওলাদের দেওয়ার মতো নতুন কোনও খবর ওর কাছে ছিল না। তবে লোকটা ভীষণ ধাক্কা খেয়েছিল। তারপরই তো ওর স্ট্রোক মতন হল। তখন মিস্টার সেনগুপ্ত ওকে টাকাকড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা চাকরিতে লাগিয়ে দেন। তারপর...দেখবেন, চৌকাঠে হোঁচট খাবেন না যেন। এইখান থেকেই শুরু হল অন্দরমহল। একটু দাঁড়ান, হ্যারিকেনটা জ্বেলে নিই। মাঝে-মাঝে সন্ধের পর আমি এদিকটায় আসি, তাই একটা হ্যারিকেন সবসময়েই এই দরজার পাশটায় রাখা থাকে। কী বললেন? কেন আসি? হুঁঃ—সে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন! কেমন যেন নেশার মতো হয়ে গেছে।...দেশলাই আছে আপনার কাছে? আমারটা দেখছি একেবারে খালি! হ্যাঁ, এই—ই—বাস! নিন, এবার চলুন—।

আরে, ভয় পেলেন নাকি? হ্যাঁ, তা ভয় পাওয়ারই কথা। যেভাবে মূর্তিটা বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখে একেবারে জীবন্ত বলে মনে হয়। বর্শার ফলাটা দেখেছেন? একটু বাঁকানো। কেমন যেন অদ্ভুতরকমের, তাই না? কেন বানানো হয়েছিল মূর্তিটা? কী করে জানব বলুন! সবই রাজা-বাদশাদের খেয়াল। তবে মনে হয়, অন্দরমহলে যাদের ঢোকার হুকুম নেই, তাদের সাবধান করে দেওয়ার জন্যেই এটাকে তৈরি করা হয়েছিল। তা যে জন্যেই তৈরি হয়ে থাকুক, বাচ্চারা কিন্তু এটা দেখে ভীষণ মজা পায়। সত্যি কথা বলতে কী, যখন সব ট্যুরিস্টদের ফোর্ট দেখানো শেষ করে আমি সন্ধের পর জায়গাটা

টহল দিতে বেরোই, তখন এই বাঁকানো ফলার বর্শাটা আমার সঙ্গে নিই। ওটাকে আমার কেমন বন্ধু বলে ভাবতে ভালো লাগে। এক হাতে হ্যারিকেন, এক হাতে বর্শা নিয়ে যখন মহল থেকে মহলে ঘুরে বেড়াই, তখন আমার নিজেকেই ১৭০০ সালের প্রেত বলে মনে হয়। অন্ধকারে এই জায়গাটা যেন ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, স্যার, তা হলে বর্শাটা আমি সঙ্গে নিচ্ছি। দেখেছেন তো, এতদিনের জিনিস হলেও এখনও কেমন ঝকঝক করছে! আসলে আমিই এটাকে শান দিয়ে পালিশ করে নতুনের মতো করে রেখেছি—এইজন্যেই মূর্তিটার টান বাচ্চাদের কাছে অনেক বেড়ে গেছে।

...হ্যাঁ, এটাই সেই অভিশপ্ত কুয়ো। সেই ঘটনার পরই এই লোহার ঢাকনাটা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার নিশ্চয়ই ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে করছে? কী বলছেন, আমার আপত্তি না থাকলে? না, না, আমার আবার আপত্তি কীসের! দেখানোটাই যে আমার কাজ। ওই তো, ঢাকনার মধ্যিখানে যে-আংটাটা লাগানো রয়েছে, এই বর্শার হাতলটা ওর ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় দিলে ঢাকনাটা সহজেই খুলে যাবে। তা ছাড়া এটা খোলা আমার অভ্যেস আছে...এই নিন, এবার দেখুন...।

দেখছেন, কুয়োর ভেতরের গা বেয়ে জং ধরা লোহার সিঁড়ি কেমন খাড়া নেমে গেছে? আগেকার দিনে এইরকম সিঁড়ি খুব ব্যবহার করা হত।...এই সিঁড়ি বেয়েই তো ভেতরে নেমে গিয়েছিল তিতিরের স্বামী। তুলে এনেছিল কচি বউয়ের ডেডবডি। ভাবা যায় না, তাই না? কিন্তু লোকটা বুঝতে পেরেছিল, ওর জন্যেই ওর বউ সুইসাইড করেছে। সেইজন্যেই হয়তো ওইরকম সাহসের কাজ করতে পেরেছিল।

তিতিরের স্বামীর খবর জিগ্যেস করছেন? কেন, শোনেননি আপনি? ওই ঘটনার পর সে পাগল হয়ে যায়। তখন তাকে পাঠানো হয় পাগলা-গারদে। এখনও সে সেইখানেই খাঁচায় বসে আছে।

যদ্দুর আমি শুনেছি, মেয়েটা অনেকদিন ধরেই স্বামীর আড়ালে ওইসব লটরপটর চালিয়ে যাচ্ছিল—বুঝতেই তো পারছেন...। তারপর একদিন যখন মেয়েটা বুঝল, ওর পেটে বাচ্চা এসেছে, তখন ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। এত খোলামেলা ভালোবাসার জন্যে নিজেকেই শাপশাপান্ত করতে লাগল। তখন একদিন ও গেল ওর ভালোবাসার লোকের কাছে; জানতে চাইল, এখন ও কী করবে—।

এবং লোকটা ওকে বোকার মতো কথা বলতে বারণ করল। বলল, এর মধ্যে করাকরির কী আছে? ওর তো জলজ্যান্ত স্বামীদেবতা রয়েছে একটা; তা হলে আবার ভয় কীসের! শুধু ওকে যা করতে হবে, তা হল মুখে কুলুপ এঁটে চুপচাপ বসে থাকা। ব্যস!

কিন্তু সে বুঝল, তার প্রস্তাবটা তিতিরের পছন্দ হয়নি। নিজের স্বামীকে ঠকিয়ে বাচ্চার দায় তার ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা ওর মোটেই ভালো লাগছে না। তিতির চেয়েছিল, সেই বিপদের সময় সে এসে ওর পাশে দাঁড়াক; চেয়েছিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে;

চেয়েছিল, নিজের স্বামীকে আবার আগের মতো ফিরে পেতে। কারণ, আমার মনে হয়, মেয়েটা ওর স্বামীকে সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত; শুধু ওই লোকটার চটকের কাছে ওর ভালো-মন্দ জ্ঞান কদিনের জন্যে গুলিয়ে গিয়েছিল...।

যাকগে, সে-কথা থাক, আসল কথায় ফিরে আসি। তারপর সেই নাভার ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। বলল, কিছুদিন তাকে ভাবার সময় দেওয়া হোক। তারপর তারা এ নিয়ে আবার আলোচনা করবে; দেখবে, কী করা যায়। এবং পরদিন তিতিরকে রেখে সে গ্রাম ছেড়ে সটকে পড়ল—জানি না কোথায়।

না, স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি তো তখন এখানে ছিলাম না, তাই সব কিছু ঠিক-ঠিক জানাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু কল্পনার রং মিশিয়ে গল্পটা আপনাকে বলছিলাম। হয়তো আসলে ঘটনাটাই ছিল অন্যরকম। না, আপনার কথামতন, মিস্টার সেনগুপ্তই যদি সেই লোক হন, তা হলে তিনি পালাননি—গ্রামেই ছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে যথারীতি জঘন্য কাদা ছোড়াছুড়িও হয়েছিল। কিন্তু এখন শুধু আমি নয়, গ্রামের আরও অনেক লোকের ধারণা, মিস্টার সেনগুপ্ত হয়তো সত্যিই নির্দোষ ছিলেন।

যাই হোক, মেয়েটা ওর স্বামীর কাছে গিয়ে সরাসরি সব ঘটনা খুলে বলল—শুধু তার নামটুকু ছাড়া—সে-নাম ও কাউকেই বলেনি। সব শুনে সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তা হওয়ারই কথা; কারণ, লোকে বলে, সে নাকি বউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করত, ভীষণ ভালোবাসত ওকে। শুনেছি, তিতিরকে ওই ঘটনার জন্যে সে কোনওরকম বকাঝকা করেনি। শুধু শান্ত নির্বাকভাবে মেয়েটার অবাক চোখের সামনে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। এবং যখন জলভরা চোখ নিয়ে মেয়েটা তাকে অনুসরণ করল, পা জড়িয়ে ধরল, তখন সে আর সইতে পারেনি—ঘুরে দাঁড়িয়ে এক চড় মেরেছিল বউয়ের গালে। নিজের কষ্ট-পাওয়া মনের অবস্থাটা সে আর চাপতে পারেনি। বলেছিল, শেষ পর্যন্ত এই আমার পাওনা ছিল?

হ্যাঁ, স্যার, আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না। আমি একটু সিনেমা-টিনেমা দেখতে ভালোবাসি। নইলে বানিয়ে-বানিয়ে ছবির মতো সব বলছি কী করে! আপনি তো জানেন, গাইডদের একটু-আধটু গল্প বানানোর ক্ষমতা না-থাকলে চলে না। তা ছাড়া, আপনি যদি আমার মতো দিনের-পর-দিন, একা, এই নির্জন নিঝুম দুর্গে ঘুরে বেড়াতেন, তা হলে আপনিও সমস্ত কিছু ছবির মতো দেখতে পেতেন। জানেন, মাঝে-মাঝে রাতের দিকে আমি ওদের স্পষ্ট দেখতে পাই! হয়তো আমার মনের ভুল। আর কিছু না হোক, বয়েস তো হয়েছে।

জানেন, আমার মনে হয়, এটুকুও সেই অবুঝ মেয়েটার বোঝার ক্ষমতা ছিল না যে, কত দুঃখে, কত হতাশায়, ওর স্বামী ওর গায়ে হাত তুলেছে। ও ভাবল, এই বোধহয় ওদের সম্পর্কের শেষ। আর সে যদি ওকে ছেড়ে চলে যায়, তা হলে জীবনে আর রইল কী! তাই তিতির পারল না অপেক্ষা করতে, পারল না সে আঘাত সইতে, পারল না আশায় বুক বাঁধতে। ও দিশেহারা হয়ে ছুটে এল এই পোড়ো দুর্গে...বুক-ভরা কান্না

নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়োর ভেতরে।

তারপর মাত্র পাঁচমিনিট—তার বেশি নয়। সে ফিরে এল ছুটতে-ছুটতে। পাগলের মতো ডাকতে লাগল বউয়ের নাম ধরে—কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। যখন সে ওকে কুয়োর ভেতর থেকে তুলে আনল, তখন ও মারা গেছে। ওর একরাশ কালো চুল ভিজে লেপটে রয়েছে মুখের ওপর, সুন্দর উজ্জ্বল কটা চোখজোড়ায় জমে রয়েছে কাদা। তিতিরের বডিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ওর স্বামী কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

...ঠিক এইখানটায়, যেখানে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তারপর থেকেই এই ভারি লোহার ঢাকনাটা লাগিয়ে দেওয়া হল কুয়োর মুখে। যাতে সহজে কেউ এটাকে খুলতে না-পারে—শুধু আমি ছাড়া।

কেউ জানে না, এ-কুয়ো কত গভীর। দাঁড়ান, আলোটা আর-একটু তুলে ধরি। নিন, এবার ভালো করে দেখুন। সহ্যের শেষ সীমায় না-পৌঁছলে কোনও মেয়ে কখনও এভাবে প্রাণ দিতে পারে? আপনিই বলুন?

(তিতু—আমার তিতু, সোনামণি, তুই কোথায়?)

না, স্যার, আমি তো কিছু বলিনি। বরং আমার মনে হল, আপনি বোধহয় কিছু বলতে চাইছেন। দাঁড়ান, একমিনিট...।

কী করছি জিগ্যেস করছেন? চাবিটা ঘুরিয়ে দেখছি, তালাটা ঠিকমতো কাজ করছে কি না। এখন তো সব মহলের দরজাতেই চাবি লাগাতে হবে, তাই একবার দেখে নিলাম, যাতে পরে ভুল না-হয়। জানেনই তো, মিস্টার সেনগুপ্ত এই ঘরটা সবসময় বন্ধ করে রাখারই পক্ষপাতী। গত তিনবছরে এ-ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ কখনও আসেনি—অন্তত আজ রাতের আগে। আর আমার মনে হয়, আগামী তিনবছরেও এ-ঘরে কেউ আসবে না; আর যদিও-বা আসে, কুয়োর ঢাকনাটা নিশ্চয়ই কেউ খুলে দেখবে না, কী বলেন? এই সমস্ত মহলের দেখাশোনা আমি নিজেই করি। এ ছাড়া সবকিছু ঝকঝকে তকতকে রাখতে আমি ভীষণ ভালোবাসি—দেখুন না, এই বর্শাটাই দেখুন! কেমন নতুনের মতো ঝকঝক করছে! ফলাটা দেখেছেন, কীরকম ধারালো!

ওঃ, কিছু মনে করবেন না, স্যার, আপনার লাগল নাকি?

পাগল বলছেন, স্যার? না, স্যার, আমি পাগল নই। পাগল তো ছিল তিতিরের স্বামী, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? সে তো এখন বন্দি রয়েছে পাগলা-গারদে। আমার শুধু সামান্য স্ট্রোকমতন হয়েছিল—তাও বছরদশেক আগে। তাতে আমার শরীরের তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। মিস্টার সেনগুপ্ত কিছু টাকা দিয়ে আমাকে হালকা কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু এখনও আমার গায়ের জোর দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সেইজন্যেই বলছি, আমি হলে এই মুহূর্তে এই বর্শাকে ঠেকানোর কথা চিন্তাও করতাম না, স্যার। তাতে আপনার ভালোর চেয়ে খারাপই হবে।

জানেন, স্যার, বেশি জানাটাই অনেক সময় মানুষের বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। তিতু সরকার, তাই না? ওই নামটাই তো প্রথমে বলেছেন আপনি? কিন্তু, স্যার, আপনি কি

জানেন, মেয়েটার নাম ছিল সুবর্ণা সরকার। ওই নামটাই ছাপা হয়েছিল সব খবরের কাগজে। তিতির ছিল ওর ডাক নাম। তবে চেনাশোনা লোক আর রিলেটিভরা ওকে তিতির নামেই ডাকত। আর আমার কাছে, হয়তো ওর স্বামীর কাছে, হয়তো আরও একজনের কাছে ওর আদরের নাম ছিল তিতু। আর তা ছাড়া, আপনি কী করে জানলেন যে, ওর চোখ ছিল একটু কটা—কালো নয়? রিপোর্টাররা যখন এখানে আসে, তখন ওর চোখজোড়া বোজাই ছিল। কিন্তু ওর সেই ভালোবাসার লোক জানত।

হ্যাঁ, স্যার, এখন আমি আপনাকে বেশ চিনতে পারছি। সেই সময় আপনি মিস্টার সেনগুপ্তের কাছে প্রায়ই আসতেন—দরকার ছাড়াও আসতেন। হয়তো তিতুর জন্যেই আসতেন। তিতিরের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়া বাকি আছে। ওর স্বামী এখানে থাকলে ভালোই হত—তা হলে আসরটা বেশ জমত, হয়তো বেচারার পাগলামো কিছুটা সারত। যাক, সে যখন নেই, তখন মিছিমিছি তার কথা ভেবে লাভ কী! আসুন, এবার কাজের কথায় আসা যাক...।

ভাবতে অবাক লাগে, তাই না? ভালোভাবে চিন্তা করতে গেলে একে নিয়তির খেলা অথবা ঈশ্বরের লীলা ছাড়া আর কী-ই-বা বলবেন? কে জানত, আপনি এইভাবে, একা পায়ে হেঁটে এখানে আসবেন! এবং এই বর্শা আর চাবিটা আমি বাজি রাখতে পারি যে,—এ দুটো জিনিস আমার কাছে যে কত দামি, তা কি এখনও আপনাকে খুলে বলতে হবে, স্যার?—আপনি কোথায় যাচ্ছেন সে-কথা কাকপক্ষীকেও বলে আসেননি। অথচ এ-জায়গা ছেড়ে চলে যেতেও আপনি পারেননি। হয়তো তিতু আপনাকে দিনের-পর-দিন নিশির ডাকের মতো টেনেছে। আর আমার মনে হয়, আপনি বা আমি কেউই কোনওদিন বুঝতে পারব না, এখানে আসার পেছনে আপনার আসল কারণটা কী।

আপনি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, তিতুর বুড়ো বাপ আজ আটটা বছর ধরে শুধু আপনারই অপেক্ষা করেছে? সুতরাং, আমার বিশ্বাস, আমার ইচ্ছেই আজ আপনাকে টেনে নিয়ে এসেছে এই নরকের দরজায়...।

উঁহ, আমি হলে কিন্তু এরকম করে মোটেই চিৎকার করতাম না, স্যার। তাতে শুধু-শুধু আপনার শরীরেরই ক্ষতি হবে। কারণ জানেনই তো, এখানে আপনার চিৎকার শোনার লোক এক আমি ছাড়া আর কেউই নেই। আর আগেই তো আপনাকে বলেছি, এখানকার দেওয়ালগুলো ভীষণ মোটা। বিশ্বাস করুন, সত্যিকারের পাথরের তৈরি—একটুও বাড়িয়ে বলছি না...।

অর্ধেক পুরুষ

সুপ্রতিম একটা ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওর মন বলছিল, ফোনটা আসবে। যদিও স্টুডিয়োতে লাইন পাওয়া বেশ ঝকমারি, তবুও ওর মনে হচ্ছিল সেই মেয়েটি যেরকম নাছোড়বান্দা তাতে লাইন ও পাবেই।

সন্ধে ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা—এই আধঘণ্টা ধরে 'সাইবার চ্যানেল'-এর 'মুশকিল আসান' অনুষ্ঠান টিভিতে দেখানো হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সুপ্রতিম আর ওর অনুষ্ঠান-সঙ্গিনী মোনা। দর্শকদের নানান ধরনের সমস্যার সমাধান বাতলে দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। মাত্র চারমাসেই 'মুশকিল আসান' সকলের মন কেড়ে নিয়েছে।

দর্শকরা নানান প্রশ্ন পাঠান সুপ্রতিমদের কাছে। সুপ্রতিম আর মোনা পালা করে সেসবের উত্তর দেয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠান চলার সময় বহু ফোনও আসে ওদের স্টুডিয়োতে। কেউ-কেউ অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন, আর কেউ-বা নিজের কোনও সমস্যা তুলে ধরেন ওদের কাছে।

চিঠিপত্রের উত্তরগুলো 'সাইবার চ্যানেল'-এর অফিসে কয়েকজন বসে ঠিক করেন। সেখানে সুপ্রতিম আর মোনাও থাকে। তবে টেলিফোনে পাওয়া সমস্যাগুলোর সমাধান সুপ্রতিম বা মোনাকেই চটজলদি করে সঙ্গে-সঙ্গে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হয়। এর জন্য যে-বুদ্ধি এবং স্মার্টনেস দরকার, সেটা সুপ্রতিম আর মোনা দুজনেরই আছে।

সুপ্রতিমের চেহারা বেশ সুন্দর। ওর সৌন্দর্যে কীরকম যেন একটা বনেদি ঢং আছে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। ফরসা। স্বাস্থ্য মাঝারি। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। দাড়ি সুন্দর করে কামানো হলেও ফরসা গালে, থুতনিতে, নীলচে আভা থেকে গেছে। ঠোঁটের ওপরে কালো গোঁফ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। বয়েস পঁয়তিরিশ হলেও অনেক কম দেখায়।

সুপ্রতিম যত না সুন্দর তার চেয়েও অনেক সুন্দর করে কথা বলতে পারে। ওকে ঘিরে অনেক দর্শকেরই কৌতূহল—বিশেষ করে মেয়েদের। অনেকেই ওকে ভালোবাসা জানিয়ে চিঠি দেয়। আবার কেউ-কেউ ওকে নানান ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চায়। সেইসব প্রশ্নের পাশকাটানো মজার উত্তর দেয় সুপ্রতিম।

ওর ডান ভুরুর ওপরে একটা কাটা দাগ আছে। সেটা নিয়ে এক তরুণী জিগ্যেস করেছিল, 'আপনার ডান ভুরুর ওপরে ওই লাভলি কাটা দাগটা হল কেমন করে?'

সুপ্রতিম জবাব দিয়েছিল, 'ছোটবেলায় এভারেস্ট থেকে পড়ে গিয়ে।'

একজন কিশোরী চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, 'আপনার নামটা দারুণ। ভীষণ এক্সাইটিং।'

জবাবে সুপ্রতিম বলেছিল, 'মোটেই তা নয়। সুপ্রতিম মানে হচ্ছে ভালোর মতো—কিন্তু পুরোপুরি ভালো নয়।'

একজন পুরুষের কৌতূহল : 'আপনি কি বিয়ে করেছেন?'

সুপ্রতিমের উত্তর : 'করিনি বললে আমার ছ'ত্তন ওয়াইফ রেগে আগুন হয়ে যাবেন। আর বিয়ে করেছি বললে অনেক দর্শক দুঃখ পাবেন। তাই এই সাঙ্ঘাতিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।'

আসল ঘটনা হল সুপ্রতিম বিয়ে করেছে। স্ত্রী নয়নার সঙ্গে ওর পরিচয় সাত বছরের। তার মধ্যে প্রথম তিনবছর ওর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছে, আর বাকি চারবছর চুটিয়ে সংসার করেছে। এখনও করছে। সুপ্রতিম যা-কিছুই করে, সবসময় চুটিয়ে করতে চায়। তাই নিয়ে নয়নার সঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশ ঝামেলাও হয়।

নয়না দেখতে বেশ সুশ্রী, মিষ্টি মেয়ে। তবে সুপ্রতিমের চেহারার পাশে নিজের চেহারা নিয়ে সবসময় ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। সুযোগ পেলেই ওই প্রসঙ্গ তুলে ঠাট্টা করে। সুপ্রতিম রোজ যখন অফিসে রওনা হয়, নয়না তখন আকুল চোখে স্বামীকে দ্যাখে।

সুপ্রতিম অবাক হয়ে বলে, 'কী ব্যাপার! এমনভাবে তাকিয়ে আছ যেন এই প্রথম চার চোখের মিলন হল!'

নয়না ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় ওর দিকে, বলে, 'ইচ্ছে করছে, থুতু ছিটিয়ে কানের লতিতে কুট করে কামড়ে দিই।'

সুপ্রতিম ওর দিকে বাঁ-কান এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এই নাও, তাই দাও। পারলে কপালের পাশে একটা কাজলের টিপও বসিয়ে দাও।'

নয়না ওর কানটা কষে মুলে দিয়ে বলে, 'সাবধান! কারও দিকে বেশিক্ষণ তাকাবে না। কেউ যেন নজর না-দেয়। তা হলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।'

'টিভির মধ্যে দিয়ে কারও দিকে তাকানো যায়! তবে মোনা তো পাশে থাকে, ওর দিকে না-তাকিয়ে উপায় নেই...।'

'মোনা খুব ভালো মেয়ে। বরং তোমাকেই বিশ্বাস নেই।'

মোনার সঙ্গে নয়নার পরিচয় আছে। মোনা অনেকবার সুপ্রতিমের বাড়িতে এসেছে। দরকারে-অদরকারে প্রায়ই ফোন করে। নয়না ওকে খুব পছন্দও করে।

মোনা এলাহাবাদের চৌকস মেয়ে। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। সুন্দর, স্মার্ট। কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুলে সামান্য লালচে ভাব। টানা-টানা চোখ। শুধু ওর বাংলায় সামান্য টান আছে।

ও সুপ্রতিমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। ওর কাছ থেকে প্রতিমুহূর্তেই শেখার চেষ্টা করে। কথায়-কথায় বলে, 'সুপ্রতিমদা, য়ু আর সিম্প্‌লি লাজবাব। আপনি "সাইবার চ্যানেল"-এর অ্যাসেট।'

'মুশকিল আসান' অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে সুপ্রতিমের দারুণ লাগে। অনুষ্ঠানের কিছুটা অংশ আগে রেকর্ড করা হয়। আর খানিকটা লাইভ। দর্শকদের নানান ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য নামী-দামি ডাক্তার-উকিল-জ্যোতিষী ইত্যাদি নানান পেশার মানুষ পালা করে এই অনুষ্ঠানে আসেন। অনেক সময় বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়ারদেরও নিয়ে আসা হয় বিশেষ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। তবে সবশেষে থাকে মজাদার

প্রশ্ন-উত্তরের পালা। তখন সুপ্রতিম আর মোনা যেন আরও স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

সব মিলিয়ে 'মুশকিল আসান' একেবারে সুপারহিট।

দিনকুড়ি আগে একটা খাম এসে পৌঁছয় সুপ্রতিমদের দপ্তরে। খাম খুলেই সুপ্রতিম দ্যাখে ভেতরে একটা টাটকা লাল গোলাপ, আর একটা চিঠি। খামের ওপরে কোনও ডাকটিকিট ছিল না। বোধহয় কেউ কুরিয়ারে পাঠিয়েছে।

চিঠিটা পড়েই সুপ্রতিমের কেমন অস্বস্তি হল।

প্রিয় সুপ্রতিম,

তোমাদের অনুষ্ঠান আমি সবসময় দেখি। খুব ভালো লাগে। তবে তার চেয়েও ভালো লাগে তোমাকে। শুধু তোমাকে দেখার জন্যেই অনুষ্ঠানটা প্রাণভরে দেখতে হয়। অনুষ্ঠানগুলো আমি সবসময় ভিডিয়ো ক্যাসেটে ধরে রাখি। তারপর যখনই মনখারাপ লাগে, তখনই ওগুলো চালিয়ে তোমাকে দেখি। তোমার সব সুন্দর—নাক, মুখ, চোখ, ঠোঁট, এমনকী ভুরুর কাটা দাগটাও। জানো, তোমার ওই কাটা দাগটা নকল করে আমি আমার বুকের বাঁ-দিকে একটা কাটা দাগ এঁকেছি! তোমার প্রতিটি অঙ্গের জন্যে আমার প্রতিটি অঙ্গ সবসময় কাঁদে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছে করে। কিন্তু অনুষ্ঠান চলার সময় কিছুতেই স্টুডিয়োর ফোনের লাইন পাই না। তাই বলে চেষ্টা ছাড়িনি। আবার চিঠি দেব। সঙ্গে যে-গোলাপটা পাঠালাম, সেটার কথা টিভিতে বলবে তো! বললে বুঝব আমার ভালোবাসা তুমি ফিরিয়ে দাওনি। অসংখ্য ভালোবাসা নিয়ো—

ঝুমুর চৌধুরী
কলকাতা-১৪

'সাইবার চ্যানেল'-এর দপ্তরে প্রচুর 'প্রেমপত্র' আসে। তাতে মোনার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করতে চাওয়া চিঠিই বেশি, সুপ্রতিমের কম। মোনাকে বিয়ে করতে চেয়েও বেশ কয়েকজন 'সুপাত্রের' চিঠি এসেছে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে ওরা কেউই তেমন একটা মাথা ঘামায়নি। কারণ, এ-ধরনের স্পনসরড প্রোগ্রামে এসব উৎপাত খুবই মামুলি ব্যাপার। কিন্তু এই চিঠিটা যেন ঠিক মামুলি নয়। কেমন যেন একটু অন্যরকম।

মোনা চিঠিটা নিয়ে সুপ্রতিমের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করে পিছনে লেগেছিল। কিন্তু সুপ্রতিম পুরোপুরি সহজ হতে পারেনি। দু-একদিন চিন্তা করার পর ও মোনার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিঠিটার একটা নির্দোষ উত্তর দিয়ে দেবে।

সাধারণত অফিসের সমস্যা বাড়িতে খুব একটা আলোচনা করে না সুপ্রতিম। কিন্তু কুমুর চৌধুরীর চিঠিটার কথা বলল।

নয়না সেটাকে কোনও গুরুত্বই দিল না। বলল, 'ওর আর কী দোষ বলো! টিভিতে অমন হেসে-হেসে সুন্দর-সুন্দর করে কথা বলবে, আর প্রেমপত্র আসবে না—এ তো হতে পারে না! তুমি বরং বেচারিকে একটা সান্ত্বনাপত্র লিখে দিয়ো। আর শোনো, তোমাকে একটা গুড নিউজ দেব। আমি একটা বই লিখতে শুরু করেছি। নাম দিয়েছি "সুন্দর সোয়ামীর সমস্যা"—।'

'ঠাট্টা কোরো না, নয়না।' কপালে ভাঁজ ফেলে বলেছে সুপ্রতিম, 'চিঠিটার মধ্যে একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে।'

নয়না একটা হাতব্যাগে সুতোর নকশা বুনছিল, সিরিয়াস হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। খামের মধ্যে ফুল পাঠানো, ভুরুর ওই কাটা দাগ নকল করা...। তুমি বরং একটা মামুলি উত্তর দিয়ে দিয়ো। উত্তর না-দিলে আবার যদি কিছু হয়...।'

পরের 'মুশকিল আসান' অনুষ্ঠানে উত্তর দিয়েছিল সুপ্রতিম।

'কলকাতা চোদ্দো থেকে গোলাপফুল পাঠিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে ভালোবাসা জানিয়েছেন কুমুর চৌধুরী। তাঁকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই। আর আপনারা, যাঁরা এখন এই অনুষ্ঠান দেখছেন, আপনাদের জানাই—আপনারা যত খুশি প্রেমপত্র পাঠান, তবে মনে রাখবেন, সেগুলো যেন শুধু এই অনুষ্ঠানের নামেই হয়। আমার বা মোনার নামে নয়। কারণ, আমাদের জীবনে প্রচুর প্রেম আছে। আর বাড়তি প্রেম আমরা চাই না।' হেসে মোনার দিকে তাকিয়ে সুপ্রতিম জিগ্যেস করেছে, 'কী বলো, মোনা।'

'ঠিকই বলেছেন, সুপ্রতিমদা—এই অনুষ্ঠানের জন্যেই প্রেমপত্র দরকার। আর সেইসঙ্গে সমালোচনা। কারণ, এই অনুষ্ঠানকে আমরা আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চাই। আমরা চাই, এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক আপনাদের আরও-আরও প্রিয়।'

এই উত্তর কুমুর চৌধুরীকে যে খুশি করতে পারেনি, বরং ব্যথা দিয়েছে, সেটা বোঝা গেল ওর পরের চিঠিতে।

প্রিয় সুপ্রতিম,

কিছু দিতেই যদি চাও, তা হলে দুঃখ দাও কেন! তোমার এড়িয়ে যাওয়া উত্তরে খুব দুঃখ পেয়েছি আমি। সারাদিন, সারারাত শুয়ে-শুয়ে কেঁদেছি। তোমাদের অনুষ্ঠানকে ভালোবেসে আমি গোলাপ পাঠাইনি, তোমাকে ভালোবেসে পাঠিয়েছি। তুমি বলেছ তোমার জীবনে প্রচুর প্রেম আছে, বাড়তি প্রেম তুমি চাও না। তোমার মতো সুপুরুষ দেবতাকে অনেকেই যে ভালোবাসবে, সে তো স্বাভাবিক! তাই এ-কথায় দুঃখ পাইনি। তবে তুমি জেনে রাখো, আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি। আমার বুকের কাটা দাগটায়

আমি যখন আঙুল বোলাই তখন বুকের ভেতরটা কেমন শিরশির করে ওঠে। মনে হয় যেন আমি তোমার ভুরুতে আলতো করে আঙুলের ছোঁওয়া এঁকে দিচ্ছি। তোমাদের স্টুডিয়োর লাইনটা কবে পাব বলতে পারো! সবসময় খালি এনগেজ্‌ড্‌! ভাবছি, এবার থেকে বাড়ির ফোনেই তোমাকে ধরার চেষ্টা করব। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে তোমার নাম্বারটা পাব তো! বাড়িতে ফোন করলে তুমি কি রাগ করবে? আমি জানি, তুমি রাগ করবে না—বরং খুশিই হবে। তারপর...একদিন...যখন আমাদের দেখা হবে...ওঃ! আমি আর ভাবতে পারছি না। বিশ্বাস করো সুপ্রতিম, তোমাকে না-পেলে আমি বাঁচব না—তুমিও না। আজ শেষ করছি। অসংখ্য ভালোবাসা নিয়ো—

তোমার, শুধু তোমার
ঝুমুর

চিঠিটা পড়ার পর সুপ্রতিম কিছুক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে বসে রইল। ঝুমুরকে ঘিরে এলোমেলো চিন্তা ছুটোছুটি করতে লাগল ওর মাথার ভেতরে। মেয়েটি কেমন যেন অস্বাভাবিকরকম নাছোড়বান্দা। তা ছাড়া চিঠির কোনও-কোনও জায়গায় কি পাগলামির লক্ষণ ফুটে বেরোচ্ছে? নইলে সুস্থ কোনও মেয়ে হলে প্রথম চিঠির এড়িয়ে যাওয়া উত্তরেই তো সব বুঝতে পারত, আর তার ভালোবাসার অসুখটাও সেরে যেত।

ঝুমুর বাড়িতে ফোন করতে পারে ভেবে সুপ্রতিম একটু ভয়ও পেল। যদি ও সত্যিই পাগল এবং নাছোড়বান্দা হয় তা হলে তো ফোন করে-করে জ্বালিয়ে মারবে। তখন হয়তো পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। আর পুলিশে খবর দিলেই তো যত ঝামেলা। বাজে পাবলিসিটি।

আচ্ছা, ও যদি টেলিফোন ডিরেক্টরিতে সুপ্রতিমের ঠিকানা জেনে বাড়িতে এসে হাজির হয়! তা হলে তো আবার সেই থানা-পুলিশ!

প্রায় দু-দিন নানান দুশ্চিন্তার পর সুপ্রতিমের আশঙ্কা ধীরে-ধীরে কেটে গিয়েছিল। ও নয়নাকে বলে রাখল ঝুমুর চৌধুরী নামের কেউ ফোন করলে নয়না যেন বলে দেয় সুপ্রতিম বাড়ি নেই।

পরের দু-দিনে তিনবার ঝুমুরের ফোন এল। তার মধ্যে দুবার সুপ্রতিম সত্যিই বাড়ি ছিল না। আর একবার নয়না আড়চোখে সুপ্রতিমের দিকে তাকিয়ে ফোনে বলে দিল, 'উনি তো এখন বাড়ি নেই।'

'কখন ওঁকে পাওয়া যাবে বলুন তো?'

'ওঁর তো ফিরতে-ফিরতে রাত এগারোটা মতন হবে। আপনি বরং প্রোগ্রাম চলার সময় স্টুডিয়োতে ট্রাই করে দেখুন—।'

'ঠিক আছে। স্টুডিয়োতেই ট্রাই করব।' রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল ঝুমুর।

নয়না সুপ্রতিমের দিকে ফিরে বলল, 'মেয়েটার গলাটা কেমন যেন পিকিউলিয়ার।'

'পিকিউলিয়ার মানে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছে সুপ্রতিম।

'কেমন যেন আদুরে, খসখসে।'

হো-হো করে হেসে উঠেছে সুপ্রতিম। হাসতে-হাসতেই বলেছে, 'আদুরে! খসখসে! মাই গুডনেস! কী বিচিত্র অ্যাডজেক্টিভ! তুমি সেলাই ছেড়ে সাহিত্য করলে পারতে।'

একটু পরে হাসি থামিয়ে সুপ্রতিম সিরিয়াস ঢঙে জানতে চাইল, 'অ্যাই, মেয়েটার বয়েস কীরকম হবে বলো তো? আঠেরো-উনিশ? নাকি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ?'

'ঠিক বোঝা গেল না। সাতাশ-আটাশ হবে বোধহয়।' ইতস্তত করে নয়না বলল।

তারপর থেকেই সুপ্রতিম কেমন এক অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। ঝুমুর চৌধুরীর ছবিটা ওর কাছে কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না। এ-ধরনের গায়ে-পড়া প্রেমিকাদের ও বহুবার সামাল দিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম ও যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না। প্রতিদিনই অনুষ্ঠান শুরু করার পর থেকেই ও স্টুডিয়োতে ঝুমুরের ফোনের জন্য ভয়ে-ভয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আজ ওর মন বলছে, ফোনটা আসবে। আজ ওদের স্টুডিয়োর ব্যস্ত লাইনে টুক করে ঢুকে পড়বে ঝুমুর।

এবং সুপ্রতিমের আশঙ্কাই সত্যি হল। ঝুমুর যে ফোনটা করেছে সেটা ফোনে সাড়া দেওয়ার পরই ও বুঝতে পারল।

'হ্যালো—"মুশকিল আসান"—।'

'সু-সুপ্রতিম! আমি গো...আমি বলছি...ঝুমুর...।'

নয়না ঠিকই বলেছিল। খসখসে আদুরে গলা। কেমন যেন ফিসফিসে সুরে কথা বলছে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পেশাদারি ঢঙে কথা বলল সুপ্রতিম, 'কাইন্ডলি আপনার পুরো নাম বলুন।'

ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর একটু ধাক্কা খেল : 'আমায়...আমায় চিনতে পারছ না! আমি ঝুমুর চৌধুরী। কলকাতা চোদ্দো থেকে বলছি। কত কষ্ট করে তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম।'

ওদের টেলিফোন-ব্যবস্থাটা এমন যে, সব কথাবার্তাই টিভির দর্শকরা শুনতে পান। সেইজন্যেই সুপ্রতিম বেশ বিব্রত হয়ে পড়ছিল। ও ভাবছিল, কন্ট্রোল প্যানেলের একটা সুইচ টিপে টেলিফোনের কথাবার্তা শোনানোর ব্যবস্থাটা অফ করে দেবে কি না। না কি রিসিভার নামিয়ে রেখে লাইন কেটে দেবে? কিন্তু পাগল মেয়েটা তো রোজ ফোন করার চেষ্টা করে জ্বালাতন করে মারবে!

এইসব ভাবতে-ভাবতেই সুপ্রতিম কষ্ট করে পেশাদারি হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে। তারপর ওর নিজস্ব ঢঙে জানতে চাইল, 'বলুন ম্যাডাম, কী আপনার সমস্যা? "মুশকিল আসান" নিশ্চয়ই তার সমাধান বাতলে দেবে।'

'আমার—আমার প্রয়োজন তুমি। আমি তোমার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখা করব। যখন—যখন আর কেউ থাকবে না। বাড়িতে তিনবার ফোন করেছিলাম...তোমাকে পাইনি। কে ফোন ধরেছিল? তোমার...তোমার ওয়াইফ?'

শেষ প্রশ্নটা পুরোপুরি শুনতে পাওয়ার আগেই কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ টিপে কথাবার্তা শোনানোর ব্যবস্থাটা বন্ধ করে দিল সুপ্রতিম। কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রাখল না। কুমুর চৌধুরী সম্পর্কে একটা কৌতূহল ওর মধ্যে মাথাচাড়া দিল।

'হ্যাঁ—আমার বউ—নয়না। ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি।' কথাটা বলার সময় আড়চোখে মেনার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল সুপ্রতিম। ওকে হাত নেড়ে ইশারা করল প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

'ওঃ! জানতাম!' বিরক্তি ফুটে উঠল কুমুরের গলায়। কিন্তু তারপরই ও কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল। খসখসে আদুরে গলার হাসি।

একটু পরে হাসি থামিয়ে চাপা গলায় বলল, 'কাউকে আমি পরোয়া করি না। কেন জানো? কারণ, আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি। কবে তোমার বাড়িতে যাব বলো?' শেষ প্রশ্নটায় যেন কোনও কিশোরীর মিনতি ঝরে পড়ল।

সুপ্রতিমের মন খুব দ্রুত চিন্তা করছিল।

মেয়েটি তো মনে হচ্ছে নিশ্চিত পাগল। ওর সঙ্গে দেখা করে সামনাসামনি বুঝিয়ে বললে কি ওর এই প্রেমের পাগলামি সারতে পারে? ওকে বলবে একবার বাড়িতে আসতে? কিন্তু নয়না যদি কিছু মাইন্ড করে!

প্রতি মঙ্গলবার সন্ধেবেলা নয়না কাছাকাছি একটা সেলাই-স্কুলে এমব্রয়ডারির কাজ শেখাতে যায়। ছ'টায় বেরোয়, দু-আড়াই ঘণ্টা পর ফেরে। ওর হাতের কাজ খুব ভালো। তা ছাড়া সূক্ষ্ম সেলাই নিয়ে সময় কাটাতে ওর বেশ লাগে। মঙ্গলবার সাড়ে ছ'টা-সাতটা নাগাদ তা হলে কুমুরকে আসতে বলবে সুপ্রতিম! তখন ফ্ল্যাট ফাঁকাই থাকবে। ঠিকে কাজের লোক বিমলামাসিও রোজ সন্ধেবেলা বাসন মেজে, ঘর মুছে ছ'টার মধ্যেই চলে যায়।

কিন্তু ফ্ল্যাটে ওকে একা পেয়ে মেয়েটা কোনও কাণ্ড বাধিয়ে বসবে না তো! দুর, কী আর করবে! সুপ্রতিম নিজে ঠিক থাকলে আর ভয় কীসের! কিন্তু মেয়েটার বয়েস কত? সতেরো, আঠেরো, কুড়ি হলে তো ইমোশনাল প্রবলেম হতে পারে।

সুপ্রতিম কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। ঠিকমতো আর ভাবতে পারছিল না।

'কবে যাব বলো?' খসখসে আদুরে গলায় আবার জানতে চাইল কুমুর।

'মঙ্গলবার সন্ধেবেলা। ঠিক সাতটায়।' সুপ্রতিমের মুখ দিয়ে কেমন যেন আলতোভাবে খসে পড়ল কথাগুলো।

'তোমাদের ফ্ল্যাটবাড়িটা আমি দেখে এসেছি। কাঁকুড়গাছিতে।' সামান্য হাসল কুমুর। একটু থেমে তারপর বলল, 'তোমার ফ্ল্যাটটা তো একতলায়...।'

পলকে ঘাম ফুটে উঠল সুপ্রতিমের কপালে। এর মধ্যেই ওর ঠিকানা বের করে বাড়িটা চিনে এসেছে মেয়েটা! মেয়েটাকে বাড়িতে ডেকে আবার কোনও বিপদ হবে না তো! তখন হয়তো সত্যি-সত্যিই থানা-পুলিশ করতে হবে। কিন্তু আর তো ফেরার পথ নেই! তীর ছিটকে গেছে হাত থেকে।

'মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় যাব। ঠিক...সাতটায়...। দেখা হওয়ার আগে আর তা হলে ফোন করব না।' একটু চুপচাপ। তারপর : 'আমাকে একপলক দেখলেই তুমি বুঝবে কেন আমার ভালোবাসা অন্যরকম।' চাপা গলায় কথাগুলো বলে অল্প হাসল ঝুমুর : 'আই লাভ য়ু, লাভ। তুমি অপেক্ষা কোরো। ঠিক সাতটায়...।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সুপ্রতিম। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে স্মার্ট ঢঙে হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে গেল। তা সত্ত্বেও সুপ্রতিম মোনার সঙ্গে কথা বলে অনুষ্ঠানে সহজভাবে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল।

'মোনা, তুমি ভীষণ সেলফিশ।'

'কেন?' মোনা দুষ্টু হেসে তাকাল সুপ্রতিমের দিকে।

'পাগলের প্রবলেমগুলো আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে দিব্যি মজায় আছ।' তারপর দর্শকদের লক্ষ করে : 'কী, আপনারাই বলুন—।'

মোনাও দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মজার সুরে বলল, 'যারা অন্যকে পাগল করে সেইসব পাগলের প্রবলেম তাদেরই সল্‌ভ করতে হবে। এটা আপনাদের সকলের প্রতি আমার উপদেশ। আশা করি ঠাট্টা করলাম বলে আপনারা কিছু মনে করবেন না।' বড় করে হাসল মোনা। তারপর সুপ্রতিমের দিকে ফিরে বলল, 'সুপ্রতিমদা, এবার সাক্ষাৎকার-পর্ব শুরু করুন। হাতে আর সময় বেশি নেই—।'

'হ্যাঁ। আজ আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন ডক্টর পার্থসখা মণ্ডল। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। উনি শিশু ও কিশোরদের মানসিক সমস্যা নিয়ে আমাদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেবেন...।'

এরপর শুরু হয়ে গেল আগে রেকর্ড করা ডক্টর মণ্ডলের সাক্ষাৎকার।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে সুপ্রতিম ঠিক করল ঝুমুরের বাড়ি আসার ব্যাপারটা ও নয়নাকে জানাবে না। মোনা ওকে টেলিফোনের কথাবার্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল। সুপ্রতিম ওকে সবই বলেছে। শুধু মঙ্গলবার সন্ধে সাতটার 'সাক্ষাৎকার'-এর কথা বলেনি।

সুপ্রতিম হিসেব করে দেখল মঙ্গলবার আসতে এখনও ঠিক তিনদিন বাকি। সেদিন ওকে স্টুডিয়ো থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।

দরজায় কেউ 'টুং-টাং' করে কলিংবেল বাজাতেই সুপ্রতিম চমকে উঠল। চকিতে ওর নজর চলে গেল দেওয়ালে টাঙানো শৌখিন ইলেকট্রনিক পেন্ডুলাম ঘড়ির দিকে। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ঘড়িও শব্দ করে ওকে জানিয়ে দিল এখন ঠিক সাতটা।

ড্রইংরুমের সোফায় বসে ঝুমুরের জন্য অপেক্ষা করছিল সুপ্রতিম। অপেক্ষা করতে-করতে ওর টেনশান ক্রমে বাড়ছিল। নয়না, বিমলামাসি, অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। তখন থেকে সুপ্রতিম ফ্ল্যাটে একা। হাতে সময় পেয়ে সামান্য একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। শরীরের এখানে-ওখানে ডিওডোরান্ট স্প্রে করেছে। হয়তো অবচেতনে ঝুমুরের আসার ব্যাপারটা মাথায় ছিল।

আবার বেজে উঠল কলিংবেল।

ঘোর কাটল সুপ্রতিমের। চটপট উঠে দরজার কাছে গিয়ে 'ম্যাজিক আই'-এ চোখ রাখল।

ঝুমুর নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ। 'ম্যাজিক আই'-এর লেন্স দিয়ে যেটুকু বিকৃত ছবি দেখা গেল তাতে বলা যায় লোকটি ফরসা, দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখে যেন একটা ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ ভাব।

দরজা খুলল সুপ্রতিম। সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশি পারফিউমের গন্ধ ওকে ভাসিয়ে দিল।

লোকটি, অথবা ছেলেটি, সামান্য হাসল। হাসিতে লজ্জা, সঙ্কোচ। কোনওরকমে বুকের কাছে হাত তুলে সৌজন্যের নমস্কারের ভঙ্গি করল। তারপর এক পা বাড়িয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে পড়ল, বলল, 'একটু কথা আছে।'

উচ্চারণগুলো এতই অস্পষ্ট যে সুপ্রতিমকে বেশ কষ্ট করে কথাগুলো বুঝতে হল।

কখনও-কখনও দু-একজন যশোপ্রার্থী মানুষ সুপ্রতিমের সঙ্গে দেখা করতে আসে। কী করে টিভিতে চান্স পাওয়া যায় তার কৌশল বা সুলুক-সন্ধান জিগ্যেস করে সুপ্রতিমকে বিব্রত করে, বিরক্ত করে। ইনিও বোধহয় সেই দলের—ভাবল ও।

লোকটি বেশ রোগা, উচ্চতায় নিতান্তই খাটো, তবে মাথার চুল বেশ বড়—কষে তেল মেখে কীর্তনীয়াদের মতো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখ টানা-টানা—কেমন এক তন্দ্রার ভাব সেখানে জড়িয়ে আছে। বাঁ-গালে, চোখের সামান্য নীচে, মটরের মাপের একটা কালো জড়ুল। পুরুষটি মেয়ে হলে ওটাকে বিউটি স্পট বলা যেত। পরনে সাদার ওপরে হালকা নীল স্ট্রাইপ দেওয়া ফুল শার্ট, আর নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট।

আর বয়েস কতই-বা হবে! বড় জোর তেইশ-চব্বিশ।

'বলুন, কী দরকার?' সুপ্রতিম জিগ্যেস করল।

এর পরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে গেল।

সুপ্রতিমের চোখে চোখ রেখে লোকটি ডানহাতে খোলা দরজার পাল্লাটাকে ঠেলে বন্ধ করে দিল। 'ক্লিক' শব্দে নাইট ল্যাচ আটকে গেল।

তারপর আদুরে খসখসে গলায় বলল, 'তোমাকে চাই গো, তোমাকে চাই—।'

এবং তাড়া-খাওয়া হরিণের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সুপ্রতিমের গায়ে। ওকে খাঁকড়ে ধরে 'চকাৎ' শব্দে এক তীব্র চুমু খেল ওর ঠোঁটে।

গায়ে আরশোলা বা মাকড়সা পড়লে মানুষ যেমন ঘেন্না, অস্বস্তিতে শিউরে ওঠে, ঠিক সেইরকম এক প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিল সুপ্রতিম।

ওর গা ঘিনঘিন করছিল। হাতের পিঠ দিয়ে বারবার করে ঘষে-ঘষে ঠোঁট মুছল।

ছেলেটি পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে উঠে বসে কাতর আকুল চোখে তাকাল সুপ্রতিমের দিকে। অদ্ভুত এক মেয়েলি সুরে বলল, 'আমাকে তুমি...চিনতে পারোনি! আমি...আমি...ঝুমুর...ঝুমুর চৌধুরী।'

সুপ্রতিম ভীষণ একটা ধাক্কা খেল।

এতদিন এই ছেলেটাই ওকে মেয়ে সেজে চিঠি দিয়েছে, ফোন করেছে! একটা জঘন্য বৃহন্নলা! এইজন্যই পাগলটা চিঠিতে লিখেছিল : '...আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি।'

সুপ্রতিমের গা গুলিয়ে উঠল। 'ওয়াক' উঠতে চাইল গলা দিয়ে।

ঝুমুর তখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা গোলাপ ফুল আর একটা রঙিন কাগজে মোড়া বাক্স বের করে ফেলেছে। সে-দুটো সুপ্রতিমের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এই ফুল আর একটা পার্কার পেন...তোমার জন্যে এনেছি। তুমি ফিরিয়ে দিয়ো না...প্লিজ...।'

ঝুমুর যদি পুরুষ হয় তা হলে ওর গলাটা মেয়েলি। আর যদি ও মেয়ে হত তা হলে বলা যেত গলাটা কেমন যেন পুরুষালি। কিন্তু আসলে ও কী?

ঝুমুর উঠে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে এল সুপ্রতিমের কাছে। মিষ্টি করে হেসে উপহার দুটো বাড়িয়ে দিল। বলল, 'আমি একটুও রাগ করিনি গো। আমার ভালোবাসায় প্রথম-প্রথম এরকম হয়—পরে সব ঠিক হয়ে যায়। এই নাও—।'

সুপ্রতিম কেমন এক অশুভ হাওয়া-বাতাসের ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝুমুরের কথায় ঘোর কাটতেই প্রচণ্ড রাগে সপাটে এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর মুখে।

বিশ্রী একটা শব্দ হল। ঝুমুরের ঠোঁট থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে এল। ও আবার ছিটকে পড়ল মেঝেতে। উপহারগুলো হাত থেকে পড়ে ছড়িয়ে গেল।

সুপ্রতিম ভেতরে-ভেতরে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল। একসঙ্গে অনেক কথা বলতে গিয়ে সব কথা কেমন যেন আটকে যাচ্ছিল। মাথার ভেতরে অনেক কিছু দপদপ করছে। এখুনি যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে।

'এইমুহূর্তে বেরোও। জানোয়ার কোথাকার! আউট!' হাঁফাতে-হাঁফাতে চেঁচিয়ে বলল সুপ্রতিম।

কিন্তু ঝুমুর ওর ধমক গ্রাহ্য করল বলে মনে হল না।

রক্তাক্ত মুখেই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা। ওর সাদা জামায় রক্তের ছিটে লেগেছে। সেই অবস্থাতেই বিচিত্র বিভঙ্গে শরীর দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল ও। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'আমি কিচ্ছু মনে করিনি, হানি। তোমাকে আমি চাই—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাই। হাজার টরচার করেও তুমি আমাকে টলাতে পারবে না। তোমার হাতের ছোঁওয়া আমার কাছে যে কী, তা তুমি জানো না। আর...আর এইটা নাখো—।' বলে একটানে জামাটা ছিঁড়ে দিল ঝুমুর। কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে ছিটকে

গেল। বুকের কাছটায় অনেকখানি ফেঁসে গেল জামাটা। আর তখনই ঝুমুরের খালি বুক দেখা গেল।

ওর ঈষৎ মেয়েলি ঢঙের বুকে বাঁদিকে সত্যিকারের একটা ছোট্ট কাটা দাগ। সুপ্রতিমের ডান ভুরুর দাগটার মতো।

ঝুমুর চিঠিতে লিখেছিল, ও বুকে একটা কাটা দাগ 'এঁকে' নিয়েছে। কিন্তু এ তো সত্যিকারের কাটা দাগ। ব্লেড, ছুরি অথবা ক্ষুর দিয়ে চিরে ও তৈরি করেছে!

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল ঝুমুর। রক্তমাখা মুখে ওর হাসি কেমন অলৌকিক দেখাচ্ছিল।

হঠাৎই ও আবার ঝাঁপিয়ে এল সুপ্রতিমের দিকে।

সুপ্রতিম খপ করে এক হাতে ওর গলা চেপে ধরল। তারপর ওর পলকা শরীরটাকে পিছনদিকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে গেল দরজার কাছে।

'য়ু সান অফ আ বিচ! ফাকিং গে বাস্টার্ড! আর কখনও যদি আমাকে ডিসটার্ব করো তা হলে একেবারে খুন করে ফেলব!'

দরজা খুলে ঝুমুরের দেহটাকে বলতে গেলে বাইরে ছুড়ে দিল সুপ্রতিম। ওর মাথাটা সিঁড়ির রেলিঙে ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। ও কাত হয়ে টলে পড়ে যেতে গিয়েও সিঁড়ির রেলিং ধরে কোনওরকমে সামলে নিল। ঘোলাটে নজরে তাকাল ওর ভালোবাসার পুরুষের দিকে। জড়ানো খসখসে গলায় বলল, 'আমি কিছুই মাইন্ড করিনি। যতই ফিরিয়ে দাও, আবার আমি আসব। একদিন-না-একদিন তুমি আমাকে মেনে নেবেই...।'

ওর গায়ে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিল সুপ্রতিম। তারপর দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

সুপ্রতিমের সারা শরীর অবসাদ আর ক্লান্তিতে কেমন ভারি হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে ও চোখ বুজে হাঁফাতে লাগল।

এক অদ্ভুত গ্লানি সুপ্রতিমকে জড়িয়ে ধরেছিল। বারবার 'ওয়াক' উঠে আসতে চাইছিল ওর গলা দিয়ে। এরকম গা-ঘিনঘিনে ঘটনার কথা কাউকে কি বলা যায়! শেষ পর্যন্ত কি সত্যি-সত্যিই থানা-পুলিশ করতে হবে?

ঝুমুরকে ঘুষি মেরে সুপ্রতিমের ডানহাতের পিঠটা ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছিল। ছড়ে যাওয়া জায়গাটা ঠোঁটে লাগিয়ে জোরে-জোরে কয়েকবার চুষল ও। তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা দলিত গোলাপ আর রঙিন প্যাকেটটার দিকে তাকাল। ঝুমুরের রক্ত-মাখা মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল আবার।

গোপনে কোনও মেয়ের সঙ্গে দেখা করলে সে-ঘটনাটা নয়নার কাছে ও অবশ্যই গোপন করতে চাইত। কিন্তু এই ব্যাপারটা এত অস্বস্তির আর এত লজ্জার যে, এটা আরও বেশি করে গোপন করতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু নয়নাকে বলতে হবেই—সে ও যা-ই ভাবুক।

সবরকম দ্বিধা কাটিয়ে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল সুপ্রতিম। নয়নাকে সেলাই-স্কুলে ফোন করে এখনই বাড়ি আসতে বলবে। তারপর...।

নয়নাকে সব কথা খুলে বলতে গিয়ে সুপ্রতিমের কান্না পেয়ে গেল। একটা অসহ্য রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা ওর ভেতরে দলা পাকিয়ে উথলে উঠছিল। নয়নাকে জড়িয়ে ধরে সুপ্রতিম বাঁচার একটা পথ খুঁজছিল। সৌন্দর্যই শেষ পর্যন্ত ওর শত্রু হয়ে দাঁড়াল! এমনই সুপুরুষ-সৌন্দর্য যে, একজন পুরুষও তার প্রেমে পড়ে যায়!

সারাটা রাত ওদের উথালপাথালভাবে কাটল। শেষ পর্যন্ত নয়না ওকে বলল, ব্যাপারটা থানায় জানানো দরকার।

সুপ্রতিম রাজি হল। তারপর মোনাকে ফোন করে জানিয়ে দিল, আপাতত সাত-দশদিন ওর পক্ষে অফিস করা সম্ভব হবে না। না, না, তেমন সিরিয়াস কোনও ব্যাপার নয়। পারিবারিক কয়েকটা ব্যাপারে হঠাৎই চাপ এসে পড়েছে। ওরা যেন সুপ্রতিমের বদলে আর কাউকে দিয়ে কটা দিন কাজ চালিয়ে নেয়।

সুপ্রতিম জানে, ওরা বিপ্লব সরকার কিংবা অনির্বাণ পুরকায়স্থকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবে। আগেও দু-একবার এরকম হয়েছে।

মোনা অনেক প্রশ্ন করল, কিন্তু সুপ্রতিম ঝুমুরের ব্যাপারে মোনাকে বিন্দুবিসর্গও বলল না। ও চাইছিল না ব্যাপারটা বেশি জানাজানি হোক। অদ্ভুত এক লজ্জা আর সঙ্কোচ ওর গলা টিপে ধরছিল।

নয়না আর সুপ্রতিম বেলা বারোটা নাগাদ থানায় পৌঁছল।

বাইরের ঘরটায় কয়েকটা লম্বা-লম্বা বেঞ্চি পাতা। একপাশে বড় মাপের একটা টেবিল। তাকে ঘিরে চারটে চেয়ার। টেবিলে পুরোনো আমলের টেলিফোন, কিছু ফাইলপত্র, বড় কাচের গ্লাসে আধগ্লাস জল।

ঘরটা এমন অন্ধকার-অন্ধকার যে, দিনের বেলাতেও দু-দুটো টিউব লাইট জ্বেলে রাখতে হয়েছে। সিলিং-এ সাবেকি একটা বেঢপ পাখা ঢিমে তালে ঘুরছে। তার হাওয়ায় দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে।

টেবিলের ওপাশে সাদা য়ুনিফর্ম পরে একজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। বয়েস বড়জোর পঁয়তিরিশ। ছোট করে ছাঁটা চুল। মুখে উদাসীন বিরক্ত ভাব।

টেবিলে রাখা কাঠের নেমপ্লেট পড়ে জানা গেল অফিসারের নাম টি. দাস, সাব-ইন্সপেক্টর।

সুপ্রতিম আর নয়না বসল।

দাসবাবু সপ্রশ্ন নজরে ওদের দিকে তাকালেন।

একটু ইতস্তত করে সুপ্রতিম বলল, 'আমি...আমি...একটা ডায়েরি করতে চাই।'

কথা বলতে-বলতে ও চারপাশে দেখছিল। দু-একজন লোক এদিক-ওদিক যাতায়াত

করছে। তাদের চোখেমুখে ব্যস্তসমস্ত ভাব।

সুপ্রতিমের মনে হল, দাসবাবু ছাড়া আর কেউ ওদের কথা শুনতে পারে না। তাই দাসবাবু যখন ডায়েরি-বই নিয়ে ডটপেন বাগিয়ে বললেন, 'বলুন—।', তখন ও প্রথমে নিজের পরিচয় দিল, তারপর সহজভাবেই ঝুমুরের ব্যাপারটা বলে গেল। টেবিলের আড়ালে নয়না ওর একটা আঙুল ছুঁয়ে ওকে সাহস জোগাচ্ছিল। ও টের পেল, সুপ্রতিমের আঙুল কাঁপছে।

কিছু লেখার আগে দাসবাবু ব্যাপারটা শুনে নিচ্ছিলেন। মাঝে-মাঝে ছোটখাটো শব্দ করছিলেন, আর ডটপেনটা ডায়েরি-বইয়ের পাতায় ঠুকছিলেন।

শুনতে-শুনতে একসময় তাঁর মুখে মজা পাওয়ার ছাপ ফুটে উঠল। চাপা গলায় বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

হঠাৎই একজন সাদা-পোশাকের অফিসার সিগারেট টানতে-টানতে এগিয়ে এলেন। ধপ করে বসে পড়লেন দাসবাবুর পাশের চেয়ারটায়। আড়চোখে নয়নার সৌন্দর্য চেটে নিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, 'কী কেস, দাস?'

'হোমো কেস।' দাস মুচকি হেসে বললেন।

নয়না আর সুপ্রতিম 'হোমো' শব্দটা শুনে কেমন যেন সিঁটিয়ে গেল।

'বলুন, তারপর কী হল—' সুপ্রতিমকে তাড়া দিলেন দাস।

খুঁড়িয়ে চলা ছ্যাকড়াগাড়ির মতো থতিয়ে-থতিয়ে কথা শেষ করল সুপ্রতিম। টের পেল, ওর ঘাড়ে, গলায়, কপালে ঘাম জমছে।

ওর কথা শেষ হওয়ামাত্রই সাদা-পোশাকের অফিসারটি বলে উঠলেন, 'এ-ডায়েরি নিয়ো না, দাস—এই ভদ্রলোক ফেঁসে যাবেন।'

দাসবাবু ওঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, শঙ্করদা।'

নয়না অবাক চোখে জানতে চাইল, 'কেন? ডায়েরি নেবেন না কেন? লোকটা আমাদের লাইফ হেল করে দিচ্ছে...।'

'সবুর, ম্যাডাম, সবুর...।' সিগারেটে জোরালো টান দিয়ে সাদা-পোশাকের অফিসারটি বললেন, 'একটু মাথা খাটান, তা হলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। একটা ইয়াং ছেলে আপনার হাজব্যান্ডকে "আমি তোমাকে ভালোবাসি" বলে জাপটে ধরে চুমু খেয়েছে। মানছি, অন্যায় করেছে। কিন্তু তার বদলে আপনার হ্যাজব্যান্ড কী করেছেন? না ছেলেটাকে তুলোধোনা করে মুখ-মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছেন। কী, ঠিক বলছি তো?' শেষের প্রশ্নটা সুপ্রতিমকে লক্ষ করে।

সুপ্রতিম কোনও জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল। নয়নাও ঠিক কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

সাদা-পোশাকের অফিসারের কথার খেই ধরে দাস সুপ্রতিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই ছেলেটা যদি থানায় এসে আপনার নামে ডায়েরি করে তা হলে তো আপনি ভেতরে ঢুকে যাবেন। তখন বিচ্ছিরিরকম স্ক্যান্ডাল হবে, লোকজানাজানি

হবে—একটা কেলো হয়ে যাবে।' একটু সময় দিলেন ওদের। তারপর : 'তার চেয়ে বরং বাড়ি যান। ছেলেটা আবার এলে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টাকাপয়সা দিয়ে ম্যানেজ করে নিন। ওর সঙ্গে মিউচুয়াল করে নেওয়া ছাড়া আর তো কোনও ওয়ে আউট দেখছি না। শঙ্করদা কী বলেন?' সাদা-পোশাকের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন দাস।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে-দিতে শঙ্করবাবু বললেন, 'এ ছাড়া কোনও পথ নেই। এসব হোমো কেস নিয়ে ক্যাচাল যত কম হয় আপনাদের পক্ষে ততই ভালো। তবে এরপর কী হয়-না-হয় সেটা আমাদের ইনফর্ম করতে পারেন। সিরিয়াস কোনও টার্ন নিলে তখন...।'

সুপ্রতিম আর নয়না ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। অফিসাররা যে ঠিক কথাই বলছেন, সে নিয়ে ওদের মনে কোনওরকম সন্দেহ ছিল না।

এক অদ্ভুত আতঙ্কে অবশ হয়ে শোলার পায়ে ওরা বাড়ি ফিরে এল। নয়না মনে-মনে ভাবছিল, কেমন দেখতে এই ঝুমুর চৌধুরীকে?

সুপ্রতিম যখন ফ্ল্যাটের দরজায় নাইট ল্যাচের চাবি ঘোরাচ্ছে তখন শুনতে পেল ঘরের ভেতরে টেলিফোন বাজছে।

দরজা খুলে তাড়াহুড়ো করে ফোন ধরল সুপ্রতিম।

'হ্যালো—।'

'সুপ্রতিম...মাই লাভ...আই লাভ য়ু...।'

নয়না স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখল ওর মুখটা চোখের পলকে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নয়না বুঝতে পারল, সুপ্রতিমকে কে ফোন করেছে।

ঝুমুরের টেলিফোনের উৎপাত চলতেই থাকল, কিন্তু সুপ্রতিম কিছুতেই আর বিরক্ত হল না। থানার দুই অফিসারের কথা ওর মনে ছিল। তাই ও মোলায়েমভাবে কথা বলে ঝুমুরকে নিরস্ত করতে চাইল। ওকে অনুনয় করে বলল, 'তুমি যেরকম ভালোবাসা চাও আমার মধ্যে সেরকম ভালোবাসা নেই। তুমি ভুল করছ—।'

ওকে বাধা দিয়ে আদুরে ঢঙে ঝুমুর বলল, 'না, না, ভুল নয়। তুমি আমার কাছে ধরা দিলেই বুঝবে আমি ভুল করিনি। আমি মনের মতো মনের মানুষ পেয়েছি।'

সুপ্রতিম অনেক চেষ্টা করেও গা-ঘিনঘিন করা ভাবটা চেপে রাখতে পারেনি। এবং টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

কিন্তু পরে আবার ঝুমুরের ফোন এসেছে।

সুপ্রতিম প্রতিবারই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। টাকা দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। ফোনের ও-প্রান্তে ঝুমুর কেঁদে ভাসিয়েছে। আত্মহত্যা করবে বলে ওকে ভয় দেখিয়েছে। কখনও বলেছে, গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। কখনও বলেছে, ট্রেনের তলায় মাথা দেবে। আবার কখনও-বা বলেছে, গলায় দড়ি দেবে।

সুপ্রতিম বেশ বুঝতে পারছিল, ওর জীবনের কোথায় যেন পূর্ণগ্রাস গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে।

ঝুমুরের নিয়মিত ফোন আর ইনিয়েবিনিয়ে প্রেম সুপ্রতিমকে অতিষ্ঠ করে তুলল। কয়েকদিন পর ওর মনে হতে লাগল ও বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যিই ঝুমুরের 'অন্যরকম' ভালোবাসার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে।

সুপ্রতিমের এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে মঙ্গলবার সন্ধে সাতটা নাগাদ ওদের ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল।

নয়না বাড়িতে নেই। সেলাইয়ের স্কুলে গেছে। সুপ্রতিমকে একা রেখে ও যেতে চায়নি, কিন্তু সুপ্রতিমই জোর করে ওকে পাঠিয়েছে, বলেছে, 'আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি! তা ছাড়া ওই ঝুমুর চৌধুরীকে ভয়ের কী আছে! আগের দিন তো ওকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছি। আজ যদি হতচ্ছাড়াটা আসে তা হলে হকি স্টিক দিয়ে পেটাব।'

সুপ্রতিম একসময় হকি খেলত। ওর হকি স্টিকটা বেডরুমের দেওয়ালের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা থাকে। সেটা এখন ও ড্রইংরুমের সোফার তলায় এনে রেখেছে। কারণ, ওর মন বলছিল, ঝুমুর যেরকম খ্যাপা তাতে ও মঙ্গলবার সন্ধে সাতটায় আবার ওদের ফ্ল্যাটে এসে হানা দিতে পারে—সুপ্রতিমকে একা পাওয়ার জন্য।

তাই কলিংবেলের আওয়াজ শুনেই চমকে উঠেছিল সুপ্রতিম। তারপর সতর্ক পায়ে দরজার কাছে গিয়ে 'ম্যাজিক আই' দিয়ে উঁকি মেরেছে।

না, ঝুমুর চৌধুরী নয়। দরজায় দাঁড়িয়ে ন্যাড়া মাথা গোঁফওয়ালা একজন লোক।

দরজা খুলে দিল সুপ্রতিম।

রোগা ছোটখাটো চেহারার লোকটি ঘরে ঢুকে পড়ল। তার হাতে একটা ছোট ব্রিফকেস। শার্ট, প্যান্ট, টাই পরে একেবারে ফিটফাট। মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

সেলসম্যান নাকি! ভাবল সুপ্রতিম। কিন্তু এই সন্ধে সাতটায় কী বিক্রি করতে এসেছে?

সুপ্রতিম ভদ্রতা করে বলল, 'বলুন, কী চাই?'

'খুব ইমপর্ট্যান্ট বিজনেস।' চাপা গলায় অস্পষ্টভাবে বলল লোকটি। তারপর খুব সহজ ভঙ্গিতে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল।

সুপ্রতিম লোকটির দিকে পিছন ফিরে সোফার দিকে একটা পা বাড়িয়েছিল, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ভুরু কুঁচকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ততক্ষণে ঝুমুর ওর নকল গোঁফটা একটানে খুলে ফেলে দিয়েছে ঘরের মেঝেতে। আর হাতের ব্রিফকেসটাও একপাশে নামিয়ে রেখেছে।

'তুমি!'

'হ্যাঁ গো, আমি। তোমার কাছে না এসে থাকতে পারলাম না। ফোনেই তো বলেছিলাম, তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু যদি তুমি মুখের ওপরে দরজা

দিয়ে দাও, তাই মাথা ন্যাড়া করে নকল গোঁফ লাগিয়ে আসতে হয়েছে...।'

ঝুমুর বিচিত্র ঠমক-ঠমক করে কথা বলছিল। কটাক্ষ হানছিল। ঠোঁটের কোণ কামড়াচ্ছিল।

সুপ্রতিম পাথর হয়ে তাকিয়ে ছিল অদ্ভুত এই প্রাণীটার দিকে। আর প্রাণপণে গা-ঘিনঘিন করা ভাবটাকে সামাল দিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল।

'তুমি রাগ করলে না তো! তোমার ওপরে আমার কোনও রাগ নেই। যাকে ভালোবাসি তার ওপরে কি রাগ করে থাকা যায়!'

কথাগুলো বলেই সুপ্রতিমের দিকে ঝাঁপিয়ে এল ঝুমুর। সুপ্রতিম ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই ও আবেগজর্জর প্রেমিকার মতো সুপ্রতিমের বুকে মুখ ঘষতে লাগল, আর ইনিয়েবিনিয়ে বলতে লাগল, 'আমায় আদর করো। লক্ষ্মীসোনা, আমায় আদর করো। আমি আর পারছি না। প্লিজ...প্লিজ...। আমার শুধু বাইরেটা পুরুষ—ভেতরটা নয়।'

সুপ্রতিম মুখ নামিয়ে দেখল একটা ন্যাড়া মাথা ছেলে ওর বুকে মুখ ঘষছে। ও এমন নির্লিপ্তভাবে দেখছিল, যেন ওটা ওর বুক নয়—অন্য কোনও পুরুষের বুক।

হঠাৎই বিকট শব্দে 'ওয়াক' তুলল সুপ্রতিম। ওর সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। এবং একইসঙ্গে এক ঝটকায় ঝুমুরকে ছিটকে ফেলে দিল ও। তারপর মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। মাথা ঝুঁকিয়ে বারবার বমির হেঁচকি তুলতে লাগল।

ওর গলার পাশে শিরা ফুলে উঠল। খানিকটা জল আর লালা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

ঝুমুর তখন মেঝেতে সোজা হয়ে বসেছে। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে সুপ্রতিমের দিকে। আর গুনগুন করে গাইছে, '...তোমার আদর পেলে আমি স্বর্গে চলে যাই/মর্ত্যে যে আর আমার কিছু নাই...।'

একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল সুপ্রতিমের মাথায়। ওর চোখ চলে গেল সোফার নীচে—হকি স্টিকের দিকে। হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে ওটা। চুলোয় যাক দাসবাবু আর শঙ্করবাবুর হিতোপদেশ! দাঁত বের করে বসে থাকা এই জানোয়ারটা ওঁদের তো কিছু করেনি! শুধু সুপ্রতিমের জীবনটাকে নরক করে তুলেছে।

কয়েকসেকেন্ড নিজের সঙ্গে লড়াই করল সুপ্রতিম। তারপর ডানহাত বাড়িয়ে দিল হকি স্টিকটার দিকে। ওটা আঁকড়ে ধরল শক্ত মুঠোয়।

আজ শুয়োরের বাচ্চাটার একদিন কি আমার একদিন। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল ও।

তারপর হকি স্টিক হাতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। দু-পা ফেলে পৌঁছে গেল ঝুমুরের কাছে। এবং খ্যাপা দাঁতালো শুয়োরের রাগ নিয়ে হকি স্টিক চালাতে শুরু করল।

ছোটবেলায় ধুনুরিদের লেপ-তোশক তৈরি করতে দেখেছে সুপ্রতিম। শীতের রোদে ছাদে বসে জমাট বাঁধা শক্ত তুলোকে তারা পিটিয়ে-পিটিয়ে নরম করে। এখন হকি স্টিক চালাতে-চালাতে ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। তবে ধুনুরিদের শব্দ যদি সত্তর-আশি

ডেসিবেল হয় তা হলে সুপ্রতিমের আঘাতের শব্দ কম করেও একশো ডেসিবেল। তা ছাড়া ধনুরিদের খেলা এমন রক্তারক্তি ব্যাপারটা ছিল না।

সুতরাং মেঝেতে বসে থাকা ছোটখাটো ছেলেটাকে নিষ্ঠুরভাবে তালগোল পাকিয়ে দিল সুপ্রতিম। ঝুমুর ওর পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে কুকুরছানার মতো কেঁউকেঁউ করতে লাগল। শব্দটা কেমন কান্না মেশানো গোঙানির মতো লাগছিল। ওর মাথা কেটে রক্ত পড়ছে, জামায় রক্তের ফোঁটা ছিটকে লেগেছে, শরীরটা যেন ভাঙাচোরা 'দ' হয়ে গেছে।

উন্মত্ত রাগ কমে এলে সুপ্রতিম হকি স্টিকটা একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিল ও। ভাবছিল, এত শব্দ-টব্দ পেয়ে লোকজন না ছুটে আসে ওর ফ্ল্যাটে। তারপর থানা-পুলিশ...।

কয়েকসেকেন্ড অন্যমনস্ক হয়েছিল সুপ্রতিম। সেই ফাঁকেই ওর উরুতে ক্ষুর চালাল ঝুমুর।

তালগোল পাকানো ছেলেটা বিদ্যুৎগতিতে হাত চালাল। একবার, দুবার, তিনবার। প্রথম দুবার উরুতে, তৃতীয়বার হাঁটুর নীচে।

সুপ্রতিমের মনে হল ওর পায়ে জ্বলন্ত কয়লা ঘষে দিয়েছে কেউ। ও ঝুঁকে পড়ে পা চেপে ধরল।

আর তখনই ওর কোমরে ক্ষুর চালাল ঝুমুর।

যত না যন্ত্রণা পেল তার চেয়ে বেশি অবাক হল সুপ্রতিম। ও বিশ্বাসই করতে পারছিল না ওর পায়ের কাছে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকা ক্ষীণজীবী মাংসপিণ্ডটা এইরকম ভয়ানক কাণ্ড করতে পারে।

সুপ্রতিম পড়ে গেল মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই পাগলটা লাফিয়ে উঠে এল ওর শরীরের ওপরে। ডানহাতে ধরা ক্ষুরটা চেপে ধরল সুপ্রতিমের বাঁ-কানের নীচে, খসখসে আদুরে গলায় বলল, 'ভালোবাসা আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই গো। তোমাকে খতম করে দিলে আমার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু তোমার ভালোবাসা না-পেলে কষ্ট যে আরও বেশি! আই লাভ য়ু, ডার্লিং...।'

খুব কাছ থেকে ঝুমুরের মুখটা লক্ষ করে এই প্রথম ওকে ভয় পেল সুপ্রতিম। ওরা দুজনেই হাঁফাচ্ছিল। একজনের নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢুকে পড়ছিল আর-একজনের নাকে। তাই ওদের দুজনেরই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

এক অজানা ভয়ে সুপ্রতিম কাঠ হয়ে গেল। ও টের পাচ্ছিল, ওর কোমর, উরু, পা থেকে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। নয়না এখনই এসে পড়ছে না কেন! নয়নার ফিরে আসার জন্য মনে-মনে আকুল প্রার্থনা করতে লাগল ও।

ঝুমুর হিসহিস করে বলল, 'অসভ্যতা করলে গলা ফাঁক করে দেব। আর যদি চেঁচাও, তা হলে চিৎকারটা মুখ দিয়ে বেরোবে না—গলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।'

ঝুমুর সুপ্রতিমের বুকের ওপরে উঠে বসল। বাঁহাতে টান মেরে সুপ্রতিমের জামা

ছিঁড়ে দিল। তারপর নির্বিকার ভঙ্গিতে ওর বুকে ক্ষুর চালিয়ে আড়াআড়ি দাগ টেনে দিল।

সুপ্রতিম যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল।

ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করে ঝুমুর বলল, 'চুপ, সোনামণি। অনেক কষ্ট সয়ে তবেই আসল ভালোবাসা পাওয়া যায়।'

প্যান্টের পকেট থেকে নাইলনের দড়ি বের করল ঝুমুর। ডান হাতে ক্ষুর নাচাতে-নাচাতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সুপ্রতিমের মাথার দিকটায় গেল। তারপর উবু হয়ে বসে পড়ল। ক্ষুরটা হাতের কাছেই নামিয়ে রেখে 'নোড়ো না, লক্ষ্মীটি। নইলে বিপদ হবে।' বলতে-বলতে সুপ্রতিমের দুটো হাত বাঁধতে শুরু করল।

হাত দুটো শক্ত করে বাঁধা হয়ে গেলে দড়ির প্রান্তটা বেঁধে দিল একটা সোফার দু-পায়ার সঙ্গে। এখন অনেক চেষ্টা করে সুপ্রতিম সোফাটাকে সামান্য নাড়াতে পারবে হয়তো, কিন্তু সুপ্রতিম কোনওরকম চেষ্টা করছিল না। ও চোখ ঘুরিয়ে 'অন্যরকম' ঝুমুরকে লক্ষ করছিল, আর মৃত্যুভয়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল।

দড়ির বাকি অংশটা ক্ষুর দিয়ে কেটে নিল ঝুমুর। চলে এল সুপ্রতিমের পায়ের কাছে। পা দুটো জোড়া করে শক্ত করে বাঁধল।

এমন সময় ঘরের টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

ঝুমুর টেলিফোনটার দিকে একবার তাকাল শুধু। তারপর টেলিফোনের শব্দ কোনওরকম গ্রাহ্য না করে আর-একটা সোফা টেনে নিয়ে এল সুপ্রতিমের পায়ের কাছে। জোড়া পা বাঁধা পড়ল সোফার দু-পায়ার সঙ্গে।

ঝুমুর এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে অদ্ভুতভাবে হাসল। ক্ষুরটা রেখে দিল সোফার ওপরে। তারপর নিজের পোশাক খুলতে শুরু করল। সুপ্রতিম ভয়ার্ত চোখে ওকে দেখতে লাগল।

বাজতে-বাজতে ক্লান্ত হয়ে টেলিফোন থেমে গেল একসময়।

ততক্ষণে সুপ্রতিমের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়েছে প্রায়-নগ্ন ঝুমুর। ওর পরনে শুধু একটা গাঢ় নীল রঙের জাঙিয়া।

ফরসা ফ্যাকাসে রোগা শরীর, ন্যাড়া মাথা, মাথায় রক্তের দাগ, গলায় সামান্য রক্তের ছিটে, মুখে চওড়া হাসি, অথচ ঠান্ডা চোখ। ঝুমুরকে কেমন যেন অলৌকিক প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল।

এইবার ব্রিফকেসটা টেনে নিয়ে মেঝেতে বসল ঝুমুর। ওটা খুলতেই দেখা গেল মেয়েলি প্রসাধনের নানান জিনিস। একটা হাত-আয়না নিয়ে ঝুমুর সাজতে বসল। আর একইসঙ্গে গুনগুন করে গাইতে লাগল : 'ভালোবাসার তুমি কী জানো? ভালোবাসার তুমি কী জানো? উঁ...উঁ...উঁ...পায়ের উপর পা-টি তুলে/হিসাবের খাতা খুলে/বসে রও আপন ভুলে/যত বলি ঢের হয়েছে,/মানা না মানো।/ভালোবাসার তুমি...উঁ...উঁ...উঁ...।'

মুখে পাউডার-ক্রিম ইত্যাদি মাখা হয়ে গেলে চোখে কাজল পরতে শুরু করল। তারপর চোখের পাতার ওপরে রং ঘষতে লাগল। মুখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানান দিক থেকে নিজের প্রসাধন আয়নায় পরখ করল।

প্রসাধনে সন্তুষ্ট হয়ে হাতে লিপস্টিক তুলে নিল ঝুমুর। লাল ডগাটা বের করে ঠোঁটে ঘষতে লাগল। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াল। কয়েকবার কোমর বেঁকিয়ে-চুরিয়ে মেয়েলি নাচের ভঙ্গি করল। তারপর নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে এগিয়ে এল অসহায় রক্তাক্ত সুপ্রতিমের দিকে।

সুপ্রতিম শুয়ে-শুয়েই স্নো-পাউডারের গন্ধ পেল।

সুপ্রতিমের ঠোঁটে, মুখে, বুকে লিপস্টিক ঘষে দিল ঝুমুর। তারপর লিপস্টিক ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওকে কষে চটকাতে লাগল, আর জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমি তোমায় বড় ভালোবাসি/তোমায় বড় ভালোবাসি...আমি তোমায় বড় ভালোবাসি...।'

সুপ্রতিম ভাবছিল, ও কি বেঁচে আছে? এই ঘটনাগুলো কি সত্যি? না কি দুঃস্বপ্ন!

'বলো, তুমি আমায় ভালোবাসো। একবার বলো, আমায় ভালোবাসো। তুমি আমার—আর কারও নয়। শুধু একবার বলো...।'

অসুস্থ উন্মত্ত ছেলেটা সুপ্রতিমের জামা সরিয়ে দিয়ে খোলা বুকে মুখ ঘষছে। ঠোঁটে, গালে, চোখে যথেচ্ছ চুমু খাচ্ছে। হাতড়াচ্ছে যেখানে-সেখানে। আর অনর্গল ভালোবাসার কথা বলছে।

ঝুমুর ওর প্যান্টের বোতাম খোলা শুরু করতেই সুপ্রতিম চাপা চিৎকার করে উঠল।

'কী, কষ্ট হচ্ছে?' ঝুমুর নিষ্পাপ স্বরে জিগ্যেস করল, 'তুমি শুধু একবার বলো, আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসবে...তা হলেই তোমার সব বাঁধন খুলে দেব। তুমি শুধু আমায় একটা চুমু খাও...একটা...তা হলেই আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে যাব।...শুধু একবার...।'

সুপ্রতিমের গলা দিয়ে বমি উঠে আসতে চাইছিল। কিন্তু গলা ফাঁক হয়ে যাওয়ার চেয়ে সেটা অনেক ভালো। ওর মনে হচ্ছিল, ও বোধহয় এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিছু একটা করা দরকার, কিছু একটা করা দরকার...।

দাঁতে দাঁত চেপে সুপ্রতিম কোনওরকমে বলল, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ঝুমুর।'

প্যান্টের জিপার খুলতে গিয়ে ঝুমুরের হাত থেমে গেল। ও আদুরে গলায় বলল, 'কী বললে গো? আর-একবার বলো। প্লিজ...।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আরও ভালোবাসতে চাই।...আমার বাঁধনগুলো খুলে দাও, প্লিজ...।' কথা বলতে গিয়ে সুপ্রতিমের দম আটকে যাচ্ছিল।

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো চট করে উঠে পড়ল ঝুমুর। হাঁফাতে-হাঁফাতে সুপ্রতিমের বাঁধন খুলতে শুরু করল। উত্তেজনায় ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

বাঁধন খোলা হতেই সুপ্রতিমের কপালে হাত বুলিয়ে নরম সুরে ঝুমুর বলল, 'নাও, এবার ওঠো।'

ক্লান্ত শরীর নিয়ে উঠে বসল সুপ্রতিম। কাটা জায়গাগুলো ভীষণ জ্বালা করছে।

ঝুমুরের আর তর সইছিল না। ও সুপ্রতিমের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। ওর কোলে উঠে বসল একেবারে।

সুপ্রতিমের মনে হল একটা কোলাব্যাঙ ওর কোলে বসে আছে। কিন্তু বাঁচার তাগিদে ও ঝুমুরকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে-গালে চুমু খেল। বিড়বিড় করে বলল, 'আই লাভ য়ু, ঝুমুর...।'

শরীরের ভেতর থেকে উঠে আসা বমির দমক রুখে দিয়ে সুপ্রতিম ভাবল, নয়না এখনও আসছে না কেন।

আর ঠিক তখনই ঝুমুরের নগ্ন কাঁধের ওপর দিয়ে সোফার ওপরে পড়ে থাকা ক্ষুরটা ও দেখতে পেল। হাতের প্রায় নাগালে রয়েছে ওটা।

ঝুমুরকে জড়িয়ে ধরে কোনওরকমে হাঁটুগেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুপ্রতিম। পলকা ছেলেটা সুপ্রতিমের আশ্লেষে আনন্দে টইটম্বুর হয়ে ভালোবাসার প্রলাপ বকছে শুধু। আর সুপ্রতিম নিজের প্রাণ বাঁচাতে একের-পর-এক চুমু খেয়ে চলেছে ওর স্নো-পাউডার মাখা মুখে।

ক্ষুরটা এখন পুরোপুরি সুপ্রতিমের হাতের নাগালে।

ও মুঠো করে অস্ত্রটা ধরল। তারপর ঝুমুরকে আদর করতে-করতে ক্ষুরটা নিয়ে এল ওর গলার খাঁজের কাছে।

কতক্ষণ আর সুপ্রতিমের শক্তি থাকবে কে জানে! মাথা ঝিমঝিম করছে। রক্তে চটচট করছে হাত-পা-বুক।

চুলোয় যাক ভদ্রতা, সভ্যতা, নীতি, দয়া ইত্যাদি।

আত্মরক্ষা মানুষের একটা আদিম ধর্ম।

বাঁহাতে ঝুমুরের মাথাটা পিছনে ঠেলে দিয়েই ডান-হাতে ক্ষুর টেনে দিল সুপ্রতিম।

ঝুমুরের ভালোবাসার প্রলাপ মাঝপথেই থেমে গেল। তার বদলে ঘরঘর শব্দ বেরোতে লাগল মুখ আর গলা দিয়ে।

রক্তে মুখ-গলা-বুক ভেসে গেল সুপ্রতিমের। ওর মুখ দিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ও জ্ঞান হারিয়ে কাত হয়ে পড়ল মেঝেতে। ঝুমুরের মৃতদেহ তখনও ওকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

একটি অচেতন দেহ ও একটি মৃতদেহ অসাড় হয়ে নয়না অথবা আর কারও জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রক্তের ধারা তখন মেঝেতে গড়িয়ে-গড়িয়ে সময়ের হিসেব রাখছিল।
